সংশপ্তক

সংশপ্তক

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শহীদুল্লা কায়সার

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

প্রথম বেঙ্গল সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

প্রকাশক : ময়থ বসু বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২ মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ শ্রীহরি প্রেস ১৩৫-এ মুক্তারামবাবু স্ট্রীট কলিকাতা-৭ প্রচ্ছদ : মোস্তফা মনোয়ার

গুজবের পর গুজব আসছে।

জাপানীরা নাকি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে চট্টগ্রাম। ফেনী শহরেও বোমা পড়েছে!

ট্রাঙ্ক রোডের উপরে কে নাকি জাপানীদের দেখে এসেছে স্বচক্ষে।

স্বচক্ষের বর্ণনাটাও ছড়িয়ে পড়েছে মুখে মুখে : থ্যাবড়া নাক, ইয়া ইয়া জোয়ান, চোখ এক রকম নেই বললেই চলে। বাচ্চা ছেলেদের ধরে ধরে কাঁচাই চিবিয়ে খায় ওরা।

গিয়ে টিয়েও যে কয়েক ঘর বাসিন্দা পড়েছিল তালতলিতে তারাও পালাচ্ছে। আসলে দু এক ঘর করে রোজই সরে পড়ছিল। নজরে পড়েনি মালুর। আজ ক্লাবে এসেই বুঝল, কেউ আর থাকছেনা তালতলিতে।

ভবেশ পণ্ডিতের পাঠশালার পেছনে সেই ঘরটি। সেই ঘর থেকে ছড়িয়ে পড়ত অশোকের গলা, সুরের ঝংকার। সেই ঝংকার গিয়ে পৌঁছাতো ওই তেল নুনের দোকানে। কী আনন্দে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসত মালু।

আজ গান নেই। আনন্দের ডাক নেই। ভবেশ পণ্ডিতের পাঠশালার কাছে এসেও সামান্য একটু টুং টাং আওয়াজ পেলনা মালু। তালতলির বাতাস কি আর সুরের ঝংকারে উতলা হবেনা কোনদিন?

ক্লাবের ভেতর পর্যন্ত যেতে হলনা মালুকে। দরোজার কাছাকাছি এসেই দেখল মালু, যন্ত্রপাতিগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসছে অশোক। অশোকের পেছনে ওরই দু জন ছাত্র।

ওরা দু'জন আর মালু, গত কয়েক দিন এই তিন ছাত্রকে নিয়েই অশোকের গানের স্কুল বসেছিল। আজ ওরাও চলে যাচ্ছে।

মালু, তুইও চল আমাদের সাথে, বলল অশোক।

না। কেমন কর্কশ শোনায় মালুর এক শব্দের উত্তরটা। অশোক যেন চমকে তাকাল ওর দিকে। বলল : ও, তুই বুঝি জাপানীদের ঠেঙ্গাবার জন্য থেকে যাবি? তোর ওই মাষ্টার সাহেব যেমন বলে?

উত্তর দেয়না মালু। মাষ্টার সাহেবকে নিয়ে কোন বাঁকা কথা, সে যার কাছে থেকেই আসুক, অসহ্য মালুর পক্ষে।

অশোক আগে আগে। ওরা পিছে পিছে।

রাণুও তো চলে যাচ্ছে, বলল অশোক।

রাণুদিও যাচ্ছে? বুকের তলা থেকে বেরিয়ে আসা একটা আর্তনাদ বুঝি অতি কষ্টে চেপে রাখল মালু। সবাই চলে গেলেও রাণুদি যাবে না, এমন একটা কথা কেন যেন ভেবে রেখেছিল ও।

এমন সুন্দর গলাটা। চর্চা করলে সত্যি সত্যি ওস্তাদ হতে পারতি তুই। হঠাৎ প্রসঙ্গটা পাল্টে নিল অশোক।

গানের কথা আসতেই কেমন নরম হয়ে যায় মালু। জড়িয়ে আসে পা জোড়া। গান শিখবি তো কোলকাতায় তোকে আসতেই হবে। এই চোরা বাজারের ডিপোতে চোর চোট্টাদের সাথে থেকে গান শিখবি তুই? পেছন ফিরে মালুর মুখের উপর চোখ রেখে বলল অশোক।

তক্ষুনি যেন মনস্থির করে ফেলে মালু। গানের জন্য কলকাতা কেন, যে কোন দোজখে যেতে প্রস্তুত মালু। আর কলকাতা যাওয়াটা তো অনেক দিনের স্বপ্ন ওর। সেই স্বপ্নটা আবার চাড়া দিয়ে উঠল বুঝি। মুখে কিছু না বলে নীরবেই যেন সম্মতিটা জানিয়ে দেয় মালু।

বুঝি কোন আসন্নপ্রলয়ের মুখে নিঃশব্দ প্রস্তুতি চলছে রাণুদের বাসায়। কাকপক্ষীও টের পায়না এমনি ভাবে সেরে ফেলেছে সব বাঁধা সাঁধার কাজ। এখন শুধু যাত্রাটাই বাকী। কেন যে এই গোপনীয়তা বুঝতে পারেনা মালু।

অস্বাভাবিক গম্ভীর রাণু। মালুকে দেখে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল, বলল: এবার পড়ার দিকে মন দিবি। বুঝলি? মাষ্টার সাহেব এসেছিলেন, তোর কথাই আলাপ হল।

রাণুর কথাটা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য নেই মালুর। ও শুধাল: তুমিও চলে যাচ্ছ, রাণুদি?

গম্ভীর মুখটাকে যেন আরো গম্ভীর করে হাসল রাণু। বলল: মেয়েরা কি চিরকাল বাপের বাড়ি থাকে রে?

বুঝতে না পেরে রাণুর মুখের দিকে প্রশ্নভরা চোখে চেয়ে থাকে মালু।

আমরা যাচ্ছি ভাগলপুর, কাকার বাসায়। সেখানে আমার বিয়ে হবে। হাঁদারাম কোথাকার। এবার বুঝলি?

বুঝতে পেরেও খুসিতে হাসবে, না দুঃখে কাঁদবে, সেটা বুঝতে না পেরে চুপ মেরে যায় মালু।

লক্ষ্মী ছেলের মত থাকবি। জ্যাঠা মশায়ের সাথে ঝগড়া করবি না। দুর্ব্যবহার করলে আমাকে লিখবি। কেমন? এক টুকরো কাগজে ঠিকানাটা

লিখে মালুর হাতে গুঁজে দেয় রাণু, বলে, এক পিঠে অশোকদার, উল্টো পিঠে আমার।

ঠিকানা লেখা কাগজটা পকেটে না পুরে হাতের চেটোয় কচলে চলল মালু।

কিন্তু পড়াশোনা করবি, লক্ষ্মী ভাইটি। মালুর মাথাটা কাছে টেনে হাত বুলিয়ে দেয় রাণু।

বুঝি এই আদরটুকুর অপেক্ষায়ই ছিল মালুর চোখের জল। বহু দিন পর সেই ছোট বেলার মতই মালুর চোখ পানিতে ঝাপসা হল।

গভীর রাত।

বড় খাল।

মালুর মনে আছে, এমনি এক রাতে বিদায় দিয়েছিল কমিরকে। আজ বিদায় দিল রাণুদের গোটা পরিবারটাকে। তালতলিতে রইল ওদের পরিবারের রামদয়াল আর রমেশ।

নৌকোটা ছাড়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্তও বুঝি তৈরী ছিল মালু, আর একবার বলবে অশোক—চলে আয়। অমনি নৌকোর গলুইতে উঠে বসবে মালু। কিন্তু কেউ ওকে ডাকলনা, না অশোক, না রাণু।

রাবু আপা চলে গেছে। রাণুদিও চলে গেল। আবাল্য আপন বলে যাদের ভেবে এসেছে এমন করে তারা সবাই ওকে বর্জন করে চলে গেল। বড় খালের ঝিরঝিরে বাতাস গায়ে মেখে ফেরার পথে কেন যেন এ কথাটাই ভাবল মালু, আর বুকটা ওর ভারি হয়ে এল।

কিন্তু বড়খাল থেকে ফিরে তালতলির বাজারে পা রেখে আবার অশোককেই দেখতে পাবে এমন একটা 'ভৌতিক' কাণ্ড কেমন করে কল্পনা করতে পারে মালু।

সত্যি সত্যি অশোককে দেখল মালু। একটা জীপের ভিতর বসে আছে অশোক। দুপাশে গোরা সেপাই। হয়ত বাজার বলেই জীপের গতিটা শ্লথ। মুখ বাড়িয়ে অশোক বলছে, এই মালু। এই মালু, আমাকে ওরা এ্যারেষ্ট করেছে।

কেন?

জানিনা। ওরা বলছে আমি নাকি রাজ-বিরোধী, জাপানী স্পাই।

কখন ধরল?

এই তো এখুনি। মাঝ গাঙে নৌকোটা ঘেরাও করে তুলে নিয়ে এল আমাকে।

কখন ছাড়বে? জীপের পাশে দৌড়াতে দৌড়াতে শুধাল মালু। কিন্তু জবাব পেলনা। জীপটা ততক্ষণে গতি বাড়িয়েছে, শাঁ করে বেরিয়ে গেছে বাজার ছেড়ে ট্রাংক রোডের দিকে।

রাত কাবার হয়ে দিনটাও চলে গেল। আরও একটা দিন আরও একটা রাত পেরিয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় সেই নাক থ্যাবড়া জাপানী! কোথায় জাপানী বোমা?

তাই বলে স্বচক্ষে জাপানী দেখবার জন্য তো আর কেউ অপেক্ষা করবে না। গোটা তালতলি গ্রাম জনশূন্য।

কিন্তু, তালতলির বাজার মানুষের ভীড়ে, বেচা কেনার ধুমে জমজমাট।

কত কুলি মজুর কাজ করে চলেছে আশে পাশের রাস্তায়, সামরিক ঘাঁটিতে। কন্ট্রাকটার ওভারসিয়ার বিল বাবু গুদাম বাবু—সাহেব আর বাবুর অন্ত নেই। একটু দূরেই রয়েছে মিলিটারী ছাউনী। চায়ের স্টলগুলো দিনরাত্রি সরগরম। চায়ের পেয়ালা চামুচের টুংটাং, বাংলা হিন্দি ইংরেজী মাদ্রাজী। বিচিত্র বোল—তালতলির হাওয়ায় নতুন সঙ্গীত।

আর দিনরাত শুধু গাড়ির চলাচল। ছোট বড় মাঝারি কত রকমের গাড়ি। ঘর্ঘর গর্জন। পেট্রোলের গন্ধ। ধোঁয়া, ধূলো। মাথার উপরে বোমার বিমানের কর্কশ চিৎকার। এই বুঝি তালতলির নতুন সঙ্গীতের আধুনিক আবহ।

ওই নতুন সড়ক, ওই গাড়ির মিছিল যেন বিশাল পৃথিবীরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এনে পৌঁছে দিয়েছে এই তালতলির বাজারে।

রকমারী ভাষা এসে যেমন কানে বাজে তেমনি চোখ থেমে থাকে মানুষগুলোর বিচিত্র রং ঢং চেহারা নমুনায়। কারো রং সাদা, কদুর বুকের মতো। কারো বা পাকা কলার মতো স্বর্ণাভ। কেউ বা বট ফলের মতো লাল। আর এক দল মিসমিসে কাল, যেন হাঁড়ির তলা। কেউ বাঁদর মুখো। কেউ শিয়াল-মুখো। কেউ বা ছবির মুখের মতোই সুন্দর। কিন্তু এই মুহূর্ত স্থিরতা নেই কারো, ফৌজি কাফেলা, দিন নেই রাত নেই, চলছে তো চলছেই। ছাউনীর পর ছাউনী পড়ছে। উঠে যাচ্ছে সব ছাউনী। আবার বসছে নতুন ছাউনী।

উন্মত্ত, তীব্র এক গতি। সে গতির মুখে বিভ্রান্ত তালতলির হাট। ক্ষুদ্র ডোবাটির মাঝে হঠাৎ যেন সমুদ্র এসে পড়েছে। বদ্ধ জল আজ তরঙ্গ উতরোল। মিঠা পানিতে লেগেছে লোনা স্বাদ। শুধু তালতলি নয়, পূর্ব বঙ্গের বিস্তীর্ণ সীমান্ত অঞ্চল জুড়ে বুঝি এই তরঙ্গের আঘাত, মিঠে পানিতে এই লোনার স্বাদ।

সব কিছু যে তছনছ হল, তার বিনিময়ে এ টুকুই বুঝি লাভ। ধ্বংসে সৃষ্টিতে তিক্ততায় মধুরতায় আশ্চর্য যে মানবজাতি, সীমান্ত বাংলা হয়তো জানলনা তার বেদনা, কিন্তু দেখল ওদের দু চোখ মেলে। আর তাদের নৃশংসতা তাদের ব্যাধির ছাপ আপন অঙ্গে তুলে নিল, আপন মুখের অন্ন ওদের হাতে তুলে দিয়ে সারা পৃথিবীর সাথে তার এই প্রথম পরিচয়কে অক্ষয় করে রাখল। তালতলির হাট তাই আজ বিশ্বের মেলা। সেই বিশ্ব মেলার কয়েকটি মাসেই বাকুলিয়ার মালু যেন ডিঙ্গিয়ে গেল কয়েকটি জীবন, একটি শতাব্দী।

এ দিকে দুনিয়ার কোলাহল, ও দিকে খাঁ খাঁ করছে স্কুল ঘর। পিটিয়ে পুটিয়ে যে দু চার গণ্ডা ছাত্রকে স্কুলে এনে হাজির করত সেকান্দর মাষ্টার তারাও আজ অনুপস্থিত। পিয়নটাও পালিয়েছে। শূন্য স্কুল ঘরটিতে একলাই খুট খুট করছে সেকান্দর মাষ্টার। এ ক্লাস সে ক্লাস ঘুর ঘুর করছে। বগলে তার হাজিরা বই।

হেডমাষ্টারের ঘরে বসে বুড়ো মিস্তির। গত বিশ বছর ধরেই স্কুলের সেক্রেটারী তিনি। হেডমাষ্টার ইস্তেফা দিয়ে চলে যাওয়ার পর ছাত্রশূন্য স্কুলের এই দায়িত্বটাও নিয়মিত নিষ্ঠায় পালন করে চলেছেন। সেকান্দরকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন: আর কেন সেকান্দর, চল এবার আমরাও কেটে পড়ি।

যেন মিস্তির মশায়েরই জবাবে হাজিরা বইগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে মারে সেকান্দর মাষ্টার। গোঁৎ গোঁৎ করে বেরিয়ে যায়।

সামনেই পড়ে বাকুলিয়ার ট্যাণ্ডল বাড়ির ছোট ছেলেটি। বছর আটেক বয়স হবে হয়তো। বিনে ফিসে, বিনে মাইনায় ছেলেটাকে সেকান্দর ভর্তি করিয়ে নিয়েছিল স্কুলে। বইপত্রও নিজের পয়সায় কিনে দিয়েছিল মাষ্টার। কিন্তু আজ স্কুলে বইগুলো রেখেই ছেলেটা কোথায় যেন পালিয়ে গেছিল।

কোথায় ছিলি সারাদিন ?

সেকান্দরের আচমকা রূঢ় স্বরে বুঝি কেঁদে দেয় ছেলেটি। মিনমিনিয়ে যা বলল তার অর্থ: রমজানের নতুন ম্যানেজার ওকে ডাকল। ও চলে গেল।

ট্রাঙ্ক রোডে যে মেরামত হচ্ছে সেখানে এক চাক দু চাক করে মাটি ফেলল ছেলেটি, দিনের শেষে নগদ একটি টাকা পেল।

এখন বাড়ি যাবে। বইগুলো ফেলে গেছিল। বইয়ের জন্য এসেছে ও। ছেলেটির গালে পটাপট কয়েকটা চড় বসিয়ে দিল সেকান্দর। হেঁটে চলল বাজারের দিকে।

বুঝি এই প্রথম মাষ্টার সাহেবের রাগ দেখে হাসি পায় মালুর। সালাম দিয়ে পাশে পাশে চলে মাষ্টারের।

বিড় বিড় করে কি যেন বকে চলেছে মাষ্টার। শুধু একটি কথাই কানে এল মালুর—শুয়রের বাচ্চা রমজান।

বুঝি চরম প্রতিশোধ নিয়েছে রমজান। দূরে অলক্ষ্যে থেকে ও অবিরাম নির্যাতনের তীর ছুঁড়ে চলেছে। আর পলে পলে সে তীরের বিষে জর্জর সেকান্দর মাষ্টার।

দোকানের কাছে এসে থেমে যায় সেকান্দর। দোকানের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখে, মালু চলেছে পাশেই।

মিঞা বৌ তোকে আজই একবার যেতে বলেছে। কি নাকি জরুরী দরকার। কথাগুলো বলে আর দাঁড়ালনা সেকান্দর। ফড় ফড় শব্দে ছাতাটা মেলে দ্রুত পা চালাল বাকুলিয়ার দিকে।

কম আশ্চর্য হবার কথা নয়। রাবুদের সূত্রে ফেলু মিঞার বৌকে মামী বলেই ডাকত মালু। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দুটো কথা বা একটা ফরমাস কোনদিন তার কাছ থেকে পেয়েছে মালু, এমন কোন ঘটনা মনে করতে পারল না মালু। অথচ আজ তাকেই ডেকে পাঠিয়েছে। আকাশ পাতাল ভেবেও এ ডাকের কোন হেতু খুঁজে পায়না মালু।

আ-চষা দখিন ক্ষেত। অভিমানে মাটি যেন গুমরে মরছে। বড় বড় ফাটল পথে বুঝি সে অভিমানেরই বিস্ফোরণ। পায়ের তলায় শক্ত মাটির ধপ ধপ আওয়াজটা কেন যেন শুকনো হাড়ের কান্নার মতো মনে হয় মালুর। দখিনের ক্ষেতে আবার কবে হেসে উঠবে সবুজ ধানের থোড়! যেতে যেতে সে কথাটাই বুঝি ভাবে মালু।

বড় খালের পুলটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় মালুকে। রাস্তা দিয়ে লম্বা একটি কনভয় চলেছে। সবকিছু ওলট পালট করা এই যুদ্ধ স্বচ্ছতোয়া বড়

খালটিকেও রেহাই দেয়নি। তলার মাটি যেন ঘুটিয়ে তুলে এনেছে স্রোতের উপর। বড খালে এমন ঘোলা পানি কখনো দেখেনি মালু।
মিঞা পুকুরের কোণে সেই গাব গাছের তলায় দাঁডান মানুষটাকে দূর থেকেও চিনতে কষ্ট হয় না মালুর। পোশাকে একটুও বদলায়নি ফেলু মিঞা, পরনে সেই রঙিন সিল্কের বর্মি লুঙ্গি, গায়ে মলমলের পাঞ্জাবী। বুক পকেটে তেমনি ভাঁজ করা রুমাল। ছডির বাঁটের উপর হাত দুটো যেন বিশ্রাম নিচ্ছে।
কিন্তু, অমন একনিষ্ঠ দৃষ্টির ব্যাকুলতায় দখিন ক্ষেতের ফাটল চেরা বুকে কি খুঁজছে ফেলু মিঞা?
সুমুখ দিয়েই পাডে উঠে এল মালু। ফেলু মিঞা যেন নজরই করল না। ততক্ষণে রিক্ততার হাহাকার ভরা দখিন ক্ষেত ছেডে ফেলু মিঞার দৃষ্টি কি এক উদাসীনতায় ছডিয়ে পডেছে অনেক দূরে, তালতলির তালসারির মাথায় স্তব্ধ হয়ে থাকা দিগ্বলয়ের দিকে।
আলিবর্দির বাংলা বুঝি ফিরে এলনা ফেলু মিঞার জীবনে। মোগল পাঠানের রক্ত সেই যে পানসে হয়ে গেছে, শরাবী তেজে গরম হয়ে উঠল না সে রক্ত। শেষ দানেও হেরে গেছে ফেলু মিঞা।
বৌয় গায়ের শেষ সোনাটিও ছিনিয়ে নিয়ে যে তালুকগুলো পুনরুদ্ধার করেছিল ফেলু মিঞা সে সব তালুক প্রজাহীন, জনহীন কবরখানা। জমিগুলো সমর দফতরের হুকুম দখলে।
ব্যর্থ ফেলু মিঞা। শস্যহীন ওই দখিন ক্ষেতের মতোই বুঝি ফাটল-চেরা, দীর্ঘশ্বাস-ভরা ফেলু মিঞার বুকের ভেতরটা। হয়ত তাই দখিন ক্ষেতের সাথে আজ তার নতুন মিতালী। বুঝি মিঞাবৌর সেই গয়না বেচা টাকায় ফেঁপে উঠেছে রামদয়ালের কারবার, লাল হয়ে উঠেছে রামদয়াল। ধূর্ত রামদয়ালের কূট বুদ্ধিটা অনেক দেরীতে ধরা পড়ল ফেলু মিঞার চোখে। রমজানের বেইমানীটাও।
দখল করা জমির ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে যুদ্ধ-দফতর। এই অঞ্চলের সে সব লেনদেনের মাধ্যম রমজান। এক কানি জমির ক্ষতিপূরণ পেয়ে হয়ত তিন কানি জমির ক্ষতি পূরণের রসিদে টিপসই দিচ্ছে অজ্ঞ কৃষক। এক ঘরের টাকা নিয়ে পাঁচ ঘরের টাকা বুঝে পেয়েছে বলে লিখে দিচ্ছে রমজানের হাতে। তবু কিছু নগদ টাকা তো পাচ্ছে তারা? ভাগ্যিস ছিল রমজান, নইলে ওই ফৌজী দফতরের ধারে কাছেও কি ঘেঁসতে পারত ওরা?
সেই রমজান পুরাতন মুনিবকে ভোলেনি। ও এসেছিল। কসম খেয়েছিল,

অন্যের বেলায় যাই করুকনা কেন, জন্মাবধি যার নিমক খেয়েছে তাঁর হক পয়সার এক পয়সাও এধার ওধার করবেনা ও।

আল্লার বরকতে রুজি তার কম নয়।

চোপরাও বেইমান! টাকার কি আমার কমতি আছে? রেগে গেছিল ফেলু মিঞা, খেদিয়ে দিয়েছিল রমজানকে।

সন্ধ্যা নামছে আবছায়া। মগরেবের আজান দেবে বলে ওজু করছে হাফেজ সাহেব। মসজিদটার কাছে এসে পেছন ফিরে দেখল মালু, গাব গাছের তলায় নিশ্চল মূর্তির মতো এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে ফেলু মিঞা। এসেছিস মালু? আয় জলদি দুটো খেয়ে নে। জোয়ারের সময় এল বলে। কোন কিছু বলবার বুঝবার আগেই মিঞা বৌ হাত ধরে ওকে নিয়ে এল রসুই ঘরে। পিঁড়িতে বসিয়ে এগিয়ে দিল ভাতের থাল।

দুটো সুটকেশ আর ছোট্ট একটা বিছানা বেঁধে তৈরী মিঞা. বৌ।

কোথায় যাবে মিঞা বৌ? আগামাথা হদিস পায়না মালু। জিজ্ঞেস করতেও কেমন যেন বাধে মালুর।

হাত ধুয়ে মালু বেরিয়ে আসতেই বলল মিঞা বৌ, চল।

কোথায় চলবে তার নেই কোন ঠিকানা। তবু সুটকেস দুটো হাতে তুলে নেয় মালু।

সুমুখে মিঞা বৌ। বগলে তার ছোট্ট বিছানাটা। মাঝখানে মালু।

পেছনে মিঞা বৌর বাঁদি, সেই বিশ বছর আগে বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল মিঞা বৌ। বাঁদির হাতে পানদান আর খাবার ভর্তি একটি টিফিন ক্যারিয়ার। অন্ধকারের আড়াল নিয়ে বাড়ির পেছনের সুপারী বাগিচার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

আগা গোড়া যেন একটা রহস্য, ওই আবছা আঁধারটার মতোই দুর্ভেদ্য। ওরা কি পালিয়ে যাচ্ছে?

ছোট্ট বিছানাটা কিছুতেই মিঞা বৌর হাতে থাকতে চাইছে না। বার বার খসে পড়ছে, খুলে গেছে চিকন রশির বাঁধনটা। হোকনা ওইটুকু বোঝা, পারবে কেন মিঞা বৌ সামলাতে? জীবনে যে এক ঘটি পানি তুলে আনেনি পুকুর থেকে, টিপকলে দেয়নি একটুখানি চাপ তার পক্ষে একটি কম্বল, একটি বালিস, একটি চাদরের বোঝা, সে তো বিরাট বোঝা।

আর বুঝি চুপ থাকতে পারেনা মালু। লম্বা কদমে এগিয়ে এসে বলল, মামী, আমরা চলেছি কোথায়?

বড় খালে সাম্পান বাঁধা আছে। এর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার মনে করলনা মিঞা বৌ।

দখিনের ক্ষেতে নেমে ওরা পাশাপাশিই চলে। ডান হাতের স্যুটকেসটা মাটিতে রেখে মালু এক রকম ছোঁ মেরেই মিঞা বৌর হাত থেকে বিছানাটা নিয়ে নেয় নিজের বগলে। স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে আবার চলতে থাকে। তবু হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে মিঞা বৌর। সাণ্ডেলের ষ্ট্রাপটা ছিঁড়ে গেছে। বাঁদির হাতে উঠেছে স্যাণ্ডেল জোড়া। এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো ফাটা মাটির কামড়ে বুঝি ক্ষত বিক্ষত শরীফজাদির নরম পা। বার বার হোঁচট খেয়ে টলে পড়ছে। কি এক দোজখের আগুন যেন পিছু তাড়া করেছে, তাই মরিয়া হয়ে ছুটছে অন্তপুরবাসিনী হালিমা বিবি। মরিয়া হয়ে ছুটছে ওরা অন্ধকারে।

মালুর চোখে এ যেন একটা অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় দৃশ্য। মিঞা খানদানের কোন্ বৌ পাল্কী ছাড়া অন্দরমহলের বাইরে পা দিয়েছে? সেই মিঞা বাড়ীরই মিঞা বৌ পালাচ্ছে? কথাটা ভাবতে গিয়েও মালুর গাটা কাঁটা দিয়ে যায়।

চেনা মাঝি, মিঞাদেরই রাইয়ত। ওরা উঠতেই ছেড়ে দিল সাম্পান। ছইয়ের ভেতর বিছানা পেতে দিল বাঁদি। শুয়ে পড়ল মিঞা বৌ।

গলুইয়ের উপর বসে জলো হাওয়ার পরশ নেয় মালু।

কালো ঢেউয়ের বুকে দোল খেয়ে খেয়ে সাম্পান চলে। ছলাৎ ছলাৎ সাম্পানের পিঠে আছড়ে পড়া পানি লাফিয়ে ওঠে। কনা কনা ভেঙে পড়ে মালুর গায়ে।

ছপ ছপ ঝপ ঝপ বৈঠা পড়ছে আর সাম্পানের সেই পরিচিত ধ্বনির তরঙ্গটা মিষ্টি এক ডাকের মতো ছড়িয়ে পড়ছে দূর দূরান্তে—ক্যাঁক কুর ক্যাঁক কুর।

নৌকোর চেয়ে সাম্পানটা অনেক সুন্দর, অনেক আরামের, যেন আজই প্রথম মনে পড়ল মালুর। স্বচ্ছন্দ মরালগতি সাম্পানের। মনোরম তার ভঙ্গি। লগির উটকো ঠেলায় নৌকোর মতো কেঁপে দুলে টক্কর খেয়ে চলে না। তর তর করে চলে সাম্পান গর্বিত গ্রীবা রাজহংসের মতো। উঠে বসেছে মিঞা বৌ। ছইয়ের ভেতর থেকে থেকে মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

মামী, ফেলু মামার কষ্ট হবে না? কে তার যত্ন আত্তি করবে? উনি তো বড় আয়েশী মানুষ। হঠাৎ শুধাল মালু।

তারা-জ্বলা রাতের ফিকে আঁধারে যেন চকমকির মতো দপ করে জ্বলে উঠল মিঞা বৌ। এক রাশ কথা যেন আঁচ পাওয়া বারুদের মতোই উঠে এল তার মুখ দিয়ে।

ফেলু মিঞার জন্য আবার ভাবনা? সে কি মানুষ? জানোয়ার। জানোয়ার নইলে অমন করে কষ্ট দেয় বৌকে? যুদ্ধের ডামাডোল লাগতেই ছেলেমেয়েগুলোকে মিঞাবৌ পাঠিয়ে দিয়েছিল ওদের মামার বাড়ি। নইলে ওগুলো হয় মানুষ খেকোদের হাতে পড়ত, নয়ত উপোসে মরত। মিঞাবৌ অনেক সয়েছে, এখন মরতে রাজি নয়। শ্বশুর বাড়ি থেকে কত তাড়া এসেছে—যুদ্ধের হট্টগোল ছেড়ে নিরাপদে এসে থাক। কিন্তু শ্বশুর বাড়ি উঠে আসতে সায় দেয়না ফেলু মিঞার খানদানী রক্ত। খেসারতের টাকাটা এনে নিরাপদ অঞ্চলে একটা বাড়ি, তাও করবেনা ফেলু মিঞা। ভাইদের কাছেও যাবে না। সবই তার জিদ। বেশ পড়ে থাকুক ফেলু মিঞা তার জিদ নিয়ে! মিঞা বৌ চলল কুমিলা, তার বাপের বাড়ি। ছেলেগুলোকে তো মানুষ করতে হবে! দালানের খসে পড়া চুনবালি খেয়ে অনায়াসেই বাঁচতে পারবে ফেলু মিঞা। এ সব লোক কি কখনো মরে? মরেনা। বৌদের কষ্ট দেবার জন্যই বেঁচে থাকে এরা।

অন্তপুরের বধু যেন খুঁজে পেয়েছে তার মুখ। সে মুখে লাগাম নেই আজ। কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে বেশী অবাক মানে মালু। গাব গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই নিশ্চল মূর্তিটাই কখন টেনে নিয়েছে ওর মনের সবটুকু সহানুভূতি। মনের পট থেকে মালু কিছুতেই মুছে ফেলতে পারেনা ফেলু মিঞার সেই উদাস চোখের সবখোয়ানো দৃষ্টিটা।

সাম্পান চলে মরাল গতি। ক্যাঁককুর ক্যাঁককুর, তার গানের ডাকে ভেঙ্গে যায় রাতের ঘুম। কালো পানির বুকে তারার চিকিমিকি।

কুমিলা স্টেশানের টিকেট ঘরটার সুমুখে দাঁড়িয়ে কেন যেন মনে হল মালুর কলকাতার বড় কাছাকাছি এসে পড়েছে ও! কলকাতাটা যেন কুমিলার পাশেই। এত কাছাকাছি এসেও কলকাতা যাবেনা মালু?

তক্ষুণি মনটা বেঁধে ফেলল মালু। গান নেই, রাণুদিরা নেই, তালতলিতে ফিরে যাবার অর্থ হয় না কোন। তা ছাড়া কলকাতায় তো ওকে যেতেই হবে, গানের জন্য। যেন এক ঝলক রোমাঞ্চিত বাতাস নেচে যায় মালুকে ঘিরে।

কিন্তু টিকেটের দাম শুনেই বুকটা ওর পানি হয়ে যায়। কুল্লে তিনটি টাকা

মাত্র সম্বল। বাপের বাড়িতে পেট ভরিয়ে খাইয়ে ওকে বিদেয় দেবার সময় টাকা তিনটি ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিল মিঞা বৌ। মালুকে ফিরে যাবার ভাড়া আর কিছু নাশতা পানির পয়সা, এ টাকায় তো আর কলকাতা যাওয়া যাবে না?

একটার পর একটা ট্রেন আসছে, যাচ্ছে। সৈন্য বোঝাই, মাল বোঝাই ট্রেন। কচিৎ যাত্রীবাহী গাড়ি। স্টেশনের ভীড় থেকে একটু আলাদা হয়ে নানা কথা ভাবে মালু আর পস্তায়।

ছুটি বছর কাজ করল রামদয়ালের দোকানে। মাসে বড়জোর তিনটে টাকা মালু খরচ করেছে। বাকী সব টাকাই তো ও জমা রেখেছে রামদয়ালের তহবিলে। আফসোস হয় মালুর, অন্ততঃ পাঁচটি টাকাও যদি আপদ বিপদের জন্য রাখত সঙ্গে, তা হলে আজ এমন ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পস্তাতে হত না।

আবার একটা ট্রেন এল। ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ল। একটা ঝাঁকুনী খেয়ে থেমে গেল। গাড়িটার শেষের দিকে গদী আঁটা রং করা সুন্দর সুন্দর কামরা।

সেই কামরার একটি দরজা খুলে গেল। মালু দেখল, জমকাল পোষাকপরা একটি মেয়ে প্রসাধনীর বিচিত্র চটকতোলা মুখ বাড়িয়ে হাঁসছে। হাত ইশারায় কাকে যেন ডাকছে ও। মেয়েটির পাশে একটি লাল মুখ সাহেব। প্লাটফর্মের ইতর ভীড়টার দিকে নাক উঁচিয়ে চেয়ে রয়েছে সাহেব।

মালুর মনে হল ওকেই যেন ডাকছে মেয়েটি। বুঝি ভুলই করছে মালু, নিশ্চয় আস-পাশের অন্য কেউ মেয়েটির ইশারার লক্ষ্য। সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে চেয়ে দেখল মালু। পেছনে খাকি পোষাক একটি লাল মুখ, কোমরে হাত রেখে পাইপ টানছে। মালু নিশ্চিন্ত হল ওই সাহেবটাকেই ডাকছে মেয়েটি।

মেয়েটি নেমে এল। মালুর সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হুরমতি?

এই জনারণ্যে বাঘ পড়লেও বুঝি এতটা চমকে উঠতনা মালু।

ঠোঁটে রং লেপেছে হুরমতি। কাউফলের কোয়ার মতো রসমেদুর টুকটুকে লাল ঠোঁট। চোখের নীচে গালের টোলে হাল্কা পৌঁচের গোলাপী আভা। নিটোল দেহের উদ্ধত ভাঁজে সিল্কের পাতলা সাড়ির বাঁধনটা যেন নিলাজ আমন্ত্রণ। কাঁধের কিনার ঘেঁসে পিঠ ছুঁয়ে আচলটা ওর নেবে এসেছে মাটি অবধি। আঁচলের লতাপাতা আঁকা প্রান্তটা লুটোচ্ছে ধুলোয়। জুতো পরেছে

হুরমতি। গোড়ালী তার এক বিঘতেরও উঁচু। অমন জুতো মালু দেখেনি এর আগে। সব মিলিয়ে বাকুলিয়ার হুরমতি সুন্দরী আজ বিশ্বের অপরূপা।
কিরে ভূত দেখলি নাকি? শুধাল হুরমতি।
ভূত দেখলেও কি আর অমন তাজ্জব বনত মালু?
বাহ্। কোঁচা ঝুলিয়ে দিব্যি বাবু সেজে চলেছিস কই? মালুকে নিরুত্তর দেখে আবারও শুধায় হুরমতি। যেন মালুকে কথা বলানোর জন্যই সুন্দর হাতের দুটো আঙ্গুল দিয়ে মালুর চিবুকটা ছুঁয়ে দেয় হুরমতি।
স্টেশন ভর্তি লোকের সুমুখে এ কী কাণ্ড হুরমতির। কলকাতা যাচ্ছি, কোন রকমে উচ্চারণ করে মালু।
ও, সে জন্যই এমন বাবুর মত সেজেছিস? কই, মালপত্র কোথায় তোর? হঠাৎ হুইসেল বাজে। অস্থির হয়ে ওঠে গোরাটা। গাড়ি থেকে দু কদম এগিয়ে এসে কফ-জমা গলায় চেঁচিয়ে চলে ও—হুরমাট হুরমাট।
চট করে হাতের ব্যাগটা খুলে ফেলল হুরমতি। একখানি দশ টাকার নোট মালুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল: যাচ্ছিস বিদেশে, সঙ্গে রাখ, কাজে লাগবে।
সাহেবটার হাত ধরে গাড়িতে উঠে যায় হুরমতি। উঠতে উঠতে বলে: রাবু আপা আরিফা আপাকে সালাম দিবি। খালাম্মাকে কদমবুচি।
তুই ভাল থাকবি। বাকী কথাগুলো চাপা পড়ে যায় রেল গাড়ির চাকার নীচে।
চলতি গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখখানি বাড়িয়ে রাখল হুরমতি। ছলছলিয়ে ওঠল ওর চোখ জোড়া। দু ফোঁটা পানি ঝরে পড়ল। বাতাসের গায়ে মিলিয়ে গেল।
চমকে উঠে নিজেকেই যেন শুধাল মালু: জল কেন হুরমতির চোখে?

নে ধর, 'বন্ধুর নায়ে নীল বাদাম।'
মালু ধরে এবং গেয়ে চলে। গাইতে গাইতে এক সময় শেষ লাইনেও এসে পড়ে।
অশোক ততক্ষণে তবলার গায়ে হাঁতুড়ি পিটতে লেগেছে। হঠাৎ তবলা ছেড়ে বেহালার ছড়টা গভীর মনযোগে নিরীক্ষণ করছে। ধর বলে যে গানটা ধরিয়ে দিয়েছে মালুকে সেদিকে খেয়ালই নেই তার।

এমনিই স্বভাব অশোকের। ফড়িংয়ের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলা। নির্দিষ্ট পেশা নেই তার। নেশাও নেই। গান বাজনা নিয়ে মেতেছে তো মেতেই রইল। কিন্তু, সে আর কদ্দিন। বড়জোর ছয় মাস। তারপর হয়ত লেগে গেল দোকানের কাজে। দুপুরুষের পারিবারিক ব্যবসা। মাঝে মাঝে হাজিরা দিলেই চলে। কিন্তু না, অশোক যখন মেতেছে তখন দিন নেই রাত নেই, শুধু দোকান আর দোকান। ভূতের মতো খাটবে। সবাইকে তটস্থ করে ছাড়বে।

তারপর যেই অশোক সেই অশোক। দোকানের ত্রিসীমানায় কেউ দেখবেনা ওকে, দেখবে হয়ত কোন স্বদেশী মিছিলে বজ্রমুষ্টি উঁচিয়ে স্লোগান হাঁকছে।

হঠাৎ একদিন হয়ত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল অশোক। বেঁধে নিল ছোট-খাট একটা বোঁচকা। চাবিটা মালুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল: ওই দেরাজে টাকা আছে। আমি চললাম।

অশোক চলে চলে গেল নবদ্বীপ অথবা কৈখাটোরে। এমনি করেই চলছে। বছর ঘুরে বছর আসে। আবার বছর ঘুরে যায়।

কিন্তু এ রকম উড়নচণ্ডী লোকের সাথে কদিন থাকবে মালু? কেমন করে থাকবে? একটু থিতি নেই, না মনে, না কাজে। যেন আহ্লাদী খোকা, নতুন নতুন খেলনা, নতুন জামা কাপড়, দেখলেই অমনি পুরনোটা ফেলে ছুটল নতুনটার পেছনে।

অভাব যার নেই আর নেই বড় কিছুর তাগাদা, এ বিলাস তাকেই পোষায়। কিন্তু মালুতো হাঁপিয়ে উঠেছে অশোকের মেসে।

শিয়ালদহ থেকে নেমে বৌবাজার ষ্ট্রীটের মুখস্ত করা ঠিকানাটা খুঁজে বার করতে বেগ পায়নি মালু। সন্দেহ ছিল, ভয় ছিল, না জানি ওকে কী ভাবে নেবে অশোক।

কি রে এ্যাদ্দিন পরে তোর কলকাতা আসার কথাটা খেয়াল হল বুঝি। মালুর সমস্ত আশংকা অমূলক করে ওর কাঁধে হাত রেখেছিল অশোক।

সিঁড়ির গোড়ায় সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল অশোক। বেরুচ্ছিল কোথায়। কিছু খুচরো পয়সা আর ঘরের চাবিটা মালুর হাতে দিয়ে বলেছিল: বোমার ডরে চাকর বামুন ভেগেছে। নীচের হোটেলেই খেয়ে নিবি। পাশের ঘর দুটো আমার। বই আছে, ভাল লাগলে পড়বি, নতুবা ঘুমোবি।

মাঝ সিঁড়ি থেকেই আবার লম্বা লম্বা লাফে উঠে আসে অশোক। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেয়। দেয়ালেরও কান আছে, বুঝি সে কথাটা মনে করেই

মালুর মুখের কাছে মুখ এনে বলল : মেসটা কিন্তু হিন্দু মেস। তোকে হিন্দু পরিচয়ে থাকতে হবে। বুঝলি ?

ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে মালু। বাকুলিয়া গ্রামের সৈয়দ বাড়ির মুন্সিজীর ছেলে আবদুল মালেক ওরফে মালু, কে না চেনে ওকে। এ কি বাহাত্তুরে কথা, কলকাতা শহরে এসে ওকে হিন্দু সাজতে হবে ?

কয়েকটা বাজে লোক আছে এখানে। গোঁড়া আর মুসলিম বিদ্বেষী, তাই। ব্যাপারটা মালুকে আর একটু স্পষ্ট করে সমঝিয়ে দিল অশোক।

আশ্চর্য হয়েও ব্যাপারটায় একটা কৌতুকের গন্ধ পায় মালু। অভিনয় করতে কখনো খারাপ লাগে না ওর। ও বলল, বেশ তো।

জাত ? শুধাল অশোক।

জাত বৈদ্য। নাম মলিন কুমার দাশগুপ্ত ওরফে মালু। পিতা মৃত শ্রীবিজন কুমার দাশগুপ্ত। গড় গড় করে বলে যায় মালু। যেন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

বেশ বেশ। মালুর উপস্থিত বুদ্ধিতে খুসি হয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে গেছিল অশোক।

প্রথম ঘরটা অশোকের শোবার ঘর। মামুলি বিছানা। মামুলি কয়েকখানি কাউচ। কিন্তু দ্বিতীয় ঘরে ঢুকে তাজ্জব বনেছিল মালু। সেই তালতলির ক্লাবের মত দুনিয়ার যত বাদ্যযন্ত্র, কোনটার গায়ে গিলাপ, কোনটা নাঙ্গা গায়ে মসৃণ সুন্দর। সতরঞ্চি পাতা মেঝের অর্ধেকটাই ওদের দখলে। আর দেয়ালের গায়ে গায়ে কাঁচ ঢাকা তাক। তাকে তাকে বই। অজস্র বই। এত বই এক সাথে কখনো দেখেনি মালু।

ওই ঘরটায় থাকবি তুই, বলেছিল অশোক।

ওই ঘরে ? ওই বাদ্যযন্ত্র গুলোর সাথে একই সতরঞ্চিতে ? মালু বুঝি বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুসি ওর ধরছিলনা।

যখন খুসি তুলে নাও একটি যন্ত্র। বুলিয়ে দাও হৃদয় নিঙড়ান একটি স্পর্শ। ওরা কথা কয়ে উঠবে। তোমার অব্যক্ত যত কথা নানা সুরে নানা ঝংকারে জানিয়ে দেবে মানুষের পৃথিবীটাকে। তোমার মনের কান্নায় কেঁদে উঠবে ওরা। তোমার খুসির ছোঁয়ায় নেচে উঠবে ওরা। অথবা টেনে নাও হারমোনিয়ামটা। আপন মনে গান ধর।

নাঃ হারমোনিয়ামটা এবার ছোঁবেই না মালু। প্রথম থেকেই এই যন্ত্রটার প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণা ছিল মালুর। অথচ অশোক, রাণু, তালতলির

ছেলেমেয়েরা ওই যন্ত্র না হলে নাকি গাইতেই পারে না ওরা। আর ওদের দেখাদেখি তালতলির দু বছরে মালুরও কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, গানের সুর ভাঁজতে হলেই হারমোনিয়ামটা টেনে নেয় ও। এবার সেই বদ অভ্যাসটা কাটিয়ে, মনে মনে সেদিন ঠিক করেছিল মালু।

আর ওই বইগুলো? সেও এক বিস্ময়। তুমি শুয়ে থাকবে, অথবা বসে, চারিদিকে তোমাকে ঘিরে বই আর বই। অভিজ্ঞতাটা কেমন প্রত্যক্ষ ভাবে জানবার জন্য অধীর হয়েছিল মালু। ওই বইয়ের জগৎটাও দুর্নীবার আকর্ষণে টেনে নিয়েছিল মালুকে।

সেই চেনা জীবন। বড় খালের ধারে ধারে আবাল্য-পরিচিত দুনিয়াটা। অকস্মাৎ সেই চেনা জানার দুনিয়াটাকে পেছনে ফেলে মালু যেন নতুন জগতে ঠাঁই পেল। এখানে ক্রূরতা নেই। নিষ্ঠুরতা নেই। এখানে যুদ্ধ নেই। এখানে রমজান নেই, রামদয়াল নেই। এখানে ভাল লাগার জনদের স্মৃতির ছোঁয়ায় মন আর্দ্র হয় না, অকারণে কান্না পায় না। এখানে বাবু নেই, রাণু নেই। এখানে শুধু গান, এখানে শুধু সুর। এখানে অনেক বই। আর মালু স্বয়ং। এ জগৎটা সম্পূর্ণ ভাবেই ওর আপনার এ জগতের সে-ই একমাত্র অধীশ্বর।

মধুর এক অস্থিরতা, মিষ্টি এক উত্তেজনা। প্রথম রাতটা তো ভাল করে ঘুমোতেই পারেনি মালু।

যুদ্ধের বাকী বছরগুলো এ ঘরটাতেই তো কেটে গেল মালুর।

গানে আনন্দে, বাদ্যের বোলে, জাপানী বোমার ভয়াক্রান্ত কোলকাতার অন্ধকারে। আর সাধ্যমত বই পড়ে। স্কুলে পড়া বিদ্যার পরিধিটাকে নিজের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিয়ে।

কিন্তু আজ? ওই ঘরের রুদ্ধ হাওয়ায় মালুর যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। মনের ভিতর কি যেন গুমরে মরছে সারাক্ষণ। কি এক যন্ত্রণা ওর বুকের ভেতর বাসা বেঁধে অস্থির করে তুলেছে ওকে! কোথাও ছুটে যেতে চায় মালু। কিন্তু কোথায়? সে তো জানা নেই ওর।

এই মেসে আসার কয়েক মাস পরই অশোকের রান্নার দায়িত্বটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল মালু।

ভীষণ আপত্তি করেছিল অশোক।

মালু বলেছিল, হাতে পায়ে একটু মেহেন্নত না করলে শরীরটা আমার বিশ্রী লাগে অশোকদা। তা ছাড়া আপনিই বা হোটেলে খাবেন কেন?

আসলে শরীরের চেয়ে মনটাই বুঝি ওর বিশ্রী লাগছিল বিনা শ্রমে অন্যের ভাত গিলতে।

বুঝেছি। কিছু করে খেতে চাস তুই। বেশ তো। হেসেছিল অশোক।

একটি একটি করে ঘরের সবগুলো কাজই মালুর হাতে এসে পড়েছিল। ঘর ঝাড়া, ঘর মোছা। বাজার করা, রান্না করা। লণ্ড্রীর হিসেব রাখা, জিনিস-পত্র জামা কাপড় গুছিয়ে রাখা।

তুই তো দেখি ছোটখাট একটা সংসার গড়ে তুললিরে। খুসির সুরেই বলতো অশোক।

এসব কাজ করেও অঢেল সময় থাকতো মালুর হাতে। সে সময়টা গান বাজনায় আর বই পড়ে কেটে যেত।

মাঝে মাঝে বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসর বসাতো অশোক। গানের চেয়ে হয়তো হৈ চৈ টাই হত বেশি। কিন্তু কখনো কখনো রীতিমত ওস্তাদ গাইয়ে জুটে যেত। সে সব দিন অদ্ভুত ভাল লাগতো মালুর।

এর মাঝে বার তিন উধাও হয়েছিল অশোক। একবার এর্ণাকুলামে। একবার সিকিমে। আর একবার উদয়পুরে। চার ছয় মাস করে একেবারে লা পাত্তা হয়ে থাকতো অশোক। মালু তখন নিজের রাজা।

সবচেয়ে বিপদে পড়তো মালু বইয়ের তাকগুলোর সুমুখে দাঁড়িয়ে। কাঁচ রুদ্ধ বইয়ের জগৎটা যেন সারাক্ষণ হাতছানি দিয়ে ডাকতো ওকে। ওর মনে পড়ে যেত স্কুল দিনের কথা। কেন যে পড়াটা হল না ওর ভাবতে গিয়ে বদ নসিবটাকেই দূষতে হত ওর। কিন্তু নসিবের উপর সব দোষ চাপিয়ে মনটা মালুর স্বস্তি পেতনা।

মনে পড়তো মৃত মায়ের অভিসম্পাত। আলেমের ঘরেই জালেমের পয়দাস সেই প্রবাদ বচনটির উদ্ধৃতি দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন মা, পড়াশোনা হবে না মালুর। আশ্চর্য! মায়ের অভিসম্পাতটাই যেন খেটে গেল।

মূর্খই রয়ে গেল মালু।

দুরু দুরু কাঁপতো মালুর বুকটা। ভীরু ভীরু হাতে কাঁচটা সরিয়ে একটি কি দুটি বই বের করে নিত ও। কত রকমারি কিতাব। গল্প উপন্যাস ইতিহাস। ইংরেজী বাংলা। অনেক জায়গা বুঝত না মালু। অবলীলাক্রমে সেই সব দুর্বোধ্য অংশগুলো টপকে পেরিয়ে যেত মালু। বইয়ের মেলার মধ্যে বাস করে না-পড়াটা কেমন অপরাধ বলে মনে হত ওর।

গান বাজনা আর রান্না। তার সাথে বই পড়াটাও কেমন যেন ভাল লেগে গেল মালুর।

প্রায় জনশূন্য কোলকাতা। ফাঁকা ফাঁকা রাস্তায় মিলিটারী কনভয়, সৈনিকের কুচকাওয়াজ, সামরিক গাড়িগুলোর কানফাটা গর্জন! রাতের আঁধার চিরে সাইরেনের কর্কশ চীৎকার।

পুস্তক আর গানের দেয়াল ফুঁড়ে এ সব চীৎকার পৌঁছত না মালুর ঘরে। ও যেন এক গুহাবদ্ধ সাধনচারী। পৃথিবীর কোলাহল বৃথাই দেয়ালে আছড়ে পড়ত। উল্টো আঘাত খেয়ে ফিরে যেত।

কিন্তু, এ কী স্বভাব অশোকের। বই কিনেছে, এখনো কেনে, কিন্তু ভুলেও কোনদিন ছোঁয় না সে বই।

শুধু সুর কেন, সঙ্গীত কেন—যা কিছু বড় আর মহৎ, সবই দীর্ঘ সাধনার ধন। তনুমন একসাথে করে তোকে গলা সাধতে হবে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। ভুলে যেতে হবে অন্য সব কিছু, ডুবে যেতে হবে সঙ্গীতের রাজ্যে।

আজো মালুর কানে রিন রিন করে বাজে অশোকের উপদেশগুলো। অক্ষরে অক্ষরে সে উপদেশ পালন করে আসছে মালু। কিন্তু, এমন চমৎকার উপদেশটা নিজের জীবনে কেন কার্যকরী করেনা অশোকদা?

অথচ কী সুন্দর তার গলা, কত গভীর তার সুর-জ্ঞান।

একান্ত বেয়াদবি মনে করেই প্রশ্নটা অশোককে কখনো শুধায়নি মালু। আজ আর শুধাবার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এই খামখেয়ালী মানুষটির অদৃশ্য বন্ধন ছিঁড়ে ও নিজেই আজ ছুটে যাবার ব্যাকুলতায় অস্থির।

যুদ্ধ থেমে গেছে। বিশ্রী বাফেল ওয়ালগুলো ভাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে আলোর ঢাকনী। আবার আলো ঝলমল লোকারণ্য এই মহানগরী।

সকালভর এতটুকু ফুরসুত পায়নি মালু। সূর্য উঠবার সাথে সাথেই বাবুদের চিড়ে দই খাইয়ে ছুটেছে বাজারে। বাজার সেরে এসে দেখে যে হাঁড়িটায় ডাল চড়িয়ে গেছিল সেটা ধুঁয়ো উগরোচ্ছে।

বেরুবার সময় জলন্ত কয়লার উপর কিছু কয়লা-গুঁড়া ছিঁটিয়ে দিতে ভুলে গেছিল মালু। গনগনে আগুনে ডালগুলো সব পুড়ে একটা কালো পাতের

মতো হাঁড়ির তলায় চেপ্টে রয়েছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী সরিয়ে চোখ মুখ ডলতে ডলতে এক কাণ্ডই করে বসল মালু। সাত তাড়াতাড়ি খালি হাতেই পাতিলের কানিটা তুলে ধরে ও। ধপ করে পড়ে যায় পাতিলটা। ছাঁত করে ওঠে আঙুলের চামড়া। চড় চড় করে দু হাতের দশটা আঙুলের চামড়া যেন উঠে এল। সে অবস্থাতেই তরকারী কুটে বাটনা বাটতে লেগে যায় মালু।

ও দিকে পোড়া গন্ধে নাক পুড়িয়ে ক্রুদ্ধ মেস-বাসীরা বাক্য-বাণ ছুঁড়তে লেগেছে। কবে থেকে বলছি বিদেয় করে দাও ছোঁড়াটাকে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম ওর জ্বালায়। তা অশোক কি আর কানে তোলে? যতীন বাবুর গলাটাই সবাইকে ছাড়িয়ে যায়।

থর থর করে কেঁপে যায় মালুর বেড়ে উঠা শরীর। ভারী বয়ে গেছে। সে কি রাঁধুনী, না কি বাটনা বাটতে এসেছে এত দূরের কলকাতায়।

যতীন বাবু অবনী বাবু, ওরা পাঁচজন। সেই প্রথম এসেই এই মেসে ওদের দেখেছিল মালু। হোটেলেই খেত ওরা। কিন্তু, কেমন করে যেন ওরা অশোককে ভজিয়ে ভুজিয়ে ওরই সাথে খাবার ব্যবস্থা করেছিল। মালুর মতামতটা জিজ্ঞেস করেনি অশোক। তবু খুসি হয়েই তো ওদের পাকশাক এদ্দিন ধরে করে আসছে মালু।

মাইনের কথা অবশ্য ওরা তুলেছিল। মালুই বলেছিল—দরকার নেই, যা দেবার অশোকদাই তো দেয় আমায়।

কিন্তু, ওই যে কথায় বলে বসতে দিলে শুতে চায়। তাই হয়েছে যতীন বাবুদের অবস্থাটা। যুদ্ধের সময় কোথায় ছিল ওই মেজাজ? দাদা ভাই পিঠ চাপড়ানী, মালুকে তখন কত খাতির, কত তোয়াজ। সেই দুর্দিনের উপকারটা আজ বেমালুম ভুলে গেছে ওরা।

শালা বেইমান আর বলে কাকে! আপন মনেই বিড় বিড় করে মালু। পোড়া আঙুলগুলো জ্বলছে। কিছু ন্যাকড়া কুড়িয়ে আঙুলগুলো প্যাঁচিয়ে নিল মালু।

খেতে বসে ক্ষেপে বেগুনে হল যতীন বাবু। এ্যাঁ, ইলিশ মাছে পেয়াজ? বাবার জন্মে কেউ শুনেছে, না দেখেছে? ডাল? ডাল কই? র‍্যাশনের এই কটকটে চালের ভাত ডাল ছাড়া গেলা যায়?

মনে মনে হেসে বুঝি কুটি পাটি খায় মালু। আঙুল দিয়ে অবাধ্য ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরে ও। বাছাধন, এতটি বছর যে ইলিশে পেয়াজ খেলে সে কি বোমার ভয়েই লক্ষ্য করনি এদ্দিন?

ইস্, দেখ শালার কাণ্ড। ঘাট বেঁধেছে না ওর মুণ্ডু। ডাঁটাগুলো একেবারেই

কাঁচা, কচ কচ করছে। কুমড়োগুলোও যদি সেদ্ধ হত···ওহে গাঙ্গুলী দেখতো একটা ভাল চাকর। এতবড় যুদ্ধের ফাঁড়াটা কেটে গেল. এবার দেখছি এ ব্যাটার জুলুমেই অক্কা পেতে হবে। না খেয়ে উঠে যায় যতীনবাবু।

কেমন জব্দ। কেমন জব্দ। কি এক নির্দয় খুসিতে পোড়া আঙ্গুলের জ্বালাটাও তখনকার মতো ভুলেও যায় মালু।

আজকের মধ্যেই ঠেঙ্গিয়ে বের করছি তোকে। কোঁচাটা গুটিয়ে অফিসের পথে রাস্তার দিকে ছুটতে ছুটতে জানিয়ে যায় যতীনবাবু।

হুঁ। খুব জানা আছে মালুর। ওই লম্ফঝম্ফই সার। আশি টাকার কেরানী বিনে মাইনের চাকরের হাতে কাঁচা কচুও গিলতে পারে!

দিনে অশোকের ফেরার কথা ছিলনা। কিন্তু রাতেও ফিরল না অশোক। অনেকক্ষণ খাবার পাহারা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল মালু।

অশোক ফিরল পরদিন সকালে, যখন রোববারের কলতলায় কেরানী বাবুদের কাপড় কাঁচার ধুম লেগেছে। সঙ্গে ওর গণ্ডা দেড়েক বন্ধু। ওদের নিয়ে বুঝি আসর বসবে আজ।

ওদের চা দিয়েই বাজারে চলে গেল মালু।

বাজার থেকে ফিরে আবার চায়ের ফরমাশ পেল মালু।

আসর ওদের গুলজার। ওরা শিক্ষানবিস। ওই কোন শৃঙ্খলার বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। ঐক্য নেই। তবলা সারেঙ্গী তানপুরা, যার যেটা পছন্দ কোলে নিয়ে বসে গেছে। মহড়া দিচ্ছে সদ্য শোনা কোন যন্ত্র সঙ্গীতের। নীচে তখন ঝুপ ঝাপ মেস বাবুদের সমবেত গোসলের শব্দ আর হৈ হাঁক। মালুর মনে হল সেই শব্দ কোলাহলের সাথে পাল্লা দিয়েই অশোকের বাদ্যযন্ত্র-গুলো সুরের কলহ জুড়েছে।

পোড়া আঙ্গুলের জ্বালাটা এখন একটু কমেছে মালুর। কিন্তু, ফোসকা পড়ে গেছে কয়েকটা আঙ্গুলে। তবু যত্নের সাথেই রান্না করল মালু।

রোববার। হপ্তায় ওই একটি দিনই বাবুদের একটু ভাল খাওয়া, অর্থাৎ, অন্য দিনের চাইতে একটু বড় মাছের টুকরো, মুগ ডালে মাছের মুড়ো, একটা ভাজি, একটা তরকারী। তা ছাড়া অশোক, অশোকের বন্ধুরাও খাবে। ওদের জন্য আলাদা করে কিছু মাছও ভেজে নিল মালু।

রান্নার পাট তুলে স্নান করে নিল মালু। গাঙ্গুলী মশায়কে খাইয়ে দিল। উনি চলেছেন শহরতলীতে আত্মীয় দর্শনে। অন্যদের তাড়া নেই।

যতীন বাবু এখনো ফেরেনি। খাবার আসন সাজিয়ে একটি বই নিয়ে বসল

মালু। দু চার পাতা পড়তে না পড়তেই বুঝি ঝিমুনি এসে গেল ওর। হঠা
একটা সোরগোল উঠল। ঝিমুনি ভেঙ্গে গেল মালুর। বই বন্ধ করে মাি
তাড়ায় ও। আর উৎকর্ণ হয়। দরজার দিক থেকে ভেসে আসছে যতী
বাবুর উত্তেজিত গলা।

তক্ষুনি আমার সন্দেহ হয়েছিল। যে হারে পেয়াজ খায়, ব্যাটা মুসলমা
না হয়েই যায় না। কেউতো গ্রাহ্য করলে না আমার কথা। এখন? এখ
জাত ধর্ম সব খোয়ালে তো?

বড় মেসবাড়ি। বাসিন্দার সংখ্যা কম নয়। রান্না হয় পাঁচটা আলাদা পাকে
হট্টগোল শুনে পিল পিল করে বেরিয়ে আসে সবাই। এক তলার বারান্দ
আর খোলা উঠোনে রীতিমত ভীড় জমে যায়।

নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ প্রৌঢ় তারিণী বাবু। মেসে থাকলেও স্বপাকে তার আহার
খবরটা শুনে বেজায় মুষড়ে পড়েছেন তিনি। যতই দূরে দূরে থাকুক না কেন
তবু এক মেস তো? ছোঁয়াছোঁয়ি যে হয়ে যায়নি কে বলবে?

এঁ্যা, এই কাণ্ড, যেন বিলাপের স্থর তারিণী বাবুর।

কেমন ধারা হিঁদু গো তোমরা? বাড়িতে একটা জলজ্যান্ত মুছলমান রয়েছে
এ্যদ্দিন টের পাওনি? বারান্দার ভীড় থেকে কে যেন বলল।

আপনি ছিলেন কোথায়? উঠোনের ভীড় থেকে উঠে আসে তুরন্ত্ জবাব।

বাজে বকবেন না মশায়। অমন বাঁকা জবাব পেয়ে প্রথমজন বুঝি
চটেই যায়।

দ্বিতীয় জন নাছোড় বান্দা। তড়িতে পাল্টা জবাব পাঠিয়ে দিলেন তিনি:
খুব এখন হিঁদুর দরদী সেজেছেন মশায়। ওদিকে মুসলমানের হোটেলে
ঢুকে যে মুরগী খেয়ে আসেন, সেটা কিছুনা, না?

প্রথম বা দ্বিতীয় জন ভীড়ের জন্য কেউ কারো মুখ দেখছেন না। শুধু স্বর
চিনে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে চলেছেন। হয়ত আড়াল ছেড়ে স্মুখেই এগিয়ে
আসতেন তাঁরা, কিন্তু উত্তেজনাটা ততক্ষণে অন্য দিকে গড়িয়ে গেছে।

যতীনের নেতৃত্বে আস্তিন গুটিয়েছে দু তিনজন। আস্তিন গুটিয়ে পাক ঘরের
দিকে এগিয়ে আসছে ওরা।

ছাত করে ওঠে মালুর বুকটা। ওরা কি মারতে চায় ওকে? ওর গায়ের
রক্ত হিম হয়ে আসে। কিন্তু মুহূর্তেই যেন জেগে ওঠে ওর পৌরুষ সত্তাটা।
ধর শালার নেড়েটাকে, একটু হাত স্থখ করে নিই। কে যেন বলল।

না হে জীবন। ও সব মারধোরে যেও না। বাংলায় এখন লীগ মিনিষ্ট্রি,

খেয়াল আছে? ওপরের বারান্দা থেকে নেবে আসে কোন প্রবীণ বাসিন্দার হুসিয়ার কণ্ঠে।

বহুরূপী বাছাধন। লুকিয়ে লুকিয়ে আর কতদিন আমাদের জাত মারবে। দয়া করে এবার বিদেয় হও তো! ক্রোধ আর বিদ্বেষের বিকৃতি যতীন বাবুর কথায়, মুখের চেহারায়।

কিন্তু, কোথায় মালু? পাক ঘরে যে ওর টিকির চিহ্নও নেই।

এঁ্যা পালিয়েছে? এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাল কখন?

আরে মশায়, চোখ কি আপনাদের সজাগ ছিল? আপনারা তো এ ওর মুণ্ডপাত করছিলেন। কে যেন বলল।

শালা ভারি বজ্জাত তো!

না-না এ বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালায়নি। ভাল করে দেখ। চল কলতলার দিকটা দেখি তো? পাঞ্জাবীর আস্তিন তুটো আরো কয়েক ইঞ্চি গুটিয়ে কলতলার দিকে ছুটে আসে যতীন বাবু।

না। এখানে নেই।

ভাঁড়ার ঘর?

না।

পায়খানা?

সেখানেও নেই।

আরে ওই ঘরটা দেখতো? দরজাটা যেন বন্ধ ঠেকছে?

যতীন বাবুর দল হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে দরজাটার সুমুখে।

এক কালে গোসলখানা ছিল ঘরটা। বর্তমানে হাবি জাবি মালে ভর্তি। ধপাধপ কয়েকটি লাথি পড়ে দরজাটার গায়। দুর্বল দরজা ক্যাঁক ক্যাঁক আর্তনাদ তুলে কেঁপে যায়। ঝুর ঝুর ঝরে পড়ে কিছু চুন বালি। ধস করে পড়ে এক চাঙ্গড় পলেস্তরা।

দরজা ভাঙ্গার জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করে মালু।

অদ্ভুতই বটে। নড়বড়ে দরজাটা ভাঙতে ভাঙতেও একেবারে ভেঙে পড়ে না। প্রচণ্ড আঘাতের মুখে টলতে টলতেও দাঁড়িয়ে থাকছে। বুঝি একটু ভাববার অবসর দিচ্ছে মালুকে।

কিন্তু, অমন কাপুরুষের মতো পালাচ্ছেই বা কেন মালু? কেন দরজায় খিল এঁটেছে? নষ্ট করেছে ওদের ধর্ম আচার, ভুল পরিচয় দিয়েছে? বেশ তো, বিচার করুক না ওরা। নতুবা পথ করে দিক ও বেরিয়ে যাবে। যদি মারে?

স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের অন্ধকারে মুঠো দুটো শক্ত হয়ে আসে মালুর। শিনাটা সিদা করে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় ও। আহা, অশোককে একবার ডাক না। ওর লোক, যা করবার সেই করুক। একটা চিকন গলা বুঝি সুবুদ্ধির সন্ধান দেয় ওদের।
লাথালাথিটা মুলতুবি রেখে ওরা উঠে যায় দোতলায়, অশোকের ঘরের দিকে।
নিছক একটা সন্দেহ নয়। নিজ কানে শুনে এসেছে যতীন বাবু। সাক্ষী রমেন চক্রবর্তী। অশোকের কামরার পরের কামরার পরেরটায় একেবারে দক্ষিণের সিটে থাকেন যে রমেন চক্রবর্তী, তিনিই। তিনিও ছিলেন যতীন বাবুর সাথে।
সেই যে রাকীবুদ্দিন ভদ্রলোক, অশোকের আসরে হামেশাই যাকে দেখা যায়? তিনিই তো ফাঁস করে দিয়েছেন আসল কথা। শিয়ালদহর মোড়ে দেখা তাঁর সাথে। যতীন বাবুকে দেখেই বললেন: ভালই হল আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল। যাচ্ছিলাম আপনাদের মেসের দিকেই।
কী ব্যাপার বলুন তো? শুধাল যতীন বাবু।
মালেককে মেহেরবানী করে বলবেন, আজই যেন দেখা করে আমার সাথে। আমার হোটেলে।
যতীন বাবু তো আকাশ থেকে পড়লেন। চেনা তো দূরের কথা, ও রকম একটা নাম এই প্রথম শুনলেন তিনি।
আরে মশায়, মালেক—আবদুল মালেক, ডাক নাম মালু। আপনাদের মেসে অশোকের ঘরেই তো থাকে ছেলেটি। খাসা একখানি গলা, গায় চমৎকার। যতীন বাবু চিনছেন না দেখে ভাল করেই চিনিয়ে দিলেন রাকীব সাহেব। মালু এবং মালেকে যে কী দুস্তর ব্যবধান সেটা বোধ হয় জানেননা তিনি।
সব শুনে অশোক থ মেরে রইল। আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছুই যেন বলার নেই তার।
নিজে না হয় জাত ধর্মো মাননা বাপু, তাই বলে 'মোছলমানের' ছেলেকে এনে মেসে জায়গা দেবে? এতগুলো লোককে ওই ম্লেচ্ছটার পাক খাওয়ালে? ছিঃ রামো: তারিণী বাবু বুকি এখুনি বমি করবেন।
নিরুত্তর অশোক। গোটা মেসটাই মারমুখো। গোটা মেসটাই কৈফিয়ত চাইছে ওর কাছে। এত দৃষ্টির ধিক্কার আর কৈফিয়ত তলবের মুখে ও বড় অসহায়।
হাবিজাবি মালের ডিপো ওই স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘরটার ভেতর একটি

সেকেণ্ড যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলে। মালু ভেবে পায়না, কেন নেমে আসছে না অশোক। কেন এই নরক যাতনা থেকে মুক্তি দিচ্ছে না ওকে। সেই যে লুকিয়েছে মালু, আট কি দশটা মিনিট কেটে গেল। আর এই কয়টি মিনিটেই যেন একটা যুগ পেরিয়ে এল মালু। অশোকদা ভাল। অশোকদা চমৎকার। কিন্তু সব ভাল লোকগুলোই কেন যেন ভীরু হয়। ভালো লোক অশোকদাও ভীরু। কী এক সংকল্পের দৃঢ়তায় কঠিন হয়ে আসে মালুর মুখের পেশী।

টুস করে হুড়কো পড়ার শব্দ হল। খুলে গেল দরজাটা। হতবাক হয়ে রইল লোকগুলো।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল মালু।

ওরা চেয়ে থাকল।

বস বস। খবরটা তা হলে পেয়েছিলে। স্নেহের উষ্ণতা রাকীব সাহেবের কণ্ঠে।

জী। কাউচের কোনায় জড়সড় হয়ে বসে মালু।

মৃদু হেসে কী এক আশাকে যেন রাঙিয়ে তোলেন রাকীব সাহেব। চোখ জোড়া তার বারেক নেচে যায় মালুর দিকে চেয়ে।

বয়স তাঁর পঞ্চাশের গা ঘেঁসে। কিন্তু মুখটাতে বয়সের ছাপ নেই। মুখে তার শিশুর সারল্য আর মিষ্টি এক কোমলতা। যখন হাসেন সে মুখ কচি সবুজের দীপ্তি ছড়ায়। কচি সবুজ দীপ্তি ছড়িয়ে হাসছেন রাকীব সাহেব।

কেন আসতে বলেছিলেন? কেন যেন জড়ান মালুর স্বরটা।

কাল সকাল সাড়ে আটটায় মাইক্রোফোনে তোমার কণ্ঠ-পরীক্ষা। শৈলেন বাবুর সাথে কথা হয়ে গেছে আমার। একটা এ্যানগেজমেণ্টও করে এসেছি আজ বিকেল চারটায়। আগে থেকে একটু পরিচয় করে রাখা ভাল। বুঝলে না?

ও, এই জন্যই এমন মুচকি মুচকি হাসছিলেন রাকীব সাহেব? আনন্দে নেচে ওঠে মালুর মন। তুচ্ছ মনে হয় একটুক্ষণ আগের লাঞ্ছনাটা। আর এই মুহূর্তেই মালু যেন স্পষ্ট করে চিনল ওর সেই যন্ত্রণাকে যা ওকে অস্থির করে তুলেছিল অশোকের মেসে। সে তো ওর সুর, ওর গান। ওরা টেনে নিতে চায় মালুকে সেই মহাজগতের দিকে যেখানে মানুষ, যেখানে

অগুনতি শ্রোতা, যেখানে ওর সকল গানের সকল সুরের সার্থকতা। অশোকের মেসে সে পথের সন্ধান পাচ্ছিল না মালু। তার অস্থির হয়েছিল, মাথা কুটে মরছিল। ওর গান, ওর সুর। সুরের হৃদয় আজ পেয়ে গেছে তার প্রকাশের পথ।

ভাবতেই কেমন লাগে মালুর। মনে মনে সে তো এই খবরটিরই অপেক্ষা করছিল গত কয়েক মাস ধরে।

তুমি তো দেখছি রেডি হয়ে আসনি। যাও, তিনটে বাজতে চলল প্রায়। এতক্ষণ আনন্দের আসমানে উঠিয়ে এবার বুঝি ওকে ধপ করে মাটিতে ফেলে দিলেন রাকীব সাহেব। কেমন করে তাঁকে বলবে মালু, ভদ্র সমাজে চলার মতো সেই যে তার এক জোড়া ধুতি আর পাঞ্জাবী, সেটা এখন উদ্ধারের অতীত?

এর চেয়ে ভাল পোশাক নেই আমার, মিথ্যে কথাই বলল মালু।

বিব্রত হয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন রাকীব সাহেব। তারপর উঠে গেলেন। ওয়ারড্রোবটা খুলে কয়েকজোড়া ধুতি-পাঞ্জাবি এনে রাখলেন মালুর সমুখে। বললেন তুমি তো আবার লম্বার ধাড়ি। আমি হলাম গিয়ে ঠিক উল্টো, বেটেখাটো মানুষ। হাঁটু সমান কয়েকটা পাঞ্জাবী আছে আমার। দেখ তো কোন রকমে ভদ্রতা রক্ষা হবে কি না তোমার? পরে দেখল মালু। কোন রকমে কোমর অবধি এসেছে পাঞ্জাবীর ঝুল। চোখে ঠেকে, তবু ভদ্রতায় উতরে যাবে হয়ত।

কি হল? মুখ বেজার কেন? ভ্রু কুঁচকে ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলেন রাকীব সাহেব। অমন চমৎকার খবর পেয়েও উৎফুল্ল হয় না ছেলেটা, বুঝি চিন্তায় পড়ে গেলেন রাকীব সাহেব।

খাওয়া হয়নি। বলেই মুখটা নীচু করল মালু। এবার হো হো করে হেসে ওঠেন রাকীব সাহেব, তা এতক্ষণে বলতে হবে?

বয় এল।

কিছুক্ষণ বাদ খাবার এল।

আজ থেকে থাকার যায়গাও গেল, খেতে খেতে বলল মালু।

কেন গেল, কি হয়েছিল, কিছুই শুধালেন না রাকীব সাহেব। এক মনে মালুর খাওয়াটাই যেন দেখে গেলেন। মালুর খাওয়াটা শেষ হলে পর বললেন! এখানেই থাকবে! কি বল?

বেশ। মালুর মুখ দেখে মনে হল না হাতে স্বর্গ পেয়ে তেমন খুসি হয়েছে ও।

কিন্তু মালু বুঝি আর মরীয়া। কতটুকুই বা পরিচয় রাকীব সাহেবের সাথে। অথচ খাবার চাইল তার কাছে। আশ্রয় চাইল। মালুর কোন কথাই যেন না বলার নয় এই লোকটার কাছে।

একটি কাজ চাই আমার, আবার বলল মালু।

কি কাজ?

যে কোন কাজ। বৌ বাজারে তো বাবুর্চি ছিলাম।

বাবুর্চি? বিশ্বাস করতে বুঝি কষ্ট হয় রাকীব সাহেবের। মালুকে তিনি দেখেছেন সুন্দর স্বাস্থ্যে, পরিষ্কার পোশাকে উজ্জ্বল এক তরুণ। কণ্ঠের সুরে যার ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি।

গায়ে গতরে খাটতে আমার আলসেমি নেই। রাকীব সাহেবের আস্থা অর্জন করার জন্যই যেন বলল মালু।

সরল মুখখানিতে এবার ভেসে উঠল কি এক ব্যথার ছায়া। চোখের কোলে যেন অপার কোন বেদনার ঠাঁই। ধরা গলায় বললেন। রাকীব সাহেব: শিল্পীর জাতটাই বড় অভাগা, মালেক। বড় অভাগা। এদের পেটে থাকে না ভাত, মাথা গুঁজবার মতো থাকে না একটুখানি আশ্রয়। তবু যে পথে অর্থ নেই, যে পথে নেই স্বচ্ছল জীবনের নিশ্চয়তা সে পথটাই আঁকড়ে থাকবে এরা।

থামলেন রাকীব সাহেব। ব্যথা ছল ছল তার চোখ জোড়া। সে চোখ গভীর এক মমতায় স্থির হয়ে থাকে মালুর মুখের উপর। বললেন, মালেক, এত কষ্টেও গান যখন ছাড়নি তুমি পুরস্কার তার পাবেই।

জাহেদের মতো অশোকের মতো রাকীব সাহেবও বুঝি ভবিষ্যতবাণী করলেন। কিন্তু, সে নিয়ে এখন ভাববার সময় নয় মালুর। অথবা রাকীব সাহেবের আকস্মিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন হয়ে চুপ করে থাকবারও অবস্থা নয় তার। ও বলল: আমার চাকরীর কি হবে?

হবে হবে। চল এখন বের হই। ওর কথাটাকে চাপা দিয়ে উঠে পড়লেন রাকীব সাহেব।

ধার করা ধুতি আর ধার করা পাঞ্জাবীতে জীবনের প্রথম পরীক্ষার প্রথম অঙ্কটা শেষ করে এল মালু।

যথা সময় অকৃতকার্যতার খবরটাও পেল।

আহা, মন খারাপ করো না। আমি বলছি, সাধনার ফল তুমি একদিন পাবেই। সান্ত্বনা দেন রাকীব সাহেব।

ফুঃ। ফাঁকা আশ্বাস। সংগ্রাম সাধনা ধৈর্য তিতিক্ষা, সেই কবে থেকে অশোকের মুখে মালু শুনে আসছে কথাগুলো। আর সেই ছোট বেলা থেকে গানই তো ওর ধ্যান মন। তবু তো রেডিও কর্তারা বলে দিয়েছেন, গলা তার এখনো উপযুক্ত হয়নি। মাইকে ফিট করে না। অডিশন বড় খারাপ হয়েছে। আরো গলা সাধতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রথম চোট খেয়েই অতটা ভেঙ্গে পড়লে? আরো কত যে চোট খেতে হবে? আবারও বললেন রাকীব সাহেব।

হুঁ, বলতে অমন সবাই পারে। সুর সরস্বতী আর লক্ষ্মী যার পায়ে লুটোপুটি খায়, গানের রেকর্ড যার ঘরে ঘরে তার তো মূল্যবান সব উপদেশ বিলানোই কাজ। কিন্তু মালু তাতে আশ্বস্ত হবে কেমন করে? ওর এতদিনের সাধনা, এত বড় আশা, যে আশায় বুক বেঁধে অচেনা কলকাতার পথে নিঃসম্বল পাড়ি দিয়েছিল ও, সবই তো নস্যাৎ হয়ে গেল এক নিমেষে। দেখ আগেই তো বলেছিলাম তোমায়, ভীষণ প্রতিযোগিতা এখানে। তার উপর মুসলমান তুমি। ভাল গায়ক-গায়িকা সবাই হিন্দু, যারা বাছাই করবেন তারাও হিন্দু, সহজে কি আর ওরা চান্স দিতে চায় কোন মুসলমানকে? মালুর অন্তর্নিহিত প্রতিভায় আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই বুঝি কথাগুলো বললেন রাকীব সাহেব।

ধোপে যারা টেকে না তাদের জন্য এ ছাড়া আর সান্ত্বনাই বা কি! কেমন ম্লান হেসে বলল মালু। যেন আলপিনের খোঁচা খেয়ে চমকে তাকালেন রাকীব সাহেব। বাবুর্চিগিরি করে যে ছেলে গান শেখে এ তো তার কথা নয়?

তা ছাড়া ওরা তো একেবারে নাকচ করেননি তোমাকে। এক মাস পরে তো আবার যেতে বলেছেন। এবার একটা নিশ্চিত আশা মালুর সুমুখে তুলে ধরলেন রাকীব সাহেব।

হুঁ। অসম্ভবের আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকে মানুষ। কথাটা বলে আবার কেমন ম্লান করে হাসলো মালু।

রাকীব সাহেবও হাসলেন।

হাসির মাঝে পরস্পরকে যেন বুঝে নিল ওরা।

মালু নেমে গেল নীচে, ওর কাজের যায়গায়!

সাজে গোজে মাঝারি গোছের দেশীয় হোটেল। তিন তলা। দোতলা আর তিন তলাটা আবাসিক। এক তলায় ভোজন ঘর এবং রেস্তোঁরা। অপরিষ্কার নয়। পরিষ্কারও নয়। যেমনটি হয় মাঝারি পর্যায়ের হোটেলগুলো। তিন তলায় দুটো কামরা নিয়ে একক বাস রাকীব সাহেবের।

নিউ গ্র্যাণ্ড হোটেলের আট আনা মালিক ষোল আনা পরিচালক শচীন বাবু রাকীব সাহেবের গুণমুগ্ধ এবং বন্ধু। সেই খাতিরেই নতুন কাজটা হয়ে গেল মালুর। বিল লেখা এবং হিসেব মেলানো। ওর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তিন তলার চিলে কামরার এক অংশে, বাকী অংশটা ভাঙ্গা আসবাব এবং ইঁদুর পরিবারের দখলে।

মন্দ লাগেনা মালুর নতুন কাজটা। সবাই বাঁধা খদ্দের, বাকীর খাতায় সই দেওয়ার দলের। ঝামেলা কম। যথেষ্ট সময় পায় মালু গলা সাধবার। তার চেয়েও বড় কথা রাকীব সাহেবের সান্নিধ্য। তার সুরভরা কণ্ঠটি শোনবার অবিমিশ্র সুযোগ।

যত দেখছে রাকীব সাহেবকে ততই অবাক হচ্ছে মালু। মুখে যেমন শিশুর সারল্য তেমনি ভেতরটা। অন্তর তার সারাক্ষণ যেন কেঁদে চলেছে পৃথিবীর অনন্ত বেদনায়। যে বেদনা সমস্ত রাগিণীর উৎস। সেই অনন্ত বেদনারই একটি খণ্ডরূপ তার আপন সমাজ, আপন পরিবেশ, সেই পরিবেশের বিরুদ্ধে যুজে যুজে আপনার সুরের জগৎটাকে দিনে দিনে বিস্তৃত করে চলেছেন তিনি।

মালুর মনে পড়ে সেই প্রথম দিনটির কথা। আসর বসেছে অশোকের সেই ঘরটিতে। একটি ভাটিয়ালি শোনালেন রাকীব সাহেব। তন্ময় হয়ে শুনল মালু। এ যেন সেই দখিন ক্ষেতের বুক চিরে তর তর করে বয়ে যাওয়া বড় খালের সুর, তালতলি বাকুলিয়ার সুর। মালুর আপনার সুর, ওর অস্থি পাঁজরে মিশে থাকা সুর। তবু রাকীব সাহেবের মতো অত দরদ, অত আবেগ দিয়ে তো কোন দিন গাইতে পারেনি মালু?

গান থেমে গেলেও সুর বেজে চলছে মালুর সূক্ষ্ম তন্ত্রীলোকে। কি এক আচ্ছন্নতা ঘিরে নিয়েছে ওকে।

আমাদেরই দেশের ছেলে, শুনুন ওর গান। হঠাৎ হারমোনিয়ামটা ওর দিকে এগিয়ে দেয় অশোক।

সেই আচ্ছন্নতার ঘোরেই তালতলির একটি পরিচিত গান গেয়ে যায় মালু। শুনে কি এক উল্লাসে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন রাকীব সাহেব। আহা, এ-যে আমার গ্রাম বাংলার মিঠে সুর গো। গাও গাও। আর একটি গাও কলকাতা শহরে বসে অমন খাঁটি আর মিঠে সুর কি মাথা কুটলেও পাওয়া যায়?

পল্লীগীতির সম্রাট রাকীব সাহেব। জনপ্রিয়তার শিখরে সার্থক শিল্পী, নাম তার দেশের সীমানা ছাড়িয়ে। মুকুটহীন সেই সম্রাটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়, অভিভূত আচ্ছন্নতায় মূক হয়েছিল মালু।

সেই যে প্রশংসা, সে তো শুধু মামুলি দুটো উৎসাহ-বচন ছিল না? সে ছিল এক স্বীকৃতি, মালুর শিল্পী-জন্মের এক মহাসনদ।

অপার বিস্ময়ে সেদিন নিজের দিকে তাকিয়েছিল মালু। আপনার গভীরে কি এক আলোড়ন, কি এক সত্বার চকিত স্পন্দন। চমকে উঠেছিল মালু। সে ছিল বুঝি পরিপূর্ণ এক শিল্পী-সত্বার উন্মেষ লগ্ন। যে সত্বা জন্ম দিল একটি চেতনার, শিল্পীর গুণীর নিজস্ব এক মূল্য-উপলব্ধির! আশ্চর্য সেই অনুভব, জনপ্রিয় শিল্পীর সাথে ওর যে দূরত্ব, সে দূরত্বটা যেন এক নিমেষেই ঘুচিয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল মালুর, ওরা সমধর্মী নয় শুধু, ওরা সমমর্মী। সে জন্যই বুঝি রাকীব সাহেবের কাছে অমন অকপটে নিজের কথাগুলি আজ বলতে পেরেছে ও। দ্বিধা আসেনি খাবার চাইতে, সাহায্য প্রার্থনা করতে। বাকুলিয়ার মালু, হৃদয়ে যার সুরের মন্থন, তার কাছে এ ছিল এক অত্যাশ্চার্য আবিষ্কার। একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। অপরিচিত এক অনুভূতি। দেশে দেশে সকল সৃষ্টি-সাধকই বুঝি এমনি আচমকা খুঁজে পায় আপনার শিল্পী-সত্বা, আপনার সৃষ্টি চৈতন্য। আর তখন ভেঙে যায় দেশ কাল ধর্ম গোত্রের গণ্ডী। ওরা তখন পৃথিবীর আনন্দ উৎসবে এক সুর এক হৃদয়।

গালে হাত দিয়ে ভাবনাটা শেষ হলে পর এই বিলগুলো টোটেল করে রাখবেন। কয়েক তোড়া বিল মালুর সুমুখে টেবিলের উপর রেখে মৃদু হাসলেন শচীন বাবু। এটাই শচীন বাবুর স্বভাব। শিল্পানুরাগী মনটি তার সব সময় প্রশ্রয় দিয়ে চলে মালুকে। সকালের দিকে গলা সাধতে গিয়ে দেরী হয়ে যায় মালুর। কখনো ডেকে পাঠায়না শচীন বাবু। রাকীব সাহেবের ঘরে দুজনে মিলে কোন একটি গানের সুর অথবা উৎপত্তি নিয়ে মেতে যায় আলোচনায়. নিঃশব্দে পাশে গিয়ে বসবেন শচীন বাবু। একমনে শুনবেন ওদের আলোচনা। আলোচনার শেষ না এলে পাড়বেন না কাজের কথাটা।

তাড়াতাড়ি হিসেবে মন দিল মালু। মোট অংকগুলো নামে নামে মিলিয়ে তুলে রাখল খাতায়। কয়েকটা নতুন বিল তৈরী করে হাই তুলল। ফরমাশ দিল, এক কাপ চা।

এ ভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকছ কেন? দু একটা জলসা টলসায় আস। চল রেডিওতে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসি তোমার। বার দুই ওর গান শোনার পরই কথাটা পেড়েছিলেন রাকীব সাহেব। আর সেই প্রথম বেতারে কণ্ঠ তুলবার একটি প্রচ্ছন্ন অভিলাষ বাসা বেঁধেছিল ওর মনের ভেতর। কিন্তু এড়িয়ে গেছিল মালু। নিজেকে নিয়ে তখনো তার অনেক লজ্জা।

রাকীব সাহেব, যেন পথ চলতে চলতে কুড়িয়ে পেয়েছেন মানিক। সে মানিক নিয়ে তার মহা আনন্দ। ব্যস্ত মানুষ তিনি। চারিদিকে তার ডাক। তবু অশোকের আসরে সহজে কামাই দেন না তিনি। মালু গান শুনতে এলাম তোমার। চোখ বুঝে তন্ময় হয়ে শোনেন মালুর গান। কদাচ এখানে সেখানে গুধরিয়ে দেন দু একটি টান। আসর শেষে গল্প করেন। গল্প শেষে মালু এগিয়ে দেয় বাস স্টপে।

জান ভাই। মুসলমান ছেলেরা বাজনা শিখছে গান শিখছে, দেখলে বড় ভাল লাগে আমার। ভাল লাগার কথাটা বলেই বিষণ্ণ আর ম্লান হয়ে যান রাকীব সাহেব। বুঝি হারিয়ে যান ফেলে আসা অতীতের স্মৃতিতে। টুকরো টুকরো কথায় উঠে আসে তার অতীত।

বি এ পাশ করে সরকারী চাকুরে হব এই ছিল বাবার স্বপ্ন। আমিও সেই স্বপ্নটাকেই মেনে নিয়েছিলাম। চাকুরীতেই স্বচ্ছল জীবন, সামাজিক মর্যাদা। কিন্তু কি যে হল মনটার। বইয়ের পাতা ফেলে সুরের পেছনে ছুটে যায় মন। যেখানে গান সেখানেই ছুটে যাই। বি-এ পরীক্ষা দিয়েই পালিয়ে যাই বাড়ি থেকে।

বাড়ি বিমুখ। আত্মীয় স্বজনের মুখ ভার। বি-এ পাশ করে ছেলে হবে জজ ম্যাজিস্ট্রেট নতুবা কাছাকাছি কিছু। তা না, ছেলে চলেছে গান শিখতে? ছিঃ। গাইয়ে বলে কি ছেলের পরিচয় দেয়া যায় সমাজে? না পাওয়া যায় ভাল একটা বিয়ের সম্বন্ধ? তা ছাড়া গাইয়ে ছেলের ভবিষ্যতই বা কি?

তবু মন আমার ফিরল না। সুরের পৃথিবী যে আমায় টেনে নিয়েছে তার কোলে। আত্মীয় পরিজনের বিরাগ ভ্রূকুটি, সমাজের নীরব অবহেলা আরও কত দুর্গতি যে জুটল কপালে। আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করলাম সে সব লাঞ্ছনা। সময় সময় উত্যক্ত হয়ে ক্ষেপে যেতাম, মুষড়ে যেতাম হতাশায়। তবু গান ছাড়বার কথা ভাবতে পারতাম না। সুরের সুধা একবার যে পান করেছে, সে কি ছাড়তে পারে তার মায়া? বলতে বলতে রাকীব সাহেবের চোখ জোড়া ছল ছল করে উঠত।

শ্রদ্ধায় মাথা নত করত মালু। শিল্পীর চিরন্তন বেদনায় টনটন করে উঠত ওর বুকের ভেতরটা।

নিউ গ্র্যাণ্ড হোটেলে দিন কাটে।

একমাস। দুমাস। যথারীতি কণ্ঠ পরীক্ষা দিয়ে আসে মালু। যথা পূর্বং উত্তর পায়, আবার আসবেন।

স্বীকৃতির পথ যে কঠিন পথ, মালেক। আশ্বাস যুগিয়ে চলেন রাকীব সাহেব।
কেন মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন রাকীব ভাই?
মিথ্যে আশ্বাস? বুঝি আহত হন রাকীব সাহেব।
ওসব রেডিও ফেডিও আমার ভাগ্যে হবেনা, বুঝে নিয়েছি, এখন অন্য পথ ধরতে হবে আমায়।
অন্য পথ?
রাস্তায় রাস্তায় গাইব আমি। তবু তো মানুষ শুনবে আমার গান?
হাসেন রাকীব সাহেব, দুষ্টু ছেলের পাগলামো দেখে যেমন করে হাসেন বড়রা, বলেন, বড্ড অস্থির হয়েছ।
নীরব হয় মালু। অস্থিরতা যদি অভিযোগ হয়, সেটা অস্বীকার করবেনা মালু। ওর অন্তরের গভীরে যে অস্থির কল্লোল। ওর সুর ওর গান খাঁচায় বন্দী পাখির মতো ডানা ঝাপটিয়ে প্রকাশের মুক্তি কামনায় অধীর। এই সুরের প্রাণটাই তো ওকে টেনে এনেছিল শহর কলকাতায়। এই সুরের প্রাণটি নিভৃত ঘরের একাগ্র সাধনায় আজ আর তৃপ্তি পায় না। সে চায় প্রকাশ। সে চায় গান শোনাতে। এই প্রকাশের বেদনাই তো অশোকের মেসে অস্থির করে তুলেছিল ওকে। রাকীব ভাই কি বোঝেনা এই অস্থিরতার অর্থ?
আচ্ছা আমি নিজে যাচ্ছি। দেখি কি করতে পারি। এবার শুধু আশ্বাস নয় একটা প্রতিশ্রুতি দিলেন রাকীব সাহেব।
দুটো টেলিফোন করলেন রাকীব সাহেব। ঘুরে এলেন রেডিও অফিসটা মালুকে ডেকে বললেন, ক্যাজুয়েল আর্টিষ্টের লিষ্টিতে তোমার নামটা ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম। এবার একটা চান্স তুমি পাবেই। অধৈর্য হয়োনা।
কবে আসবে সেই 'চান্স'?
কাবার হয়ে যায় মাস অধীর প্রতীক্ষায়। মাসের পিঠে মাস যায় ফুরিয়ে! এমন সময়।
গান গেল থেমে।
সুর হল স্তব্ধ।

দূরে কিসের যেন হল্লা। প্রথমে লঘু পরে কিঞ্চিৎ ভারি হয়ে আসে হল্লার মিশ্র আওয়াজ। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করল মালু।
অনেক কণ্ঠের স্লোগান। আওয়াজ তার ক্রমশঃ উঁচুতে উঠছে।

স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল স্লোগানগুলো। ছাঁত করে কানে এসে ধাক্কা খেল কয়েকটি পরিচিত স্লোগান :

নারায়ে তকবীর-আল্লাহ-আকবর।

এপাড়ায় তো এ ধ্বনি শোনার কথা নয়?

মাসিকের পাতায় চোখ বুলোতে বুলোতে বুঝি একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন রাকীব সাহেব। স্লোগানের ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলেন। আলগোছে ধরে রাখা মাসিকটা পড়ে যায় তার হাত খসে।

হঠাৎ চুপ চাপ। অসংখ্য ত্রস্ত পলায়নী পায়ের প্রতিধ্বনি দেয়ালে দেয়ালে আঘাত খেয়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্লোগানগুলো প্রথমে বিক্ষিপ্ত পরে ক্ষীণতর হয়ে আসে। আবার সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়।

ঠুক ঠুক টোকা বাজে দরজায়।

ভেতরে আসুন।

প্রায় হুড় মুড় করে ঢুকলেন শচীনবাবু। একটু যেন উত্তেজিত শচীনবাবু। সে উত্তেজনাটা চাপতে গিয়েই শ্বাস পড়ছে তার ঘন ঘন।

ব্যাপারস্যাপার তো খুব ভাল ঠেকছেনা রাকীব ভাই। দাঙ্গা বুঝি লেগেই গেল। তুমি এখুনি সরে পড়। বলা তো যায়না······

কি বললে? বুঝি তড়িতাঘাতে ছিটকে পড়েন রাকীব সাহেব। কিন্তু তক্ষুনি সামলে নেন। বসেন, পিঠটা খাড়া করে। দপ করে জ্বলে ওঠেন, কেন, কেন আমাকে সরতে বলছ শচীন?

আকস্মিক উগ্রতার মুখে চট করে কথা যোগায় না শচীনবাবুর। আর এই উগ্রতাটা যে বন্ধুত্বের অভিমান সেটা লক্ষ্য করে কি এক বেদনার কাতরতায় ম্লান হয়ে আসে শচীনবাবুর মুখখানি।

বিপদ আছে বলেই তো বলছি। গলাটাকে খাট করে বললেন শচীনবাবু।

বিপদ? দশ বছর রইলাম এ পাড়ায়, কোন্ লোকটা আমায় চেনেনা বলতো? আর এখানে আমার বিপদ? সেই আহত অভিমানের কণ্ঠ রাকীব সাহেবের। চেনে বলেই তো আশঙ্কাটা বেশী আমার। দিন কাল খারাপ। কার মনে কি আছে কে জানে?

বুঝেছি···। বাকী শব্দগুলো উচ্চারণ না করেই থেমে গেলেন রাকীব সাহেব। কি বুঝেছেন সেটাই বুঝি একটু খতিয়ে দেখছেন।

গোঁয়াতুর্মীর কোন অর্থ হয় না, নীরবে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন শচীনবাবু।

নীরবে ভাবছেন রাকীব সাহেব।

দূর থেকে আবার হল্লা ভেসে আসে। ভাববার সময় ও যে বড় অল্প।

সব দিক বিচার করে চলে যাওয়াই স্থির করলেন রাকীব সাহেব।

একটা মিনিট দাঁড়াও। রাস্তাটা পরিষ্কার হল কিনা দেখে আসি।' হুঁশিয়ার মানুষ শচীনবাবু। সব রকমের সতর্কতা না নিয়ে বন্ধুকে রাস্তায় ছেড়ে দিতে নারাজ।

আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে যান শচীনবাবু।

পাশের কোন ঘরে টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা চলেছে। সে শব্দটা কি এক বিলম্বিত লয়ে ওদের ঘরে পৌঁছে যেন আর বেরুবার পথ পাচ্ছে না।

এক মিনিটের যায়গায় দশ মিনিট কাটিয়েও ফিরে আসেন না শচীনবাবু। এবার উল্টোদিকে হল্লা উঠেছে।

হল্লার আওয়াজটা কখনো বাড়ছে, কখনো কমছে।

টিক টিক, সময়ের গতির সেই শব্দটা মাঝে মাঝেই মনে হয় থমকে থাকছে।

অবশেষে ঘণ্টা কাবার করে ফিরে এলেন শচীনবাবু। চোখ মুখ উদ্বেগে ব্যাকুল।

রাস্তার ভীড়টা কমেছে। কিন্তু চৌ মাথায় আর হোটেলের উল্টোদিকের রোয়াকে জটলা। আলাপী মানুষের জটলা নয়। পাড়ার বখাটে সব ছোকরা আর সন্দেহ ভাজনদের কি যেন ফিস ফিস পাঁয়তারা। ওদের হাবভাব মোটেই ভাল মনে হচ্ছেনা শচীনবাবুর।

তা হলে? চিন্তান্বিত স্বরেই শুধালেন রাকীব সাহেব।

তা হলের জবাব না দিয়ে খবরগুলো জানিয়ে যায় শচীনবাবু। এখানে সেখানে হানাহানি লুঠতরাজ শুরু হয়ে গেছে। কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের সোনারুদের দোকানগুলো সবই নাকি লুট হয়ে গেছে। মানিকতলার মুসলমানদের একটা বস্তি নাকি পেট্রল ছিঁটিয়ে মানুষ শুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়েছে। সেই ছাই গায়ে মেখে কুচকাওয়াজ করছে ভলান্টিয়ার বাহিনী।

হোটেলের দোতলায় সেই যে ইম্পিরিয়াল টোবাকোর মুসলমান ভদ্রলোকটি ছিলেন। তাকে নিরাপদ যায়গায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল শচীনবাবু। সন্ধ্যা সন্ধিাই। শচীনবাবুর ছোট ভাই তাকে পৌঁছে দিয়ে এই মাত্র ফিরে এল। তার কাছ থেকেই এসব খবর নিয়ে এসেছেন শচীনবাবু। নিজেও কিছুদূর গিয়ে দেখে এসেছেন শচীনবাবু। বেশি দূর এগুনো যায়নি। মোটকথা রাস্তায় বের হওয়াটাই এখন বিপদজনক।

তা হলে? আবার শুধালেন রাকীব সাহেব। এ অবস্থায় হোটেলে থাকাটাই তো সমীচীন মনে করছি আমি।

হোটেলে আমি রয়েছি, কোন্ ব্যাটা কি করবে? এবার রাকীব সাহেবের প্রশ্নটার জবাব দিল শচীনবাবু।

ঠিক হল কামরাতেই থাকবে ওরা। শচীনবাবু নিজে পাহারা দেবেন। শেষ রাতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে দাঙ্গাবাজরা তখন ওদের পৌঁছিয়ে দেবেন নিরাপদ অঞ্চলে।

যাবার আগে বাতিটা নিবিয়ে দেন শচীনবাবু। কয়েকটা মোম টেবিলের উপর রেখে বলেন, তোমার ঘরটাতো কারুর না চেনার কথা নয়? একান্ত প্রয়োজন পড়লে মোম বাতি ধরিয়ে নিও।

শুয়ে পড়লেন রাকীব সাহেব। মালুকেও ডাকলেন, উপরে গিয়ে আর কাজ নেই তোমার, এস এখানেই একটু গড়িয়ে নেয়া যাক।

কিন্তু, গড়ান তার হলনা। পাড়া কাঁপিয়ে, আকাশ ফাটিয়ে স্লোগান উঠেছে, বন্দে মাতরম। ধুস ধাস শব্দে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অথবা খুলে যাচ্ছে বাড়ির জানালা।

সব লোক নেমে এসেছে রাস্তায়, বাড়ির ভেতর শাঁখ বাজাচ্ছে মেয়েরা। হোটেলের বাসিন্দারা সব বারান্দায়।

ধরফড়িয়ে উঠে বসলেন রাকীব সাহেব।

খড়খড়িটা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকাল মালু। রাস্তা আর গলিতে গিস গিস মানুষের ভীড়। কারো হাতে লাঠি, কারো হাতে চেলা ফাড়বার ভোঁতা দা। কারো হাতে ইটের টুকরো।

খবর পাওয়া গেছে ওদিক থেকে মুসলমানরা নাকি নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে আসছে। যে কোন সময় এ পাড়ার উপর হামলা হতে পারে এ পাড়াও তাই প্রস্তুত হচ্ছে।

সবার মুখে শঙ্কিত উত্তেজনা। চাপা কণ্ঠের ফিস ফিসানি। কানে কানে কথা বলা। চাপা হুংকার। মানব কণ্ঠে যে কত রকমের ধ্বনি তরঙ্গ সম্ভব, এর আগে কখনো বুঝি জানবার বা শুনবার সুযোগ পায়নি মালু। হ্রস্বদীর্ঘ চিকণ মোটা কর্কশ মোলায়েম খনখনে ঝনঝনে ভীতি চাপা হিস হিস তর্জন গর্জন, এ যেন কণ্ঠধ্বনির কোন সমবেত যজ্ঞকাণ্ড। সেই ধ্বনি যজ্ঞের আড়ালে কি এক জান্তব বীভৎসতা যেন ওঁৎ পেতে রয়েছে। ক্ষীণ সেই শব্দাবরণ ফুঁড়ে এখুনি বুঝি কোন বিকট দানব ভয়ংকর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে।

হঠাৎ ছিঁড়ে গেল সন্দেহ ফিস ফিসানীর ভাবি পর্দাটা।

বন্দেমাতরম। এবাড়ি থেকে সে বাড়ি, এ পাড়া থেকে সে পাড়া। ক্রমশঃ দূরে সরে যায় আওয়াজটা।

যেন তীর খেয়ে লাফিয়ে ওঠেন রাকীব সাহেব। ভয়ে, ত্রাসে শুকিয়ে এসেছে তার মুখটা।

বন্দেমাতরম। বন্দেমাতরম। এবার সেই দেয়াল কাঁপা, আকাশ ফাটা গর্জন, ওদের চারপাশ ঘিরে। হোটেলের ভেতরেও। সে কী গর্জন! কানে যেন তালা লাগবে।

দুহাতে কান ঢেকে চোখ বোজেন রাকীব সাহেব। খড়খড়িটা বন্ধ করে দেয় মালু। কী মনে করে আবার একটুখানি ফাঁক করে রাখে।

সেই আগের মতোই শ্লোগানটা ক্রমশঃ পেছন থেকে পেছনে সরে যায়।

তারপর সবই স্তব্ধ।

হোটেলবাসিরা যে যার ঘরে গিয়ে খিল এঁটেছে। মুসলমানরা নাকি আপাততঃ আসছেনা এ পাড়ায়।

আল্লা-হু-আকবর আর বন্দেমাতরম, দুটো শব্দ, দুটো ধ্বনিই আবাল্য শোনা মালুর। কি এক ঝংকার, কি এক ছন্দের মতো শব্দ দুটো বাজতো ওর কানে। কিন্তু, আজ শুধু পাশবিকতার হুংকার হয়েই যেন ধেয়ে আসছে সে ধ্বান। উলঙ্গ হিংস্র এক মৃত্যুর ঘোষণা সে ধ্বনির আড়ালে।

বুঝলে মালু? বড় ভুল হয়ে গেছে। সন্ধ্যেসান্ধিই আমাদের কেটে পড়া উচিত ছিল। এখন তো দেখছি একেবারে বেঘোরে মৃত্যু। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছেনা রাকীব সাহেবের চেহারা। কিন্তু শুকনো গলার কম্পিত স্বরে লুকোনো থাকছেনা তার ভয়টা।

ঘণ্টা আড়াই আগেও পালানর কথায় ক্ষেপে গেছিল যে লোক, এ কী তার গলা? মনে মনে না হেসে পারলনা মালু।

ভয়ডর যে মালুর নেই তা নয়। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরটার প্রতি যে এক ধরণের ভীরু মমতা সেটা যেন কোন দিনই অনুভব করেনি ও। জানের ভয়টা কখনো বেচাইন করেনি ওকে। হয়ত তেমন পরিস্থিতিতে এখনো পড়েনিও। অথবা মৃত্যুকে ভয় করবার মতো বয়সই হয়নি ওর।

নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল।

মোমটা জালিয়ে কাউচে গিয়ে বসলেন শচীনবাবু।

ভয়ে বুঝি কাঠ হয়ে বসে আছেন রাকীব সাহেব। কাউচের কোলে তার

আড়ষ্ট শরীরখানা কিছুতেই যেন সহজ হতে পারছেনা। শচীনবাবুকে কাছে পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণটা ফিরে এসেছে তার। কি ব্যাকুলতায় শুধালেন, কি খবর শচীন।

খবর খুব ভালনা রাকীব ভাই, ওই যে পেছনের গলিতে দুঘর মুসলমান ছিল, ওদের সব শেষ হয়ে গেল। শচীনবাবুর থমথমে মুখে উদ্বিগ্ন মনের ছায়া।

স—ব। জান মাল?

স—ব।

বাইরের মৃত্যুটা যেন চুপিসাড়ে ঢুকে পড়েছে ওদের ঘরে। মৃত্যুর মতোই স্তব্ধতা ঘরময়। শুধু মোমের শিখাটি মৃদু মৃদু কাঁপছে।

বন্ধ জানালার পাশে বসে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রাতের কোলে পড়ে থাকা নিঃসাড় রাস্তাটাকেই যেন একমনে দেখে চলেছে মালু। এরি মাঝে বুঝি পাড়ার 'রক্ষী বাহিনী' তৈরী হয়ে গেছে। কয়েকজন 'রক্ষী' এদিক সেদিক ঘুরে এসে রোয়াকের উপর বসে পড়েছে।

ওদের দেখা দেখি গলির ভেতর থেকে, বড় রাস্তার বাড়ি থেকে দুচার জন করে লোক এসে জমছে। আবার সেই হিস হিস কথা, কানে কানে ফিস-ফিসানী।

মালুর মনে হল গোটা পাড়াটাই আসলে ভীতির কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। ভয় পেয়েছে বলেই মানুষগুলো চেঁচিয়ে চিল্লিয়ে পরস্পর থেকে সাহস সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে। ফিস ফিস গলাটা আর কিছুই নয়, শুধু পড়শির কাছ থেকে একটু ভরসা চাওয়া, পড়শিকে জানিয়ে দেয়া আমিও আছি।

রাকীব ভাই, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও। আমি আছি নীচে। আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে নেমে যান শচীনবাবু।

ঘুম কোথায়?

সকালে উঠে সূর্যালোকে ঝলমল পৃথিবীটার উপর চোখ বুলিয়ে, বুক ভরে বাতাস টেনে নিশ্বাস নেবার নিশ্চয়তাটা যখন খুঁজে পাওয়া যায়না মনের ভেতর তখন কি ঘুম আসে চোখে?

জানালার পাশেই বসে বসে কখন নাক ডাকতে শুরু করেছে মালু।

ফুঁ দিয়ে মোমটা নিবিয়ে দিলেন রাকীব সাহেব। বসে বসে বুঝি ঝিঁ ঝিঁ লেগে গেছে পায়ে। বার কয় পায়চারী করলেন। খুলে দিলেন রাস্তার দিকের দুটো জানালা।

কিন্তু, একি! তার চোখের ধাঁধা? তার মনের ভয় আশংকা দুশ্চিন্তা রেণু

রেণু খসে পড়ে কি আগুনের সমুদ্র বানিয়েছে তার অজানতে, তারই চোখের সুমুখে? সে আগুনের লাল আলোয় ভরে গেছে অন্ধকার ঘর?

চোখ কচলিয়ে জানালার দিকে আর একটু এগিয়ে যেতে বুঝি মালুর গায়ে হোঁচট খেলেন রাকীব সাহেব। ভেঙে গেল মালুর ঘুমটা।

কলকাতার বিজলী আলোকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে বুঝি আগুনের আলো জ্বলছে আকাশে।

ইস্ রাকীব ভাই। কি রকম আগুন লেগেছে, দেখেছেন। এতক্ষণে বুঝি টের পেল মালু।

কোথায়? কেমন বিভ্রান্ত স্বর রাকীব সাহেবের।

আকাশের দিকে চেয়ে তো মনে হয় গোটা কলকাতায়, বলল মালু।

নিস্তব্ধ হোটেল।

ঘুমের মতো নিস্পন্দ চৌ-মাথা, গলিপথ। শুধু দূর আগুনের লাল ছায়া কেঁপে কেঁপে যায় ওদের ঘরের ভেতর।

দুম দাম। পটাপট কয়েকটা শব্দ হল।

হোটেলের ফাটকে কিল পড়ছে।

একটা। দুটো। তার পর অনেক ঘুসি।

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে শচীনবাবু এসে ঢুকলেন ঘরে।

এই, নেমে এস শিগগীর। কয়েকটা গুণ্ডা কিসিমের লোক দরজা খুলতে বলছে। অনবরত ধাক্কা দিয়ে চলেছে।

শিগ্‌গীর এস।

চেতনালুপ্ত সম্মোহিতের মতো শচীনবাবুর পিছু পিছু নেবে আসে ওরা। প্যান্ট্রির পেছনে কয়লা-লাকড়ীর অন্ধকার ঘরটায় ওদের সেঁদিয়ে দেয় শচীনবাবু। ফিস্ ফিসিয়ে বলে, চুপ চাপ পড়ে থাক। কোন ভয় নেই।

কামরায় কামরায় বাতি জ্বলে উঠেছে। হোটেলবাসিরা বেরিয়ে এসেছে চত্বরে, বারান্দায়। কৈফিয়ত চাইছে ওরা—দুটো মুসলমানকে বাঁচানর জন্য এতগুলো হিন্দু সন্তানের জীবন বিপন্ন করার কী অধিকার আছে শচীনবাবুর।

বাইরের লোকগুলোরও মেজাজ বিগড়েছে। করাঘাতের পরিবর্তে পদাঘাত পড়ছে দরজায়। চীৎকার করে বলছে, প্রাণের মায়া থাকলে দরজা খোল শিগগীর। আবার অভয় দিচ্ছে জাত ভাইদের! আপনাদের কোন ভয় নেই। খুলে দিন দরজাটা। ওই দুটো মুসলমানকে নিয়েই চলে যাব আমরা।

যেন এতক্ষণ কিছুই টের পায়নি, সোরগোলে ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় ঈষৎ বিরক্ত

হয়েছেন মাত্র, এমনি একটা নির্দোষ মুখভাব করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন শচীনবাবু।

আসুন, কি চাই।

শালা এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে বলে কিনা 'আসুন'? শচীনবাবুকে কনুইর গুঁতোয় পাশে সরিয়ে ভিতরে ঢুকল ওরা। টপাটপ সিঁড়ি ডিঙিয়ে উঠে গেল তেতলায়।

ঘর খালি।

সেই চিলে কোঠা, ছাদ, তেতলা দোতলা, সব ঘরই তন্ন তন্ন করে খুঁজল ওরা। না। মুসলমানগুলো নেই।

শালা আস্ত শয়তান। সরিয়ে দিয়েছে। কাট, এই শালাকেই কাট। কোমরের ভাঁজ থেকে ছুরি বের করে নেয় ওদের একজন। ছুরির ফলাটাকে বার দুই চক্কর খাইয়ে ছুটে আসে শচীনবাবুকে লক্ষ্য করে।

চুপ চাপ চেয়ে রয়েছেন শচীনবাবু। যেন কেটে ফেললে খুব বেশি অসুবিধা হবেনা তার।

না, কেটে লাভ নেই। ছেলে পুলে সায় সম্পত্তি সহ পুড়িয়ে মার শালাকে। পেট্রোল ছিটিয়ে শালার হোটেলে আগুন লাগিয়ে দাও।

নির্ঘাত অপমৃত্যু। পুড়িয়েই হোক আর কেটেই হোক মৃত্যুটা বুঝি বিনা ভোটেই পাশ হয়ে যায়। দুপা এগিয়ে আসেন শচীনবাবু। বললেন: আপনারা এসব কি বলছেন? রাকীব সাহেব সেই যে বিকেলে বেরিয়েছেন আর তো ফেরেননি।

শালা মিথ্যুক। সেই প্রথম লোকটি, কেটে মারার পক্ষেই যার মত, সে-ই বলল। চল চল ওই পাকঘরগুলো সার্চ করতে বাকী আছে এখনো। সর্দার গোছের লোকটা ডাইনিং হল দেখে এসে ডাক দিল ওদের।

প্যাণ্ট্রির দিকে এগিয়ে গেল ওরা।

কী ভীষণ রাত! দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণার মতো, ভয়াল জন্তুর থাবার মতো গলার উপর চেপে থাকা এক রাত। এমন রাত-ও আসে মানুষের জীবনে? দোর গোড়ায় অপেক্ষা করছে মৃত্যু। নিষ্ঠুর নৃশংস মৃত্যু। ভেতরে কয়লা স্তূপের আঁধারে ধুক্ ধুক্ করছে দুটো প্রাণী সে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

এমন কালো রাতে, বিনা নোটিশে নির্দয় মৃত্যুর এমন অতর্কিত হানা, মৃত্যুকে তো এমন বীভৎসতায় কখনো কল্পনা করেননি রাকীব সাহেব?

'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সম'···কতদিন আত্মস্থ ধ্যানস্থ রাকীব সাহেব আহ্বান করেছেন এই 'শ্যাম সম' সুন্দর স্নিগ্ধ মধুর মৃত্যুকে। আর আজ? মিথ্যা। মৃত্যুর সেই আধ্যাত্ম কল্পনা। মৃত্যু কঠিন। মৃত্যু ভয়ংকর বীভৎস। মৃত্যু জীবনেরই শেষ।

চাক চাক কয়লার স্তূপ। ছাদ অবধি কয়লার পাহাড়। এরি মাঝে কেমন একটা খোরলের মত যায়গা করে বসে আছে ওরা। কোন ধারাল কয়লা সুঁচলো মুখ দিয়ে অনবরত বিঁধে চলেছে ওদের। দম আসছে বন্ধ হয়ে। অন্ধকারে মৃত্যুর বিকট মূর্তিটাই নাচছে ওদের চোখের সুমুখে। আর সেই অবস্থাতেই জীবন মৃত্যুর একটি নতুন দার্শনিক সংজ্ঞা খুঁজে চলেছেন রাকীব সাহেব।

আর এক রাতের কথা মনে পড়ল মালুর। সেদিনও এমনি আগুনে আগুনে লাল হয়েছিল কলকাতার আকাশ। মানুষগুলোও ক্ষেপে গেছিল। কেন ক্ষেপেছিল, সবটা সেদিন বুঝতে পারেনি মালু, যেমন বুঝতে পারছেন না আজকের এই নির্বোধ হল্লাটা।

সে রাতের কথাটা মনে পড়তেই রাবুর মুখটাও ভেসে উঠল মালুর চোখের সুমুখে। দিনভর গোটা শহরটাই বুঝি পায়ে পায়ে মাড়িয়েছে রাবু। বিকেলের দিকে টিয়ার গ্যাস খেয়েছিল ধর্মতলায়। সেখান থেকেই মালুকে বিদায় দিয়ে বলেছিল: রাত দশটার সময় জ্যাঠার বাসা থেকে তুলে নিবি আমায়। হষ্টেলে পৌঁছিয়ে দিবি।

শুনে হেসেছিল মালু। সংস্কার থেকে যে ভীতির জন্ম সেটা বুঝি এক জন্মে তাড়াতে পারেনা কেউ। বিশেষ করে মেয়েরা। নইলে ছোট বেলায় গাছে চড়া, এখন ইউনিভার্সিটি-পড়া জিন্দাবাদ দেয়া মেয়ে কলকাতার মতো শহরেও সন্ধ্যার পর একলাটি বের হতে সাহস পায়না কেন?

ঠিক সময়ই পৌঁছেছিল মালু। পার্ক স্ট্রীটে জাহেদদের বাসায়। কিন্তু ফিরে আসতে পারেনি। গাড়ি ঘোড়া বন্ধ। তামাম শহরের ছেলে মেয়েরা ঘর ছেড়ে রাস্তাগুলো সব দখল করে বসে আছে। এখানে সেখানে ট্রাম পুড়ছে, ট্রাক পুড়ছে, টায়ার ফাটছে। গুলির শব্দে আতংকিত কাকগুলো ডানা ঝাপ্টিয়ে অস্থির হয়েছে। কি এক উন্মত্ত উল্লাসে মানুষগুলো আগুনের হোলি খেলছে। আজকের মতোই পোড়া গন্ধ আর ধোঁয়ার পুরু আস্তরে আচ্ছন্ন হয়েছিল সে রাতের মহানগরী।

কী আজব শহর এই কলকাতা। এমন সব কাণ্ড ঘটে যার কোন যোগসূত্র

খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষগুলো যেমন বছরের পর বছর পড়শি হিসেবে বাস করেও চেনে না একে অন্যকে, চেনার কথা ভাবেও না, জানা তো দূরের কথা। তেমনি এখানকার সব ঘটনা—বিচ্ছিন্ন, সূত্রহীন। হয়তো আছে যোগসূত্র, আছে একের সাথে অন্যের গ্রন্থী, যা এখনো জেনে উঠতে পারেনি মালু।

আঁতকে উঠে দুজনই সচকিত হল ওরা। মৃত্যু বুঝি দরজার সমুখেই। মড় মড়িয়ে এগিয়ে আসছে মৃত্যুর পা।

কারা যেন উঁকি মারল। কে যেন লাঠি ঠোকাল কয়লার চাকে। কোত্থেকে যেন টর্চের আলো পড়ল। ঘরের বাল্‌বটা বুঝি কবে থেকেই খারাপ হয়ে আছে।

ধ্যাৎ শালা, এতো কয়লা ঘর! চল্‌।

মৃত্যুটা কি দরজা থেকেই ফিরে গেল?

মৃত্যুর শেষ মৃত্যুই। মৃত্যুর শেষ জীবন, সে কদাচিৎ। কেননা জীবনের জন্য মৃত্যুটা দুর্লভ। কিন্তু রাতের পর দিন, এটা প্রকৃতির আমোঘ ধর্ম। সেই ধর্মের বিধানেই শেষ হল রাত। মৃত্যুর শেষ মৃত্যু। সে মৃত্যু এলনা। এল দিন।

পূব আকাশে দিনের হাতছানিটা স্পষ্ট হবার আগেই ওদের গাড়িতে পুরে ষাট মাইল স্পীড নিল শচীনবাবু। ওরা জীবনের রাজ্যে ফিরে এল।

অনুরক্ত বন্ধু শিষ্যটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছলছলিয়ে উঠল রাকীব সাহেবের চোখজোড়া। মনের অনুভূতিটা ব্যক্ত করতে গিয়ে শচীনবাবুর হাত ধরে কেঁদে ফেললেন তিনি। চোখের অশ্রু জানান দিল গভীর অন্তরের কথাটা।

বিশ্রী রকম ঝাঁকুনী খাচ্ছে গাড়িটা। কলকাতার মসৃণ রাস্তাগুলো কখন গাঁয়ের চাক ওঠা ক্ষেতের মতো এ্যাবড়ো থ্যাবড়ো হয়ে গেছে ওরা জানেনা। এখানে ভাঙা ইটের স্তূপ। ওখানে সেই রেল লাইনের সাদা কালো পাথর কুচির ঢিবি। কি হবে এ সব দিয়ে? কার মাথায় ছুঁড়ে মারবে?

ওকি? দিনের রাজপথে মানুষের লাশ? একটি দুটি নয়, অসংখ্য। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঢেলার মতোই রাস্তাময় ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য মরা মানুষ। কেন মেরেছে, কারা মেরেছে ওদের? আর কী বীভৎস ওই মৃত মুখ, মৃত চোখের দৃষ্টি!

কলকাতা জনারণ্যের জ্যান্ত মানুষরা সব গেল কোথায়? সার্সি এঁটে, অর্গল তুলে ঘরের অন্ধকারে আধমরা? ভয়ংকর কোন আশংকায় ধুক ধুক

মুহূর্তগুলো গুনে চলেছে? না, ওরাও মৃত। তাই মহানগরীতে আজ জ্যান্ত মানুষ নেই, শুধু মরা মানুষ।

মানুষ আর যন্ত্রের বিচিত্র শব্দ গর্জনে চঞ্চল কোলাহলময় কলকাতা। তার সব শব্দ, সব কোলাহল কোন নির্দয় গৌতমের অভিশাপে চির মৌনতার রাজ্যে হারিয়ে গেছে যেন। মালুর মনে হল গল্পে পড়া সেই দৈত্য বিধ্বস্ত কোন পাতালপুরির মতোই আজকের কলকাতা। আর এই প্রথম কি এক ভীতির কাঁপুনিতে শিরার রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল মালুর। এই মৃতের নগরীতে শুধু ভয়।

একটা মরা মানুষের বুকের উপর দিয়েই গাড়ির চাকাটা এগিয়ে যায়।

আ-হা-হা শচীন, একটু সামলে চল ভাই। দুহাতে মুখ ঢাকলেন রাকীব সাহেব। মৃতের ব্যথা হয়ত জ্যান্তদের চইেতে একটুও কম নয়।

শচীনদা শচীনদা থামুন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মালু।

থামবে কি! কোন্ গলিতে কারা ওঁৎ পেতে আছে কে জানে? তবু পেছন সিটের দিকে ঘাড়টাকে একটু কাত করে দেখে নিলেন শচীনবাবু। হ্যাণ্ডেলটা আল্গা করে একখানি পা বের করে দিয়েছে মালু।

আরে কর কি? পড়ে যাবে যে?

আমাকে যে নামতেই হবে রাকীব ভাই। রাবু আপার খবর নেব না?

একটা ভাঙা ট্রাক সুমুখে পড়ে শচীনের স্পীডটা কমে যায়। রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে মালু।

আরে পাগল হলেন নাকি? এ বড় খারাপ পাড়া। শচীনবাবু গাড়ি থামিয়ে নামবার জন্য তৈরী হলেন বুঝি।

না। ও বড় গোঁয়ার। আসবে না। তুমি চালিয়ে যাও। পেছন থেকে বললেন রাকীব সাহেব।

তড়বড় করে নেমে মালু দেখল, ভুল যায়গায় নেমেছে। বিবেকানন্দ রোডটা আরো সামনে।

আশে পাশে সামনের দিকে একটু দূরে তাকাতে কেমন ভয় করে মালুর। তাই দৃষ্টিটাকে ঠিক পায়ের মাথায় ধরে রেখে হন হনিয়ে চলে ও। তবু ভয়টা যেন পায়ের সাথেই জড়িয়ে থাকে। পা গিয়ে ঠোক্কর খায় মৃত নগরীর বিকৃত বীভৎসতার মুখে।

মানুষেরই পেট। আধেকটা দূরে বিক্ষিপ্ত। বাকী আধেকটার ছিঁটানো নাড়িভুঁড়ি মালুর সামনেই পথটা আগলে রয়েছে। পাশ কাটালনা মালু। লাফ মেরে পেরিয়ে গেল।

একটি খোলা হাইড্রেন্ট। ল্যাংটা এক আদমের ছেলে। মাথার দিকটা হাইড্রেন্টের মধ্যে, পা জোড়া আকাশের দিকে কি এক ফরিয়াদের মতো উঁচিয়ে রয়েছে। ঘাতকেরা হয়ত তাড়াহুড়োয় ওর গোটা দেহটা গুম করতে পারেনি। অথবা ঠাঁসা হাইড্রেন্ট, ওর গোটা শরীরখানি ধরবার মতো যায়গা অবশিষ্ট নেই সেখানে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় মালু। ভুলে যায় এখানে যে কোন গলির ঘুপচিতে ওর জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে মৃত্যু।

গলির মুখের বাড়িটায় কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। লেলিহান অগ্নিশিখা লাফিয়ে লাফিয়ে আপন গ্রাসে টেনে নিচ্ছে একটার পর একটা জানালা। কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষ-আসবাব সবই একাকার হবে।

ছাইয়ের গাদায় দাঁড়িয়ে থাকবে কিছু পোড়া ইট, কিছু বা দগ্ধ লোহা। বাড়িটার কোন কিছু আর নজরে পড়ে না। শুধু ধোঁয়া আর আগুন। তারই ভেতর থেকে বাতাস চিরে বেরিয়ে আসে মুমূর্ষু পুরুষ-নারী-শিশুর আর্তচীৎকার—বাঁচাও বাঁচাও, দয়া কর, বাঁচাও আমাদের। প্রাণ ভিক্ষার সেই আর্ত-আবেদনে পাষাণ গলবে, ব্যাধের তীর খসে পড়বে হাত থেকে। কিন্তু পশুত্বের বর্বরতায় উন্মত্ত মহানগরীতে কে দেবে সাড়া মৃত্যুমুখী মানুষের আর্ত চীৎকারে?

দ্রুত পা ফেলল মালু।

এই তো রাবু আপার হস্টেল।

কিন্তু ফাঁকা। দারোয়ানটা নেই। জানালাগুলো বন্ধ। একটুকরো সাড়িও উঁকি দিচ্ছে না কোন ছিদ্র দিয়ে। তবে কি?

সেটা ভাবতে পারে না মালু। পথে পথেই তো দেখে এল ও।

কাকে চাই?

আচমকা কি এক ভয়ে কাঁটা দিয়ে গেল মালুর গাটা। ছেলেটাকে ভাল করে দেখল ও। হস্টেলেরই পাশের বাড়ির রোয়াকে বসেছিল। মালুকে দেখে উঠে এসেছে। পেছনে ওরই বয়সী আর একজন।

এই হোস্টেলের ছাত্রীরা কোথায় গেছে বলতে পারেন? শুধাল মালু। জবাব না দিয়ে ছেলেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মালুকে। পেছনের সঙ্গীর দিকে তাকাল

ছেলেটা। যে কোন অর্থ হতে পারে এমন একটা দৃষ্টি বিনিময় হল ওদের দুজনার। সঙ্গীটি যেন মাথা নাড়ল। একটা নিরাপদ দূরত্ব থেকে সন্ধানী চোখে যেন জরীপ করে গেল মালুর আপাদমস্তক। তারপর এক পা এগিয়ে কেমন রুক্ষ গলায় শুধাল : ঠিক কাকে চাই বলুন তো? মানে নাম—

রাবেয়া খাতুন। ফিফ্‌থ ইয়ার ইতিহাসের ছাত্রী। যেন মরিয়া হয়েই বলে ফেলল মালু।

কিন্তু, বলেই ওর চক্ষু স্থির, রক্ত হিম। কোন্ গুপ্ত সংকেতে বেরিয়ে এসেছে এক ডজনেরও উপর জোয়ান জোয়ান ছেলে। হাতে ওদের সব ধরনের অস্ত্র, বন্দুক, ছোরা লাঠি। নিমেষের মাঝেই ওরা ঘিরে ফেলল মালুকে।

তা হলে…এখানেই সব শেষ? ওর নিঃশ্বাসে আর ভারি হবে না এ পৃথিবীর বাতাস? সেই বাকুলিয়ার ছেলেটা রাসু যাকে সোহাগ করে ডাকত মালু বয়াতি, এই মুহূর্তে পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে যাবে তার জন্য?…কিন্তু, রাবু আপা? রাবু আপাকে কি কেটে ফেলেছে ওরা?

আরে মশায় কথা বলছেন না কেন? কি হল আপনার?

কে! মালু কথা বলছে না। আশ্চর্য তো? মারবার আগেও কৌতুক করছে এরা?

দু দুবার এটাক হয়েছে। শেষের বার তো ঠেকাবার জন্য বন্দুকই ছুঁড়তে হল। খবর গেছে লালবাগে। তবু এখনো আসছে না পুলিশ। বলা তো যায় না, কখন আবার এটাক করে বসে। তা আমরাও রেডি, দেখছেন তো বন্দুক, এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে চলব। দুচারটে মরে মরুক, মরা দরকার।

ও কি, ফাল ফাল করে দেখছেন কি? যান না ভেতরে! দেখা করে আসুন গিয়ে। আপনার দিদি বুঝি? তা মশায় আপনারাও তো বেশ লোক! দেখছেন হাঙ্গামা পাকিয়ে উঠেছে, কাল বেলাবেলি এসে নিয়ে গেলেই পারতেন।

একটি রাত। একটি সকাল। পদে পদে মৃত্যুর আতঙ্ক। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক, পল পল মৃত্যু-ভয়ের নিদারুণ যন্ত্রণা। এতে যদি মানুষের বুদ্ধি চেতনা লোপ পায়, বেশি কি? এক গাল বোকার হাসিতে কিম্ভূত মুখ করে সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করল মালু। আর ছেলেগুলোও হেসে উঠল! কাল থেকে তো হাসবার অবকাশ পায়নি ওরা! তাই হাসির এই মওকাটা পেয়ে পরম সুখে হাসছে।

রেসকিউ পার্টি এসে গেল। খোলা দুটো ট্রাক রিভলভার ধারী সার্জেন্টের পাহারায়।

হষ্টেলের সেই পাশের বাড়িটা থেকে একে একে বেরিয়ে এল মেয়েরা। উঠে বসল ট্রাকে।

ওরা মুক্ত। মুক্তির আনন্দ ওদের মুখে। তবু আঁচলের খুঁটে চোখ মুছছে ওরা। প্রেম প্রীতি ভালবাসার উৎস যে মানবতার সেই মানবতা প্রতি শ্রদ্ধায় মন ওদের নুয়ে এসেছে। ভেদ বুদ্ধি আর অমানুষিকতার মাঝে মনুষ্যত্বের যে মশাল ওদের জন্য জ্বলে উঠেছিল যাবার আগে বুঝি তারই উদ্দেশ্যে দু ফোঁটা অশ্রুর অর্ঘ্য রেখে যেতে চায় ওরা।

ছেলেগুলো হাত নাড়ল। রুমাল উড়াল। ওদের চোখে সেই আশ্চর্য জ্যোতি, যা গত কালকের ঘন দুর্যোগের রাতে ওদের পথ দেখিয়েছে।

ধর্ষিত কলকাতার বেহুঁশ রাজপথ ধরে ছুটে চলে ওদের ট্রাক। এখানে ছিন্ন মুণ্ড, ট্রাকের চাপায় থ্যাঁতলান শব। ওখানে ঘর পুড়ছে। লুঠ হচ্ছে পাশের একটা দোকান। আর ধোঁয়ার আকাশটা যেন প্রেতের আলিঙ্গনে টেনে নিয়েছে গোটা শহরটাকে।

কেন? কেন এই মৃত্যু নির্মম, এই হানাহানি? সেই গলির মোড়ে লকলকে আগুনের শিখায় দগ্ধ নারী আর শিশুদের কাতর প্রাণ ভিক্ষার মতোই তীক্ষ্ণ এক আর্তনাদ বেরিয়ে এল মালুর বুক চিরে।

ওয়েলেসলী স্ট্রীটের ইভাকুউ ক্যাম্পে ট্রাকগুলো নামিয়ে দিল ওদের।

চল্, পার্ক স্ট্রীটে পৌঁছিয়ে দিবি আমায়। এতক্ষণে মুখ খুলল রাবু। সেই যে ট্রাকে উঠে মালুর হাতের সাথে পেঁচিয়ে রেখেছিল পাঁচটি আঙ্গুল, এবার আঙ্গুলগুলো খুলে নিল ও। হাতটা সরিয়ে নিল মালু।

মালু তাকাল রাবুর মুখের দিকে। নরক রাতের ছাপটা এখনো মিলিয়ে যায়নি ওর মুখ থেকে।

বাঁয়ে মোড় নিয়ে ইলিয়ট রোডে পড়ল ওরা।

ফিরিঙ্গী গুলোর বেজায় ফুর্তি মনে হচ্ছে। একটা কিছু বলার জন্যই যেন বলল মালু।

আজ তো ওদের ফুর্তির দিন। সংক্ষেপে বলে পথ চলে রাবু।

ওর হাতের জিনিসটার উপর নজর পড়ল মালুর। চিনল সে। মালুকে সাথে নিয়েই কিনেছিল জাহেদ, রাবুর জন্মদিনের ওই উপহারটা।

মেজো ভাই কি বলবে জান? কৌতুক করে বলল মালু।

কি?

বলবে, রাবুটার কোন আক্কেল নেই। আক্কেলই যদি থাকত তাহলে পালাবার

সময় সাড়ি নয়, গয়না নয় একটা ছড় ওঠা পুরনো হাতব্যাগ নিয়ে পালিয়ে আসে?

হেসে দেয় রাবু। আর হাসির সাথে রাঙিয়ে যায় ওর ঝিনুক মসৃণ দুটো গাল।

মালুও হাসে, মনে মনে বলে, এ-ই ভাল, আজকের দিনের টুঁটি চেপা আতংক-স্তব্ধতাকে হাসি দিয়েই উড়িয়ে দাও।

হঠাৎ রাবুর পায়ের দিকে চোখ পড়ে হো হো করে হেসে উঠল মালু। হাসি ওর থামেনা।

রাবুর এক পায়ে স্যাণ্ডেল আর এক পা খালি।

এ তো ভারী মজা! তুমি এখনও টের পাওনি? অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে শুধাল মালু।

বিব্রত রাবু, তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেলখানা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে দিল, উভয় পা স্যাণ্ডেলমুক্ত করে মালুর হাসিতে যোগ দিল।

সত্যি, আজকের দিনে হুঁশ রাখা দায়। রাবুর বেখেয়ালীর পক্ষেই একটা যুক্তি তুলে ধরল মালু।

আসলে কখন ট্রাক আসবে, কখন বিবেকানন্দ রোড ছেড়ে নিরাপদ এলাকা মানে মুসলমান এলাকায় পৌঁছুবো, এ দুশ্চিন্তাটা সারাক্ষণ টিপ টিপ করছিল বুকের ভেতর। ট্রাকগুলো যখন এল তখন কী ভাবে যে বেরিয়ে এসেছি সেটা জানিনা। বলার প্রয়োজন নেই তবু কথাগুলো বলল রাবু।

আচ্ছা রাবু আপা, বলতে পার? কেন এমন হল, কেন এমন হয়?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রাবু। একটু বুঝি ভাবল। বলল, গোলামীকে সহ্য-করা পাপ। দুশো বছরে অনেক পাপের বীজ জমেছে আমাদের রক্তে। এ হয়ত তারই ফল।

মালুর কাছে স্পষ্ট নয় কথাগুলো। জিজ্ঞাসু চোখে ও চেয়ে থাকে রাবুর মুখের দিকে। রাবু ততক্ষণে শেষ করেছে ওর কথাটা—নইলে বিদেশী শত্রুকে ভুলে গিয়ে নিজেরা নিজেরা মারামারি কাটাকাটি করব কেন আমরা? মালু আরও নির্দিষ্ট করে, আরো স্পষ্ট করে বুঝতে চায় ব্যাপারটা। তুমি তা হলে বলতে চাও পরাধীনতার শৃংখল মোচনে হিন্দু মুসলমান মিলিত সংগ্রাম সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়? ক্ষেতে ওরা লাঙ্গল দেয় একসাথে, আপিসে-কারখানায় কাজ করে এক সাথে। ইংরেজের লাথি খায় এক সাথে। সংগ্রামটা এক সাথে করতে পারবে না কেন?

রাবুর মুখে, রাবুর কথায় ক্রোধ, ঘৃণা, বিক্ষোভ। চমকে তাকাল মালু। শুধাল, এ বিক্ষোভ কার বিরুদ্ধে রাবু আপা?

যারা এসব করে এবং করায় তাদের বিরুদ্ধে। নিজের বিরুদ্ধেও। নিজের বিরুদ্ধে কেন?

কেননা, এই অমানুষিকতাকে, এই বিশ্বাসঘাতকতাকে আমি রুখতে পারছিনা। শক্তি নেই আমার। বিরুদ্ধপক্ষ আমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশী···

কিন্তু শক্তির অভাবটা কখন হয় রাবু আপা? রাবুর কথাটা শেষ হবার আগেই শুধাল মালু।

জানি জানি, তুই বলবি যেখানে নিষ্ঠার অভাব সেখানেই শক্তির ঘাটতি, বিশ্বাসের মূল যেখানে দৃঢ় সেখানে কখনো শক্তির অভাব ঘটেনা। কিন্তু বলতে পারিস, গুণ্ডারা যখন হস্টেলের উপর হামলা করল মানবতার উপর অটল বিশ্বাসী হয়েও আমি কেন এত অসহায় বোধ করেছিলাম?

কিন্তু যারা গুণ্ডাদের রুখে দাঁড়াল, তোমাদের রক্ষা করল তারা মোটেই অসহায় বোধ করেনি।

ঠিক কথা। কিন্তু তারাও তো আমাদের এক রাতের বেশি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিতে পারল না? তারা আমাদের শুধু সাহায্য করল নিরাপদে পালিয়ে আসতে। আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা ভাবলাম—ওদের স্বদেশপ্রেম, ওদের মানবপ্রীতির তুলনা নেই। ওরা তুষ্ট, ওরা ভাবল ওদের পবিত্র দায়িত্ব সমাধা, ওরা মহত্বের অধিকারী। কিন্তু সত্যি কি তাই?

এদের সংখ্যা তো বাড়বে, রাবু আপা। এরাই একদিন বিজয়ী হবে। তখনও কি তুমি একথাই বলবে?

না। কিন্তু যদ্দিন তা না হচ্ছে তদ্দিন তুই, আমি-কেউ কি আত্মধিকার থেকে মুক্তি পাব?

ওরা এখন সার্কুলার রোডে এসে পড়েছে। যে দৃশ্য মালু দেখে এসেছে গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে, কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে এখানেও সেই একই দৃশ্য। প্রায় জনহীন রাজপথ, এখানে সেখানে মৃতদেহ; একটি বাড়ি জ্বলছে ধিকি ধিকি, ভেতরের মানুষগুলো হয়ত আগেই মরেছে। একটি আলকাতরার দোকান পুড়ছে।

আমার মুসকিলটা কি জানিস?

রাবুর প্রশ্নে ওর দিকে মুখ ফেরাল মালু।

আমি জানি কি আমার করা উচিত, কি আমার হওয়া উচিত।

কিন্তু মনের এই ইচ্ছার সাথে আমার নিষ্ঠা আর ধৈর্য্যের বড় গরমিল। তাই হাত পা ছুড়ে চেঁচিয়ে চিল্লিয়েই দায়িত্বটা শেষ করি। পরিশ্রান্ত হই। অবাক হয়েও অবাক হয় না মালু। কলকাতার এই কবছরে খুব অল্প দিনই রাবুর সাথে দেখা হয়েছে ওর, কথা হয়েছে ঢের। মালু দেখেছে চৌদ্দ বছরের যে কিশোরীটি ষাট বছরের বুড়ো কলমা-পড়া স্বামীটির ঘর করবে বলে গোঁ ধরেছিল আত্মজিজ্ঞাসা আর আত্মবিশ্বাসে আজ সে এক সজাগ নাগরিক।

জাহেদকে আমার এজন্যই ভাল লাগে, ওর সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত কর্ম একটি মাত্র কেন্দ্র বিন্দুকে ঘিরে আবর্তিত। তাই ও নিবেদিত প্রাণ।

রাবুর মুখে জাহেদের প্রশংসা, এই প্রথম শুনল মালু। এবার সত্যি অবাক হল মালু। অবাক হয়েই রাবুর দিকে চোখ ফেরাল, দেখল, রাবুর মুখে কি এক লজ্জার আবীর।

দেড় গণ্ডা জেনানার খসম ওই বুড়ো জোব্বাওয়ালার চেয়ে আমি যে সুপাত্র এবং সুপুরুষ, সেটা মানবি তো?

না। যেন ছিপি আঁটা বোতল থেকে এক দলা গ্যাস ছাড়া পেয়ে সশব্দে বেরিয়ে এসেছিল।

বিধ্বস্ত বাসর ঘরে সেদিন আরো অনেক কথা, অনেক কান্না ঝরেছিল। কিন্তু রাবুর ওই শেষ উত্তরটা আর সেই উত্তর শুনে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া জাহেদের মুখখানা মালুর মনে গভীর দাগ কেটে বসে গেছে। সে দাগ আজও মোছেনি। আজও কি রাবু তাই ভাবে?

তবে মেজো ভাইয়ের সামান্য একটু প্রশংসা করতে গিয়ে অমন রাঙিয়ে উঠল কেন রাবু আপা? প্রাণ নিয়ে পালাবার মুহূর্তেও তার দেওয়া সামান্য উপহারটা ভুলে গেলনা কেন?

দারুণ ইচ্ছে হলেও এ প্রশ্নটা মুখ দিয়ে উগরে ফেলবার মত সাহস সঞ্চয় করতে পারলনা মালু। জিজ্ঞেস করল অন্য কথা, কিন্তু এই কদিন আগেই তো তুমি তুমুল তর্ক বাধিয়েছিলে মেজো ভাইর সাথে, বলেছিলে, ভুল করেছ মেজোভাই।

এখনো তাই বলি। এখনো বলি ও ভুল করছে। কিন্তু ভুল হোক শুদ্ধ হোক ওতো কিছু করছে। ওতো রয়েছে মানুষের মাঝে, কর্মের মাঝে। ওর রয়েছে ত্যাগের স্পৃহা। কর্মের মাঝেই ভুল শুধরাবার পথ ও পেয়ে যাবে, আজ হোক কাল হোক। কিন্তু আমি, আমরা, অকম্মার দল? গলাবাজি ছাড়া আর কি করছি আমরা?

করতে না করছে কে, রাবু আপা ?

মালুর খোঁচাটা এক ঢোকে গিলে ফেলল রাবু। তারপর চুপ করে গেল।

জনহীন সার্কুলার রোডে কয়েকটা শকুন জড়ো হয়েছে। হয়ত ওরা খবর পেয়েছে, এন্তার মানুষ খুন হয়েছে এই শহরে। পচা মাংসের লোভে তাই আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছে ওরা।

শকুনগুলোকে পাশ কাটিয়ে মালু আর রাবু উল্টো ফুটপাথে এসে মোড় নেয় পার্ক ষ্ট্রীটের দিকে। যেন খুব মনযোগ দিয়ে ফুটপাতের চতুষ্কোণ ঘরগুলো গুনছে রাবু। গুনতে গুনতে পা ফেলছে।

আমাকে খোঁচা দিয়ে কোন লাভ নেইরে, মালু। হঠাৎ বলল রাবু।

কেন ?

নিজেকেই মুক্ত করতে পারলামনা আমি। আমি কেমন করে দেশকে, মানুষকে জাগাবার ব্রত নেব ?

স্বস্তির হাওয়া বইল পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীটায়।

রাবু তাহলে অক্ষতই ফিরে এসেছে ? সেদিনের পার্ক সার্কাসে বুঝি এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কিছুই ছিল না।

আমরা তো ভেবে ভেবে মরি। কত টেলিফোন কত দৌড়াদৌড়ি তোর জ্যাঠাজীর। কিন্তু না ছিল যাবার উপায়, না খবর পাবার। শেষে রেসকিউ কমিটির কারা এসে বলে গেল মেয়েরা নিরাপদ, তবে গিয়ে একটু নিশ্চিন্তি। শেষ করে লম্বা দম নিলেন সৈয়দ গিন্নী। বয়স আর সুখের ভারে বেশ ওজনী হয়েছেন সৈয়দগিন্নী।

ছেলেমেয়েরা ঘিরে ধরল রাবুকে। ওমা, হিন্দুরা হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিল তোমায় ? স্কুলে পড়া কচি কচি ছেলেমেয়ে, ওরাই যেন সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে।

আমরাও ছাড়িনি। ওই দেখ- মল্লিক বাজার থেকে এখনো ধুঁয়ো উঠছে। এদিকে-ডাক্তার ঘোষ কি করেছিল জান ? বন্দুক দেখিয়েছিল। আর যায় কোথায়। মার মার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোক।

আচ্ছা এখন থাম তোমরা। ওদের থামিয়ে দিল রাবু। বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখেছে মালুকে। পর্দাটা ফাঁক করে ডাকল ওকে, আয় ভেতরে আয় !

বৈঠক ঘরের পর লম্বা বারান্দা। বারান্দার ডান পাশ ধরে ঘরের সারি। প্রথম কামরাটি জাহেদের। দ্বিতীয় কামরাটি ওরা ছেড়ে দিয়েছে রাবুর জন্য। মালুকে সে ঘরে এনেই বসাল ও।

বেরিয়ে গেল রাবু। ফিরে এল এক তশতরি মোহনভোগ আর পেয়ালা ভর্তি চা নিয়ে। তশতরি আর চায়ের কাপটা মালুর সুমুখে রেখে আবার বেরিয়ে গেল রাবু।

মোহনভোগের গন্ধটা মালুকে স্মরণ করিয়ে দিল, সকাল থেকে পেটে পড়েনি কিছু। গতরাতের আতংক উত্তেজনার মাঝে খাওয়াটা ছিল জবরদস্তি, না খাবার সামিল। চনচনিয়ে উঠল ওর ক্ষিধেটা। গরম তাপে যেন পুড়ে যাচ্ছে নাড়ি ভুঁড়িটা। তবু হাত তুলে তশতরিটা স্পর্শ করতে পারল না মালু।

ওকি, খাচ্ছিস না যে? খাবারটা তো আমি দিলাম। কখন আবার এসে পড়েছে রাবু।

তুমি দিলেই বা......কথাটা শেষ করতে পারেনা মালু।

তীক্ষ্ণ বুঝিবা রূঢ় দৃষ্টিটা সূঁচের আগার মতো ওর মুখের উপর ধরে রাখে রাবু। বলে, আজ ওসব অভিমান রাখতো। খেয়ে নে।

মুখটা নাবিয়ে নেয় মালু। আশ্রিতের অন্নে ওর লালন। দয়ার অন্নকে তাই ওর ঘৃণা। পারলে বার বছর ধরে গিলে আসা সেই পরান্নটা উগরে ফেলত মালু। রাবু কি সেটা জানেনা?

আর এই সেদিনের কথাটাও কি ভুলে গেছে রাবু? হ্যারিসন রোডের মোড়ে দেখা হয়ে গেছিল জাহেদের সাথে। হতচ্ছাড়া, কোলকাতায় এসে কোথায় কোথায় ঘুরছিস তুই, আমার সাথে দেখা না করে? বেশ রেগেই বলেছিল জাহেদ। আর অনিবার্য ভাবে হাতটাও বাড়িয়ে দিয়েছিল মালুর কানের দিকে। কিন্তু, অনেকগুলো বছর পেরিয়ে রীতিমত জোয়ান হয়েছে মালু। তাছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড রাজপথের ভীড়। বুঝি সে সব ভেবেই হাতটাকে অর্ধেকের পর থেকেই ফিরিয়ে এনেছিল জাহেদ। কিন্তু ওকে ট্রামে তুলে সোজা বাসায় নিয়ে এসেছিল। বলেছিল, তোর বিছানা পত্র নিয়ে আয়, এখানেই থাকবি।

ঘোর আপত্তি তুলেছিলেন সৈয়দ গিন্নী।

গাঁও বাড়িতে দুজন দশজন খায় থাকে, গায় লাগে না। কিন্তু বাপু, দুটো জাগির, পাঁচটা চাকর, কলকাতার কন্ট্রোলের বাজারে ওই নিয়েই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি আমি। তার উপর আর একজনের ঝামেলা। অত বরদাশ্ত হবেনা আমার।

বুঝি সরমে মরছিল রাবু। প্রতিবাদ করেছিল জাহেদ: কত লোকই তো

ফালতু থাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের বাড়ীতেই জন্ম মালুর, আমাদের বাড়িতেই মানুষ। ওর তো দাবীও রয়েছে।

ছেলের যুক্তিতে বুঝি বা এক পা হটে আসেন সৈয়দ গিন্নী। আল্লা যখন তৌফিক দিয়েছে গরীব কাঙাল থাবেই তো। আমি বলছি ঝনঝাট; ঝনঝাট আমার ভাল লাগে না এ বয়সে। তা ছাড়া লোকের ভীড় রাশেদ একদম বরদাশ্‌ত করতে পারে না।

সৈয়দ সাহেবের বড় ছেলে রাশেদ। কিছু দিন আগেই মুখে পাইপ আর বগলে মেম নিয়ে ফিরে এসেছিল বিলেত থেকে।

প্রত্যুত্তরে কি বলেছিল জাহেদ, শোনার জন্য অপেক্ষা করেনি মালু। সৈয়দ বাড়ির ফালতুর জীবনের ইতি টেনেছে ও অনেক আগে। পুনরায় পরভৃতিকার গ্লানি গায়ে মাখবার ইচ্ছে নেই ওর।

সেদিন বাড়িতেই ছিল রাবু। তার চোখের সুমুখ দিয়েই তো বেরিয়ে গেছিল মালু। তবু আজ অমন জিদ ধরছে কেন রাবু?

থাক, কষ্ট করে আর গিলতে হবেনা তোকে। তশতরিটা সরিয়ে রাখল রাবু। চায়ের কাপটা অমনিই পড়ে রইল।

কী এক লজ্জা থেকে যেন বেঁচে গেল মালু। কৃতজ্ঞ চোখ মেলে ও তাকায় রাবুর দিকে। ছোট্ট করে হাসে রাবু, যেন বলে—বুঝেছি।

উঠি এবার। দরজার দিকে পা বাড়ায় মালু।

এমন সময় বাইরের ঘরে সোরগোল শোনা গেল। কারা যেন ডাকছে। ওরা দুজনই বৈঠক ঘরের দিকে গেল।

ও কি? মেজো ভাই? রাবুই প্রথমে চিনল।

কয়েকজন অপরিচিত লোক, ওদের কাঁধে জাহেদের অর্দ্ধচেতন রক্তাক্ত দেহ।

এই যে এদিকে। বারান্দার ডানে প্রথম ঘরটাই ওদের দেখিয়ে দিল রাবু। আস্তে আস্তে কাঁধ থেকে নামিয়ে জাহেদকে বিছানায় শুইয়ে দিল ওরা। সংক্ষেপে বলে গেল ঘটনাটা।

রেসকিউ পার্টি নিয়ে কয়েকটা বিপন্ন পরিবারকে উদ্ধার করতে যাচ্ছিল জাহেদ। পথে লরীর উপর কে বা কারা ছেড়ে দিয়েছে দেশী বোমা। মাথায় চোট লেগেছে জাহেদের। ফাস্ট এইড দেয়া হয়েছে। আশংকার কারণ নেই। ওদের মেলা কাজ। তাই ওরা চলে গেল।

যা তো মালু, ওই মোড়ে ডিসপেন্সারী। সঙ্গে করে নিয়ে আসবি ডাক্তারকে। মালুকে হুকুমটা দিয়েই জাহেদের দিকে মন দিল রাবু।

মাথার পেছনটা ব্যাণ্ডেজ করা। সেখানেই বুঝি চোট লেগেছে বেশি। ঘাড়ে পিঠে ছড়ে গেছে চামড়া। পাঞ্জাবিটা দু এক যায়গায় রক্তের দলায় কুঁচকে এসে সেঁটে গেছে গায়ের সাথে। কাঁচি নিয়ে ফড় ফড় করে পাঞ্জাবিটা কেটে ফেলল রাবু। ভেজা ন্যাকড়ায় ধুয়ে ফেলল জমাট বাঁধা ক্ষত।

ডাক্তার এল। ওষুধ দিল।

চড় চড় করে গায়ের তাপটা একশো চারে উঠে গেল জাহেদের।

মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে ওর শিয়রের কাছে বসে রইল রাবু।

বের কর। এক্ষুণি বাড়ি থেকে বের করে দাও ওই বেতমিজ কমবখ্‌তটাকে। কার হুকুমে তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দিলে তুমি। আদ্যোপান্ত শুনে গিন্নীর উপর হুংকার ছাড়লেন সৈয়দ সাহেব।

ইংরেজ সরকারের অনুগত কর্মচারী এবং শান্তিপ্রিয় প্রজা সৈয়দ সাহেব। হাঙ্গামা হুজ্জত তার না-পছন্দ। জেহাদই হোক আর ইংরেজ খেদানোর লড়াই-ই-হোক, নিজের ছেলে সে-সবে জড়িয়ে পড়বে, মাথা ফাটিয়ে আসবে, তাতে ঘোর আপত্তি সৈয়দ সাহেবের।

আহা থামুন তো। ছেলের জান নিয়ে টানাটানি আর আপনি লেগেছেন গাল পাড়তে। সৈয়দ গিন্নীর সংযত কণ্ঠে চিরন্তন মাতৃ প্রতিবাদ।

রাখ তোমার মেয়েলি আদর। বলে দাও তোমার ছেলেকে—আমার বাড়িতে থেকে, আমার খেয়ে ওসব ভুতের বেগার চলবে না। চেঁচিয়ে চলেন সৈয়দ সাহেব।

পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল রাশেদ। এগিয়ে এসে বলল: আব্বা তো ঠিকই বলছেন, আম্মা। জাহেদটা স্রেফ ভ্যাগাবণ্ড হয়ে যাচ্ছে। ওকে আর আশকারা দেয়া যায় না। ষ্ট্রীক্ট্ কণ্ট্রোলে আনতে হবে।

বড় ছেলের কথাটা টেনে নিয়ে সৈয়দ সাহেব আরও শক্ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন হয়ত, কিন্তু তার আগেই ওদের সুমুখে বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজাটা। ভেতর থেকে শোনা গেল রাবুর গলা: প্লিজ বড় ভাই, চেঁচিয়োনা, এটা রুগির ঘর।

ওষুধ আর ঘুমের ক্রিয়ায় দিন দুয়ের মধ্যেই উঠে বসল জাহেদ। এক-টুকরো হাসির ঝিলিক মেলে মেঘমুক্ত আকাশের মতই উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাবু। কপাল কেটেছিল সেই কবে, এবার মাথাটাও কাটল। বুঝলি? রাবুর উজ্জ্বল আভা ছড়ান মুখটার দিকে তাকিয়ে বলল জাহেদ।

বারে বারে অমন খোঁচা দাও কেন, মেজো ভাই?

তুই যেন মোটেই দিস না।
আমি যা করব তুমিও তাই করবে ?
চুপ করে যায় জাহেদ।
খোলা ব্যাণ্ডেজটা ধীরে ধীরে পাট করে রাখে রাবু। তুলোগুলো ফেলে দেয় চিলুমচিতে। সযত্নে চিরুনী বুলোয় জাহেদের মাথায়। একটি একটি করে জটবাঁধা চুল আল্গা করে দেয়।
আলিগড় থাকতে তবু কিছু লেখাপড়া করতে। এখানে এসে তো সে পাটটাও চুকিয়ে দিলে। পরীক্ষাটাও দিলে না। তুলো চেপে ওর মাথায় নতুন ব্যাণ্ডেজটা বাঁধতে বাঁধতে বলল রাবু।
কি বলতে চাস তুই ?
বলতে চাই সারা জীবন কি এই হৈহুজ্জুতেই কাটবে নাকি ?
তুই, তুইও একথা বললি ? রাবুর হাত থেকে মাথাটা ঝটকা মেরে ছাড়িয়ে নেয় জাহেদ। উঠে বসে। ব্যাণ্ডেজের কাপড় আর তুলো ছিঁটকে পড়ে মেঝেতে।
রাবু ভাবলেশহীন। ব্যাণ্ডেজ আর তুলোটা কুড়িয়ে নেয় রাবু। ফেলে দেয় চিলুমচিতে। বের করে আনে ব্যাণ্ডেজের নতুন কাপড়, নতুন তুলো। তারপর দুহাতের তালুতে জাহেদের মাথাটাকে টেনে আবার শুইয়ে দেয় ওকে। তুলো চেপে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে চলে, যেমন বাঁধছিল একটু আগে।
শুধু হৈহৈ করলেই দেশসেবক হওয়া যায় না। পড়াশোনাও করতে হয়। শান্ত কণ্ঠে বলল রাবু।
মানে এম এম পরীক্ষাটা দিতে হবে, ডিগ্রীর লেজটা আর একটু দীর্ঘ করতে হবে। এই তো ?
মানেটা মোটেই তা নয়। ডিগ্রী নেওয়া না নেওয়া সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু দেশটাকে চিনতে হলে জানতে হলে যে একটু পড়াশোনা দরকার, এই সহজ কথাটা বুঝছোনা কেন ?
ও, এই পড়াশোনার কথা বলছিস ? তবে যে খামোখা রাগ করলাম তোর উপর ?
সে আর কি করা যাবে, অর্দ্ধেকটা শুনেই তো রেগে বসলে তুমি।
আচ্ছা আর রাগবোনা, কখনো রাগবোনা। বুঝলি ? বলতে বলতে কি এক খুশিতে উচ্ছ্বসিত হল জাহেদ; দুহাত বাড়িয়ে ফস করে ধরে ফেলল রাবুর মুখটা। টেনে আনল; তারপর চেপে রাখল ঠোঁটের উপর। কয়েকটা

নিস্তব্ধ মুহূর্ত। জাহেদের ঠোঁটের উষ্ণতায় মুখটা বিছিয়ে নিঃসাড় পড়ে থাকে রাবু। বুঝি ফুরিয়েছে ওর সংস্কারের আয়ু। বুঝি ভেঙ্গে গেছে ওর অর্থহীন প্রতিরোধের দেয়াল।

রাবু আল্গা হতে চায়। কিন্তু পারে না। দুটো শক্ত বাহুর আলিঙ্গনে আটকা পড়েছে ও। আর ওর নিস্তেজ স্নায়ুতে নেই আল্গা হবার মত সামান্য একটু শক্তি।

হয়ত অনেক কথাই মনে পড়ছে ওদের। হয়ত কোন কথাই এক মুহূর্তে মনে পড়ার মত নয়, মনে পড়ছে না। এখন মুহূর্তে দুজোড়া ঠোঁটের উষ্ণতায় নিঃশেষ হওয়াটাই বুঝি একমাত্র সত্য।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রাবু। বলল, ছাড় লক্ষ্মীটি, কেউ এসে পড়বে।

থেয়েছিস ?

আলবৎ।

মিথ্যে কথা।

সহসা রাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সত্য কথাটা গোপন করতে পারলনা মালু। চুপ করে রইল।

আমার পয়সা দিয়ে বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নিই। খাবি তো? নাকি এ বাড়িতে বসে খেতেও তোর আপত্তি।

হ্যাঁ না কি যে বলবে মালু ভেবে পায় না, ইতস্ততঃ করে ও।

তার চেয়ে এক কাজ করি, আমিও খাইনি। চল্ কোন হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি আমরা

চল।

খেতে বসে অনর্গল কথা বলে গেল রাবু, অনেক নতুন খবর শোনাল মালুকে। পার্ক সার্কাস ময়দানে দাঙ্গা-বিরোধী মিটিং হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম মিলনের দাবী জানিয়ে সে মিটিংয়ে জাহেদ আর রাবু বক্তৃতা দিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি এবং শান্তির জন্য, দাঙ্গাবাজদের রুখবার জন্য শান্তি কমিটি হয়েছে। রাবু সে কমিটির মেম্বার হয়েছে।

মেজো ভাই নেই ? শুধাল মালু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও আছে কমিটিতে। কথার মাঝে বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়েই

বলল রাবু। বলে চলল: ব্রেবোর্ণ কলেজে যে ইভাকুই ক্যাম্প হয়েছে। সেখানে ভলান্টিয়ার হয়েছি। কলাবাগান গিয়েছিলাম, সেখানে বস্তির লোকেরা রায়ট ঠেকিয়েছে; কাউকে রায়ট করতে দেয়নি। বাইরে থেকে গুণ্ডারা গেছিল রায়ট বাধাতে। ওদের হটিয়ে দিয়েছে। তিলজলায় প্রায় সব বাড়িতেই লুঠের মাল মজুদ ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য! আমরা অনুরোধ করলাম, আমি ছোটখাটো একটা বক্তৃতাও দিয়ে ফেললাম। ওরা সব লুটের মাল আমাদের হাতে তুলে দিল। বলল, এগুলো যাদের জিনিস তাদের কাছে তোমরা পৌছে দিও। আর বলল, যারা চলে গেছে ঘর ছেড়ে অন্য পাড়ায় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এস। আমরাই তাদের পাহারা দেব। অদ্ভুত সুন্দর অভিজ্ঞতা, তাই না?

রাবুর চোখে দীপ্তি। রাবুর মুখে অপার্থিব কোন আনন্দের গর্বিত ঘোষণা। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে মালু। রাবুর এমন সহজ আনন্দিতরূপ সেই ছোট-বেলার পর আর কখনও দেখেছে কিনা মনে পড়লনা মালুর।

রাবু বলে চলেছে, গতকাল মাওলালির দিকে আমরা শান্তি মিছিল বের করেছিলাম। জাহেদ তো কিছুতেই আমায় যেতে দেবেনা মিছিলে। আমি বললাম, যাবই। অদ্ভুত এক যুক্তি দিল জাহেদ, গুণ্ডারা আক্রমণ করলে মিছিল সামলাব নাকি তোমাদের রক্ষা করব? আমি বললাম, নিজেদের সামলিও তোমরা, দয়া করে আমাদের নিয়ে মাথা ঘামিওনা, আমরা আত্মরক্ষা করতে জানি।

সেই দিঘলদেহী মেয়েটাকে মনে আছে তোর?

মালু ঠিক ধরতে পারলনা। শুধাল, কোনটার কথা বলছ?

আরে, আমাদের ব্রেবোর্ণ কলেজের সেই মেয়েটা, স্ট্রাইকের লিডার ছিল এই অজুহাতে যাকে কলেজ থেকে বের করে দিল প্রিন্সিপাল মিস গ্রস। আর আমরা আন্দোলন করলাম, মনে নেই?

হাঁ হাঁ চিনেছি, সেদিন ড্যালহৌসী স্কোয়ারের মিছিলেও ছিল তোমাদের সাথে। সে মেয়ে তো প্রায় লাফিয়ে পড়ল জাহেদের ঘাড়ে; আপনারা পেয়েছেন কি? চিরকাল মেয়েদের অবলা ভেবে এসেছেন, আজও তাই ভাবেন, ভাবেন আমরা কি আর আত্মরক্ষা করতে জানি? আমি হলফ করে বলছি গুণ্ডাদের আমরা ঠেঙ্গাতে পারি এবং ঠেঙ্গাব।

কিন্তু পত্রিকায় দেখলাম তোমাদের মিছিল নাকি গুণ্ডারা আক্রমণ করেছিল? শুধাল মালু।

আক্রমণ বলে আক্রমণ? রীতিমত হামলা। তিন দল তিন দিক থেকে উন্মুক্ত ছোরা নিয়ে উন্মাদের মত হামলা করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি ভয় পেয়ে গেছিলাম, বাব্বাঃ ওরকম ছোরার নাচনে কার না ভয় লাগে।

তারপর? রুদ্ধশ্বাস মালু।

তারপর আর কি? মিছিলের কয়েকটা বেপরোয়া ছেলে লাঠি নিয়ে তাড়া করল ওদের। ওরা পালিয়ে গেল।

সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার কি দেখলাম, জানিস?

কি?

গরীব লোকরাই ক্ষেপেছে বেশি, অথচ এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে ওদেরই সবচেয়ে বেশি।

ওরা ক্ষেপেনি আমার মনে হয় ওদের ক্ষ্যাপান হয়েছে।

সেটা অবশ্য ঠিক।

সহসা খাওয়া ছেড়ে সশব্দে হেসে উঠল রাবু হেসে চলল।

পরিবেশকরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। মালুর হাতের চামচটা থেমে গেল। ভ্রূ কুঁচকে কি যেন বিড়বিড় করল পার্শ্ববর্তি টেবিলের নিঃসঙ্গ ভোজনকারী এক প্রৌঢ়।

কি হল, হঠাৎ বেপরোয়ার মত হাসতে শুরু করলে?

ওই দেখ্। ইশারায় দূরের টেবিলটা দেখিয়ে দিয়ে মুখে আঁচল পুরল রাবু। হাসিটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছেনা ও।

মালু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দূরের সেই টেবিলে পড়ে রয়েছে চায়ের সরঞ্জাম। চেয়ারটায় হেলান দিয়ে নাক ডাকছে জাহেদ আর উর্দি পরা পরিবেশক চায়ের প্রতি ঘুমন্ত খদ্দেরের মনযোগ আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টায় হিমসিম খেয়ে চলেছে।

মালুও হেসে দিল। দূরের সেই পরিবেশকটিও যোগ দিল ওদের হাসিতে। হয়ত সেই হাসির শব্দেই জাহেদের চোখ খুলে গেল। তাড়াতাড়ি ঢেলে নিল এক কাপ চা। দু ঢোকেই গিলে ফেলল। এসে বসল রাবুদের টেবিলে। শুধাল, আচ্ছা তোরা এখানে? এতক্ষণ তো দেখিনি?

ওমা! ঘুমুলে কেউ কি আবার চোখে দেখে নাকি? জানতাম না তো? চোখ কপালে তুলল রাবু।

যাহ্, ঘুমুচ্ছিলাম কোথায়? চোখ বুজেছিলাম। প্রতিবাদ করল জাহেদ।

তা বটে, চোখ বুজে একটু নাক ডাকছিলে। ঘুমুচ্ছিলে কোথায়?

নিশ্চয়না আমি নাক ডাকছিলাম না। তুই শুনেছিস ?

আলবৎ শুনেছি। সাক্ষী চাই ? হাত তুলে সেই পরিবেশককে ডাকল রাবু।

বেশ, ডাক, সাক্ষী।

ওদের খুনসুটিতে মনে মনে হাসে মালু। ওদের এ ছেলেমানুষি ঝগড়াটা কেন যেন ভাল লাগল ওর। ও বলল, থাম মেজ ভাই, আমিও সাক্ষী তোমার বিপক্ষে।

হ্যাঁ, দেখ্‌না কাণ্ডটা। এতবড় হল ঘরে এতগুলো লোক খাচ্ছে, তার মাঝে আক্কেলের মাথা খেয়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছেন তিনি, আর এখন বলেন কিনা, নিশ্চয়না। এদিকে বাহাদুরীর ঠেলায় আমার ঘরে টেকা দায়। রাত দুটোয় বাড়ি ফিরবে, ভোর সাতটায় যাবে বেরিয়ে, বলবে, দেখছিস পাক্কা কুড়ি ঘণ্টা খাটি, চার ঘণ্টা ঘুমোই। কেমন খাসা স্বাস্থ্য। পারবি আমার মত হতে ?

হয়েছে, হয়েছে, আমরা বুঝলাম, জবর বক্তৃতা দিতে শিখেছেন মিস রাবেয়া খাতুন বি, এ (হন)। এবার দয়া করে থামুন। বলল জাহেদ।

রাবু থামেনা। তেমনি কপট গাম্ভীর্যে বলে চলে, কেন থামব ? উঠতে বসতে তাহলে এত কথাই বা শোনাস হয় কেন ?

আচ্ছা, আচ্ছা, আর শোনাবনা। এখন ধরতো এগুলো। কতগুলো ইংরেজী টাইপ করা আর বাংলা হাতে লেখা কাগজ রাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল জাহেদ।

কি করতে হবে ?

পৌঁছিয়ে দিতে হবে সমস্ত পত্রিকায়, নিউজ এজেন্সীতে।

সঙ্গে কে যাবে ?

কেউনা।

না, একলা এত যায়গা ঘুরতে পারব না আমি। তুমি থাকবে সঙ্গে ?

যদি যেতেই পারতাম তবে কাজটাও তো আমিই করতাম ; তোকে দিতাম নাকি। পোর্টফোলিওটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল জাহেদ।

বেশ। কাজটা তাহলে হচ্ছেনা।

মানে ? ভ্রূ কুঁচকাল জাহেদ।

আমি যাচ্ছিনা।

একটা প্রশ্রয়ের হাসি ফুটে উঠল জাহেদের ঠোঁটে, মৃদু তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে, তারপর চোখের তারায় এসে স্তব্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল। ও বলল, কাল যে সারাদিন ঘুরলাম তোর সাথে ?

বাজে কথা। নিজের কাজে ঘুরেছ। আমাকেও ঘুরিয়ে মেরেছ।

বেশ, কথা রইল, আগামী কালও ওরকম ঘুরিয়ে মারব।

সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাবুর চোখ। পুরো গালে হাসল ও। শুধাল, প্রতিশ্রুতি?

হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি।

ওরা তিনজনেই এবার গলা মিলিয়ে হাসল জাহেদ বেরিয়ে গেল।

হাসির রেশটা এখনও জেগে আছে ওদের মুখে। পরিবেশক দ্বিতীয় দফা চা রেখে গেছে টেবিলে।

রাবু আপা, তুমি ধরা পড়ে গেছ। বলল মালু।

কি রকম?

মেজো ভাইকে ভালবেসেছ তুমি।

বুঝি চমকে উঠল রাবু। ঠোঁটের কোনে জেগে থাকা হাসির রেশটুকু সহসা কি এক কঠিন রেখায় রূপান্তরিত হল। কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল রাবু। তারপর মালুর ঢেলে দেওয়া চাটা হাতের কাছে টেনে বুঝি একটু সহজ হতে চাইল। বলল, তাতে কি হল?

এই হল যে এবার তালাকটা নিয়ে নেবে আর মেজো ভাইকে বিয়ে করবে।

সে হয়না।

কেন হয়না?

সে তুই বুঝবিনা।

বুঝিয়ে বললেই বুঝি। মালু জিদ ধরে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

কিছুক্ষণের জন্য বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে রইল রাবু। অথবা অন্যমনস্ক চোখজোড়ার আড়াল নিয়ে কোন একটি চিন্তার সুতো খুঁজে নিল। বলল, জাহেদকে বিয়ে করলে ওরই ক্ষতি করা হবে।

কেন?

হয়ত আমি ওকে পোষ মানাতে চাইব। হয়ত ও নিজেই পোষ মেনে যাবে। আর দশজন পুরুষের মত বৌ আর ঘর নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তখন? তখন তো ওর মৃত্যু।

তা কেন হবে? তোমরা দুজনই তো আদর্শ সচেতন মানুষ। তর্কের জন্য তৈরী হল মালু।

নিজের উপর অতটা আত্মবিশ্বাস আমার নেই, সে তো তোকে আগেই বলেছি। বেশ, তর্কের খাতিরে না হয় তোমার কথাটা আপাততঃ মেনে নিচ্ছি। কিন্তু মেজো ভাই? সে তো তোমাকে ভালবাসে?

ওর জীবনটা এখনো যুক্তিনির্ভর নয়, আবেগ নির্ভর, আমিও হয়তো তাই। সেজন্য বড় ভয় আমার। তাই তো এসব কথা ওর সাথে আলোচনা করিনা।

আলোচনা না করলেই কি সে সান্ত্বনা পাবে? তুমি পাও?

চুপ করতো। ধমক দিতে গিয়ে বুঝি কেঁদেই ফেলল রাবু।

মালু দেখল উদগত কান্নার রেশটাকে সামলাতে গিয়ে রাবু মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, চোখে রুমাল চেপেছে। কিন্তু মালুর আজ জিদ চেপেছে, ও নাছোড়বান্দা। রাবুর দ্বিধা, রাবুর যন্ত্রণার উৎস খুঁজে পেতে হবে ওকে।

ও শুধাল, চিরটা কাল এমনি থাকবে, রাবু আপা?

থাকলামই বা। ক্ষতি কি? বলেই উঠে দাঁড়াল রাবু। প্রসঙ্গটার এখানেই ইতি টানতে চায় ও।

রেস্তোরার বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

চল্ বিবৃতিগুলো দিয়ে আসি প্রেসে। যাবি আমার সাথে? শুধাল রাবু।

চল।

ওরা ট্রামে চেপে বসল।

স্বচ্ছ আকাশ।

মিটি মিটি আলো দিচ্ছে অসংখ্য তারার বাতি।

সেই নরক রাতের আগুন নেই মহানগরীর আকাশে। ধোঁয়াও নেই। তবু মনে হয় মালুর, সে রাতের ভয়ংকর ছায়াটা এখনো ধাওয়া করে চলেছে এই মহাগনরীর প্রতিটি মানুষকে। প্রতিটি মানুষের বুকে এখনো সেই নরক রাতের যন্ত্রণা, কাতর আর্তনাদ।

মেয়ে কলেজটাকে একাধারে হাসপাতাল আর ইভাকুউ ক্যাম্পে রূপান্তরিত করেছে ওরা।

ঘর, বারান্দা, খোলা চত্বর, কোথাও একটু পা ফেলবার যায়গা নেই। স্টীমারে ডেকের যাত্রীর মতো নারী পুরুষ এক সাথেই সারি সারি শুয়ে আছে সব। সর্বস্ব খুইয়ে আসা মানুষ, কবে যে আবার নিজেদের আস্তানা গড়ে তুলত পারবে কে জানে?

দুদিকের ঘুমন্ত মানুষের চাপে দমটা বুঝি বন্ধ হয়ে আসতে চায় মালুর। ঘামে জবজবে গায়ের জামাটা। ঘুম কিছুতেই আসে না। আর যখন ঘুম আসেনা তখুনি যেন রাজ্যের যত চিন্তা এসে ছেঁকে ধরে মালুকে। রাবুর মুখটাই বার বার ভেসে ওঠে ওর বোজা চোখের সুমুখে।

পাশ করে তো বেরুচ্ছ রাবু আপা। এবার মেজো ভাইকে নিয়ে ছোট্ট একটি সংসার পাতনা কেন? বলেছিল মালু, মাস তিনেক আগে, রাবুদের হস্টেল থেকে কলেজ স্ট্রীটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে।

কাউ ফলের কোয়ার মতো লাল টুকটুকে ঠোঁট জোড়া অকারণেই কামড়ে থেঁতলে একাকার করেছিল রাবু। তারপর বলেছিল, জাহেদ কি নীড় বাঁধবে? ঘরের সাথে তো ওর স্বভাবের বিরোধ।

অথচ গতকাল দুপুরে ঠিক উল্টো কথা বলল রাবু। আশ্চর্য। মালু বুঝতে পারেনা রাবুর সংশয় নিজেকে অথবা জাহেদকে নিয়ে।

আমার আব্বাকে মনে আছে তোর? কিছুক্ষণ পর শুধিয়েছিল রাবু।

বারে, মনে থাকবেনা কেন? মালু যেন প্রতিবাদ করেছিল।

আম্মা তাকে পারেননি সামলে রাখতে।

খোদার পথে যে দেওয়ানা তাকে সামলে রাখবে কে?

দেশের পথে যে দেওয়ানা তাকেই বা সামলাবে কে। মালুর কথাটা শেষ না হতেই বলেছিল রাবু।

কিন্তু, তুমিই যে বার বার ফিরিয়ে দিচ্ছ মেজো ভাইকে। একটু উত্যক্ত হয়েই যেন বলেছিল মালু।

সেদিন এক টুকরো বিচিত্র হাসি ছড়িয়ে চুপ করে গেছিল রাবু।

কেমন বদলে গেছে রাবু। এজমালি সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হয়েও থাকেনা পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে। সেটা নাকি তার আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের পথে মস্ত বড় বাধা।

শুধু রাবু কেন, গোটা সৈয়দ বাড়িটাই কেমন যেন হয়ে গেছে। সহজ ঢং, সরল ধাঁচ সবই যেন বদলে গেছে। শহরের আবহাওয়ায় স্বার্থ চিন্তার চক্রজালে সেই ছোট বেলায় দেখা সৈয়দ বাড়ির সহজ গাঁথুনিটা যেন ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে মমতা মাখা শান্ত স্নিগ্ধ পারিবারিক পরিবেশ। তাই জাহেদও আজ সে বাড়ীতে খাপছাড়া, অনাদৃত।

এমন কেন হল? বাকুলিয়ার সৈয়দ বাড়িতে কেন আজ মমতার পরশ নেই? কলকাতা শহরটার উপরই রাগ হয় মালুর। এই শহরই কেড়ে নিয়েছে বাকুলিয়ার সৈয়দদের শ্রী, সৌষ্ঠব।

মরুকগে সৈয়দরা। উঠে পড়ে মালু। পাউরুটিটা বগলে গুঁজে ঘুমন্ত মানুষের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে পা ফেলে নেমে আসে খোলা চত্বরে।

হাসি পেল মালুর। নিজের ভাবনার যার শেষ নেই সে কিনা কোন্ সব

মানুষের কথা ভেবে চলেছে। এই কটা দিনতো কোন রকমে ক্যাম্পেই কেটে গেল। তারপর? নেহাত ক্যাম্পের কিছু কাজকর্ম করে দিচ্ছে বলে রাতটাও কাটাতে পারছে। কিন্তু, এ রকম ফাঁকি দিয়ে আর কদ্দিন কাটাবে? তা ছাড়া খাওয়া? ক্যাম্প থেকে লঙ্গর খানায় খাওয়া গত পরশু থেকেই তার বন্ধ। অন্য ভলান্টিয়াররা সবাই বাড়ি থেকেই খেয়ে আসে, সে কেন ক্যাম্পের খাওয়া খাবে?

খাবারের কথা মনে হতেই পেটটা যেন ক্ষিধের ব্যথায় চিন চিন করে উঠল মালুর। রুটিটাকে নাকের কাছে এনে শুঁকল ও। ইচ্ছে হল এক কামড়ে খেয়ে নিক। তাড়াতাড়ি নাকের কাছ থেকে সরিয়ে আবার বগলে পুরল রুটিটা।

আজই সকালে কোন দানশীলা মহিলা এসে রুটি আর জিলিপী বিলিয়ে গেছে দুঃস্থদের। কেমন করে যেন একটা রুটি আর দুখানি জিলিপী পৌঁছে গেছিল মালুর হাতে। অর্ধেকটা রুটি আর জিলিপী দিয়ে বেশ তৃপ্তির সাথেই পেট ভরিয়েছে মালু। বাকী অর্ধেকটা রেখে দিয়েছে কাল সকালের জন্য।

আসলে সেই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে আসার পর একদিন, মাত্র একটা বেলা মালু তৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেতে পেরেছে। সে হল গতপরশু দুপুরে রেস্তোঁরায়। কথাটা মনে পড়ে জিবে জল আসল মালুর।

একটা ভলান্টিয়ার তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসল মালু। পাটা ছড়িয়ে দিয়ে চমকে উঠল ও। শিশির ভেজা ঘাসের নরম স্পর্শে চমকে উঠবারই কথা। সেই কবে গ্রাম ছেড়েছে, তারপর ঘাস দূর্বার নরম শরীর মাড়িয়ে পথ চলার যে রোমাঞ্চিত আনন্দ, সে তো এক রকম ভুলেই গেছে মালু।

অতর্কিতে অতীত এসে হানা দেয়। শূন্য গর্ভ আতঙ্কিত ভবিষ্যতটাও বুঝি। বাকুলিয়ার সেই বয়াতি ছেলেটি, বাইশ বছরের জীবনে কত বিচিত্র পথ পাড়ি দিয়ে এল ও। কত কথা আজ মনে পড়ছে ওর।

মেঘ এসে নিভিয়ে দিয়েছে তারার বাতিগুলো। আকাশটা অস্পষ্ট।

পাশের তেরপাল ছাউনিতে বাচ্চা একটি মেয়ে কেঁদে চলেছে অনেকক্ষণ। বুঝি তার মা, সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে, রোতি কেঁউ, আল্লা নে তেরা কিসমত ছিন লিয়া।

•

কিন্তু মেয়েটি শুনবে কেন ও সব কিসমতের ফের। দুধ খেয়েই বরাবর ঘুমাতে যায় ও। আজ দুধ পায়নি, তাই কান্না জুড়েছে ও। ঘুম তার আসছে না। এটা মাকে কেমন অরে বুঝাবে ও, কান্না ছাড়া?

মালুর ইচ্ছে হল রুটিটা দিয়ে আসুক মেয়েটির হাতে। দুধের বদলে রুটিটা পেয়ে হয়ত খুশিই হবে মেয়েটি। কান্না থামিয়ে কচি মুখখানি হেসে উঠবে। ঘুমিয়ে পড়বে।

উঠবে পড়ল মালু। দু পা এগিয়েও এল। কি যেন ভাবল। ফিরে এল। মনে মনে আবারও হাসল মালু। শুধু সৈয়দরা কেন, সে নিজেই তো কত বদলে গেছে। বদলে গেছে বলেই তো আগামী কালকের অনিবার্য উপোসের কথাটা ভাবতে হয় ওকে। রুটিটা বগলে চেপে ফিরে আসতে হয়। এটাই বুঝি মহানগরীর ধর্ম। মন থাকেনা এখানে। মন যায় মরে। কেঁদে কেঁদে বুঝি ক্লান্ত হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে তেরপাল ছাউনির মেয়েটি। দোতলার হাসপাতালের ঘরে কোন মুমূর্ষ যেন আর্তনাদ করে উঠল। রাস্তার ওপারে পার্কের উঁচু শিরিস শাখায় রাতের পাখিরা হঠাৎ ডানা ঝাপটিয়ে কেঁদে উঠল কি এক অজানা আতঙ্কে। ইচ্ছে হল মালুর, ওই আধখানা রুটি ছুঁড়ে ফেলে দিক নর্দমার জঞ্জালে। যে রুটি ওর একটি কোমল মানবীয় অনুভূতিকে পিষে মারল সে রুটি দিয়ে কেমন করে ক্ষুধা মিটাবে ও? গাটা কেমন ভিজে এসেছে মালুর। কুয়াশা পড়ছে। মনে হল মালুর, মহানগরীর উন্মত্ত দিনের যত উত্তাপ রাতের নিভৃতে স্নেহধারার সিক্ত পরশ হয়ে নেমে আসছে। সেই পরশ ওর সর্বাঙ্গে, ওই খোলা বারান্দার ঘুমন্ত মানুষগুলোর মুখে।

সকালে ঝিকিমিকি রোদটা মুখে পড়তেই ধড়ফড়িয়ে উঠল মালু। সেই তাবুর খুঁটিতে হেলান দিয়ে ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিল। প্রথমেই মনে পড়ল অর্ধেকখানি রুটির কথা। দুপাশে হাতড়াল ও। না, রুটিখানা ওর কোলের উপরই পড়ে রয়েছে।

তাঁবুর পেছনেই কল, মুখ হাত ধুয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে রুটিটা খেল মালু। তারপর কলের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি টানল। দিনের মতো ভরিয়ে নিল পেটটা।

ক্যাম্পের অফিস ঘরটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মালু।

সবুজ মলমলের উপর চাঁদতারা আঁকা ভলান্টিয়ারের গোল ব্যাজ বুকে এঁটে ঘর বারান্দা করছে রাবু। নিজের ময়লা পোশাকের দিকে তাকাল মালু। এ পোশাকে রাবুর সুমুখে পড়লে রক্ষে নেই। অফিস ঘরটি এড়িয়ে পেছনের চওড়া বারান্দাটার দিকে গেল মালু। কিন্তু ততক্ষণ ওকে দেখে ফেলেছে রাবু। ডাক দিয়েছে পেছন থেকে, এই মালু শোন্।

যা আশংকা করেছিল মালু তাই হল। ওর ময়লা পোশাক, খোঁচাখোঁচা দাড়ি, অপরিচ্ছন্ন মুখ, তেলহীন উস্কোখুস্কো চুল…সবটার উপর একটা শাণিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল রাবু। বলল, কী হয়েছে তোর। মনে হচ্ছে কোন আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এসেছিস ?

যারা মানুষ নয় তারা তো আস্তাবলেই থাকে।

কি হল ? এমন ঠেস দিয়ে কথা বলছিস যে ? একটু অবাকই হল রাবু। তুমিই বা আমার দারিদ্র্যকে এমন করে উপহাস করছ কেন ? তোমার সামর্থ আছে, তুমি রোজ ধোয়া আর ইস্ত্রী করা শাড়ি পরতে পার। আমি পারিনা। আমার সামর্থ নাই।

মালুর কণ্ঠে ঝাঁঝ। মালুর চোখে ক্ষুব্ধ অনুযোগ।

অবাক হওয়ার ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে রাবু তাকাল মালুর দিকে, বলতে গেল কিছু। কিন্তু মালু তখনো থামেনি।

আসলে তুমি যে সৈয়দবাড়ীর মেয়ে, থাকতে পার ফিটফাট, চলতে পার ছিমছাম এই আভিজাত্যবোধটা তুমিও ছাড়তে পারনি এখনো।

আর আমি যদি বলি তুই একটা আস্ত অকর্মা। গা আছে, গতর আছে, বুদ্ধিরও কমতি নেই অথচ ভেসে বেড়াচ্ছিস অপদার্থ ভবঘুরের মতো।

রাবু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

সে জন্য দায়ী আমার জন্ম।

বাজে কথা। তোর জন্ম তোকে বলেনি খেটে খাবিনা, রোজগার করবিনা।

চুপ করতে হল মালুকে। কেননা ওরা পৌঁছে গেছে দোতলায় ভলান্টিয়ার অফিসে। সেখানে অনেক ভীড়। একটা টেবিলে অনেকগুলো কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে চাল ডাল আটা তেল নুনের হিসেব। কাগজ-গুলো গুছিয়ে নিয়ে হিসেব করতে বসল রাবু।

আমি আসি তাহলে ? দরজার দিকে পা বাড়াল মালু।

না বস্। কথা আছে। হিসেব লেখা কাগজের উপর থেকে মুখ না তুলেই বলল রাবু। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল মালুর দিকে।

চা খাবি ? শুধাল রাবু।

পেলে খেতে পারি।

এবার মুখ তুলে মালুর দিকে তাকাল রাবু। হাসল। বলল, এখনো চটে আছিস তুই।

সত্যি চটেছে এবং এখনো চটে আছে মালু। কেননা রাবুর হাসির উত্তরে হাসতে পারলনা ও।
একটা মজার জিনিস দেখবি ?
কি ?
একটা চিঠি। বলেই হাতব্যাগটা খুলল রাবু। বের করল চিঠিটা। এগিয়ে দিল মালুর হাতে। চোখ বুলিয়ে গেল মালু :
জানের জান বিবিজান,
দোয়াপর সমাচার এই যে গুজাশতা সাল আপনাকে তিনখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। এই সালের শুরুতেও এক পত্রে দোয়া ফরমাইয়াছিলাম। সেই সমস্ত পত্রে দীন-ই-ইসলাম এবং আপনার খসমের প্রতি আপনার দায়িত্বর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। আফসোস আপনার কোন জবাব পাইলাম না। শুনিলাম আপনি পর্দা কলেজ ছাড়িয়া এখন সম্পূর্ণ বেপরদা হইয়াছেন এবং বেগানা লোকজনের সঙ্গে হরদম ঘোরা ফিরা করিতেছেন (নাউজুবিল্লা···) আপনি কেন এভাবে নিজের উপর এবং ভবিষ্যতের আওলাদ ফরজন্দের উপর লানত ডাকিয়া আনিতেছেন আমার আদনা বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনি কতবড় নেকবক্ত দরবেশের সাহেবজাদী, কতবড় পীরের জেনানা, এ কথা কি ভুলিয়া গিয়াছেন ? নিশ্চয় আপনার উপর শয়তান ভর করিয়াছে, নচেৎ আপনি কী-ভাবে এই সব গোনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হইতেছেন।
আল্লাহ্‌তালা বলেন :
কুয়া আনফেসাকুম ওয়া আহলিকুম নারান্‌
অর্থাৎ তোমরা নিজেকে এবং পরিজনকে দোযখের ভীষণ অগ্নি হইতে বাঁচাও।
আল্লাহ্‌তালার এই সতর্ক বাণী মনে রাখিয়াই আমি আপনাকে বহুত নসিহত করিয়াছি, চিঠিপত্র মারফত বহুত হেদায়ত করিয়াছি। কিন্তু মনে হইতেছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ভিন্নরূপ। আপনি সৎপথে ফিরিয়া আসিবেন না এবং মৃত্যুর পর অনন্তকাল দোযখের ভীষণ অগ্নিতে পুড়িতে থাকিবেন। এই রূপই সাব্যস্ত করিয়াছেন।
যাহা হোক স্বামী হিসাবে আমার কর্তব্য পালনে আমি বিরত হইবনা। কেননা বেওকুফ দুরাচারিণী স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ্‌তালাই কোরানে ফরমাইয়াছেন : প্রথমে তাহাকে বুঝাও, স্বামী-স্ত্রীর আচার ব্যবহার

ও নারীর আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহাকে নসিহত কর, যদি তাহাতেও সে ভাল না হয়, তবে তাহার বিছানা পৃথক করিয়া দাও, ইহাতেও যদি সে ভাল না হয় তবে তাহাকে শাস্তি দাও।"

আপনি যদি আল্লাহ্‌তালার নির্দেশিত পথে ফিরিয়া না আসেন তবে অবশ্যই আপনাকে অতি কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে। আপনি বিবাহিতা স্ত্রী হইয়াও বৈবাহিক ধর্ম পালন করিতেছেন না, স্বামীর ডাকে সাড়া দিতেছেন না। উপরন্তু বেগানা মরদদের সহিত অশোভনভাবে মেলা মেশা করিতেছেন। নিশ্চয় জানিবেন ইহা অতি শক্ত গোনাহ্‌, এই গোনাহ্‌র শাস্তিরূপে দোযখে হাবিয়ার ভয়ংকর আগুনে আপনাকে চিরকাল জ্বলিয়া থাক হইতে হইবে।

হে মূঢ় বালিকা।

ইহাতেও কি তোর চৈতন্যোদয় হইবেনা? এখনও কি তুই স্বামীর মহব্বতে ফিরিয়া আসিবিনা? তুই কি এখনও স্বামীর নির্দেশ অমান্য করিবি? তুই কি আল্লাহ্‌তালাকে ভয় করিসনা? তুই কি দোযখের আগুনকে ভয় করিসনা?

দিলের দিল জানের জান ছোট বিবিজান।

আপনার সমস্ত অপরাধ আমি অতীতেও ক্ষমা করিয়াছি, এখনও ক্ষমা করিতে পারি! কেননা আপনার খানদানকে আমি পছন্দ করি, আপনাকে মহব্বত করি। এই কারণেই আপনাকে আমি শক্ত কোন বদদোয়া অথবা কোন লানত্‌ দিতে পারিনা। এই কারণেই কথনো আল্লার দরবারে ফরিয়াদের হাত উঠাইলেও আমার সে হাত নামিয়া আসে। আপনি চিরকাল দোযখের আগুনে পুড়িবেন, এ কথাটা আমি কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠি। আমার দিলে সদমা পয়দা হয়। অতএব পত্র পাওয়া মাত্র চলিয়া আসিবেন। এই পত্রের উত্তর লিখিবেন। সাতদিনের মধ্যে আপনি না আসিলে অথবা আপনার কোন চিঠিপত্র না পাইলে আমি স্বয়ং কলিকাতা আগমন করিব।

আর একটি কথাও আপনাকে জানান প্রয়োজন মনে করিতেছি। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন আপনার বড় আপা অর্থাৎ আমার বড় বিবি এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন। তাহার অবর্তমানে সংসার ছারেখারে যাইতেছে। কেননা আপনার অন্য আপারা একেবারেই নালায়েক। তাহা ছাড়া আমারও সেবা শুশ্রূসার দরকার। আপনি আসিলে সবদিক দিয়াই উত্তম।

সব শেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তালা যিনি মালেকুল মউত, গায়রুল গনি,

তাহার নিকট দোয়া চাহিতেছি তিনি যেন আপনার নাপাক দিল সাফ করিয়া দেন, আপনাকে নেকপথে পরিচালিত করেন, শয়তানের কুপ্রভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করেন।

ইতি

আলহজ্জ শাহসুফি গোলাম হায়দার মোজাদ্দদী।

ছোটবেলার কথা মনে পড়ল মালুর। গোনাহ্‌র কথা শুনলে ভয় পেত মালু। দোজখের জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের কাহিনী শুনে শিউরে উঠত। আর রাবু, আরিফাকে গোনাহ্‌র হাত থেকে বাঁচানর জন্য কত ব্যাকুল প্রার্থনায় চোখের পানি ফেলত মালু।

মালু দেখল ছোটবেলার অনেক বিশ্বাস, অনেক সংস্কার আর মোহ যেমন ভেঙ্গে গেছে তেমনি ভীতি নামক বস্তুটাও কখন অদৃশ্য হয়েছে মনের কোণ থেকে। মালুর হৃদয়টা আজ দুর্বোধ্য কোন ভয়ে কেঁপে কেঁপে আড়ষ্ট হলনা মালুর চোখের কোনে আজ প্রার্থনার জল জমলনা। মালুর চোখের ক্ষেতে আজ ঘৃণার আগুন। অজস্র শিখায় জলে উঠল সে আগুন।

রাবু আপা। কেন তুমি বিদ্রোহ করনা? কেন এই অত্যাচার সহ্য করে চলেছ তুমি? এ অন্যায়ের প্রতিবাদ শুনিনা কেন তোমার কণ্ঠে? আশ্চর্য! রাবু হাসছে আর আঙ্গুলের ইশারায় চুপ করতে বলছে মালুকে। রাবুর নিস্পৃহতা অসহ্য। মালু বুঝি কেঁদে ফেলবে। প্রায় কান্নার মতই শুধাল, কেমন করে তুমি হাসতে পার রাবু আপা? তোমার কি ঘৃণা নেই? বর্বরকে, কুৎসিতকে তুমি ঘৃণা করনা?

ঘৃণা আছে বলেই তো হাসতে পারি। এবারও হাসল রাবু। হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে ক্যাম্প রেজিষ্টারটা টেনে নিল।

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে আরও অনেক প্রশ্ন ঠেলে আসে। মালুর ক্রোধ শান্ত হয়না! কিন্তু এক দঙ্গল মেয়ে ভলান্টিয়ার ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর, শুরু করেছে উড়ো কথার কিচিরমিচির। কে একটা স্লিপ এগিয়ে দিয়েছে রাবুকে, অফিসে ওর তলব পড়েছে।

যাসনে কোথাও। এখুনি আসছি আমি। মালুকে বসতে বলে একতলার সিড়ি ধরে নেবে গেল রাবু।

মালুর উপস্থিতি সম্পর্কে এতক্ষণে বুঝি সজাগ হয়েছে মেয়েগুলো। তাই চুপ

করে গেছে ওরা। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মালু অবরোধের দেয়াল ভেঙে এই প্রথম ওরা বেরিয়ে এসেছে পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গনে। বুঝি তাই ঠোঁটে ওদের কথার খই, মুখে ওদের আলোর দীপ্তি, ওদের চোখে বিস্ময়। নতুন পাওয়া স্বাধীনতার উচ্ছলতা ওদের সর্ব অঙ্গে, ওদের হাসির ফোয়ারায়।

যেমন নেমে গেল সিঁড়ি ধরে তেমনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এল রাবু। বলল চল, বাসায় ডাক পড়েছে। জরুরী টেলিফোন।

কে ডেকেছে, কেন ডেকেছে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও রাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল মালু। অস্বাভাবিক গম্ভীর রাবু। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার পথে কে যেন ওর মুখের সমস্ত রক্ত টেনে নিয়েছে। ওর মুখটা কাগজের মত সাদা।

বৈঠকখানায় পা রেখে ওরা চমকে উঠল, থমকে দাঁড়াল।

বৈঠকখানার গালিচার উপর জায়নামায বিছিয়ে বসে আছেন আলহজ্ব শাহসুফি গোলাম হায়দার মোজাদ্দেদী সাহেব। দুপাশে তার দুই খাদেম। সারা ঘর সৈয়দবাড়ির ছেলে মেয়েতে ভর্তি। খবর শুনে আরিফাও এসেছে ইঞ্জিনীয়ার স্বামী, দুই ছেলে, তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। যে যেমনটি পেরেছে কোনরকম জায়গা করে বসে গেছে ঘরে, কারো মুখে রা নেই। সৈয়দদের মেম বৌ, সেও আজ দুচোখে বিস্ময় ফুটিয়ে নির্বাক হয়েছে, জড়োসড়ো বসে আছে ভীড়ের ভেতর।

সারা বাড়িতে সৈয়দ সাহেবই একমাত্র চলমান মানুষ, এ ঘর ও ঘর করছেন, কি করবেন, কি বলবেন বুঝতে পারছেননা। অবশেষে পাকঘর থেকে বের করে এনেছেন কালিঝুলিতে একাকার শতজীর্ণ একটা তালপাখা। মাথার উপর ঘূর্ণীয়মান বিজলী পাখার অস্তিত্ব সত্ত্বেও তাল পাখাটা জামাতাজির খাদেমের হাতে তুলে দিয়ে যেন হাফ ছাড়লেন সৈদয় সাহেব।

ওদিকে সৈয়দগিন্নী স্বহস্তে শরবত বানাতে গিয়ে দু দুবার গ্লাশ ভেঙেছেন। অতঃপর দাসীর হাতে শরবতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে আত্মগোপন করেছেন।

অবাক মানে মালু। সেই দীর্ঘদেহ, উন্নত নাসিকা গৌরবর্ণ নুরানী চেহারা, মেহেদী রং দাড়ি, মেহেদী রং বাবরি, যেমনটি দেখেছিল এক যুগ আগে ঠিক তেমনটি দেখছে আজও।

সুঠাম দেহটিকে জড়িয়ে সেই অপরূপ অলংকার-ধবধবে চাপকান, বুটিদার

চোগা। ইসে আতরের সুবাস। শুধু কাছে এসে, তীক্ষ্ণ চোখে, একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝি ধরা পড়ে যায় মোজাদ্দেদী সাহেবের ফাঁকিটা।

নজরে পড়ে তার চোখের কোলে চিতিপড়া কুঞ্চিত চাম, কপালের কুঞ্চন রেখায় বয়সের ছাপ। কিন্তু সে বয়স কত হবে? পঞ্চাশও হতে পারে সত্তরও হতে পারে। তার চেয়ে বেশিও হতে পারে। অবাক মানে মালু, কেমন করে বয়সকে ফাঁকি দিয়ে চলেছেন মোজাদ্দেদী সাহেব?

ছোটবেলায় সাপের চোখ দেখছে মালু। তীব্র তীক্ষ্ণ.অস্থির সন্দিগ্ধ। সাপের চোখ এ মুহূর্তও কোথাও স্থির থাকেনা। ওর মনে হল অনেকদিন পর আবার সাপের চোখ দেখছে ও। কারো মুখের উপর, কোন কিছুর উপর এক মুহূর্তও স্থির থাকছে না মোজাদ্দেদী সাহেবের চোখ। ঘরের প্রতিটি নরনারীকে, প্রতিটি শিশুকে, প্রতিটি আসবাবকে মুহূর্ত দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় দংশন করে চলেছেন, ঘরময় এক ভীতি বিহ্বল সম্মোহনের কালো পর্দা বিস্তার করে রেখেছেন মোজাদ্দেদী সাহেব। মোজাদ্দেদী সাহেবের চোখে চোখ রাখতে পারে এমন মানুষ বুঝি পৃথিবীতে নেই। কিন্তু মোজাদ্দেদী সাহেবের নুরানী মুখটা আসলে নিস্পৃহ, কোন নিরাকারের ধ্যানে শান্ত সমাহিত। ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই, খেদ নেই, লোভ নেই, প্রেম নেই সে মুখে। শুধু আছে প্রোজ্জ্বল সেই নুরানী চমক, গৌরবর্ণ চামড়ার গায়ে সুখাদ্য, সুস্বাস্থ্য ও সুখী জীবনের টকটকে আভা।

মোজাদ্দেদী সাহেবের হাতে তসবি। ঠোঁটের মৃদু কম্পন থেকে বোঝা যায় তিনি দরুদ পড়ছেন।

মোজাদ্দেদী সাহেবের সেই সাপের চোখ এক মুহূর্তের জন্য, শুধু এক মুহূর্তের জন্য রাবুকে দেখল। আবার যেমন ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল তেমনি ঘুরে চলল। মোজাদ্দেদী সাহেবের মুখে কি কোন ভাবান্তর এল? মনে হলনা। শুধু শোনা গেল তিনি বলছেন তারই এক খাদেমকে লক্ষ্য করে তওবা, তওবা, ইয়ে কেয়া জামানা আগিয়া। এতনা বড়া সৈয়দ কামেল আলেম আওর দরবেশকা লাড়কী বেপর্দা ঘুমতা ফিরতা হ্যায়। সেরপর থোড়া কাপড়া ভি হ্যায়। আওর বেগানা মরদ কা সাথ? তওবা তওবা নাউজুবিল্লাহ্......।

'বেগানা মরদ' মালু একবার তাকাল রাবুর দিকে। কী ভাবছে রাবু? হয়ত ওর হৃদয় জুড়ে আজ আগুনের ঝড়, আদিম পৃথিবীর সেই অগ্নিমথিত কান্না। হয়ত ওর হৃদয়টা একেবারেই নিস্তরঙ্গ। কোন ক্ষোভ নেই, ঘৃণা

নেই, আলোড়ন নেই সেখানে, আছে শুধু নিঃসাড় করা জমাট ভয়ংকর এক স্তব্ধতা। হয়ত ভাববার চিন্তার সমস্ত শক্তিই লোপ পেয়েছে ওর।
আশ্চর্য। এর মাঝেও মোজাদ্দেদী সাহেব আর তার দুই খাদেমকে চোখ বুলিয়ে দেখল রাবু। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখল, তারপর ভীড় কেটে চলে গেল ভেতরে।
পৃথিবীতে এমন লোক কিছু রয়েছে যে কোন অঘটনের সময় মাটি ফুঁড়ে যারা উঠে আসবেই এবং অঘটনের সাথে জড়িয়ে পড়বেই। অন্ততঃ এই মুহূর্তে জাহেদকে দেখে তাই মনে হল মালুর।
বগলভর্তি ফাইল, হনহনিয়ে এল জাহেদ। বৈঠকখানার ভীড়টা দেখে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর বাড়ির চাকরটাকে উচ্চঃস্বরে ডাকতে ডাকতে চলে গেল ভেতরে।
আর এক দিনের কথা মনে পড়ল মালুর। সেদিনের মত ক্রুদ্ধ রাগে জাহেদ কি কেটে পড়বেনা? জাতামাজীবনকে চ্যাংদোলা করে তুলে দিয়ে আসবেনা শিয়ালদহ ষ্টেশনে?
একপা দুপা করে জাহেদের ঘরে এসেই বসল মালু। বিছানায় উপুড় হয়ে কি যেন লিখছে জাহেদ। মালুকে হয় দেখলনা নতুবা দেখেও গ্রাহ্য করলনা। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মালু। হাই তুলল। বার দুই কাশল। তারপর উঠে গিয়ে একটা বই তুলে নিল শেলফ থেকে। বইয়ের পাতা ওল্টাল খস খসিয়ে। কিন্তু এত করেও জাহেদের দৃষ্টিটা আকর্ষণ করা গেলনা। অবশেষে মরিয়া হয়েই বলল মালু, এসেছে তো!
জাহেদ তখন লেখাটা শেষ করে কতগুলো সাদা কাগজ টেনে নিয়েছে, সাদা কাগজগুলোর পিঠে পিঠে কার্বণ সাজিয়েছে। তারপর কলম ফেলে পেন্সিল টেনে নিয়েছে।
এসেছে তো! আবারও বলল মালু!
দেখলাম তো! বলল এবং একপলক মালুর দিকে চাইল জাহেদ। আবার কপিতে মন দিল।
বিস্মিত হল, ক্ষুব্ধ হল, ক্রুদ্ধ হল মালু। এই দুর্যোগের দিনে কেমন করে নির্লিপ্ত থাকতে পারে জাহেদ?
মেজো ভাই! তুমি কিছুই করবেনা? কিছুই বলবেনা? চেঁচিয়ে উঠল মালু।
যেন বিরক্ত হয়েছে এমনিভাবে কার্বণ আর কাগজগুলো গুটিয়ে ব্যাগে ভরে

নিল জাহেদ। বলল, সত্যি মালু, তুই এখনো একেবারেই ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস। আজ যে আমার কোন কিছু বলার উপায় নেই, সেটা দেখতে পাচ্ছিসনে তুই? তুই কি দেখছিসনা, এ নৃশংসতার যে বলি তার কণ্ঠে প্রতিবাদ নেই, তার চোখে ঘৃণা নেই?

আশ্চর্য! শেষের কথাগুলো বলতে গিয়ে জাহেদের গলাটা কেঁপে গেল। অবরুদ্ধ অভিমানে অথবা আপন অসহায়তার বেদনায় ও বুঝি এখুনি ভেঙ্গে পড়বে। অবাক হল মালু। বক্তৃতার গলা, স্লোগানের গলা জাহেদের। এ গলা মিটিংয়ে মঞ্চে ঝড় তুলেছে, তর্কে বিক্ষোভে আবেগ উচ্ছ্বাসে আগুন ধরা বারুদের মত বিস্ফোরিত হয়েছে। সেখানে কোথায় লুকিয়েছিল এই করুণকম্পন, এই দুর্বলতা? তবু বলল মালু, সেদিনও তো প্রতিবাদ করেনি রাবু আপা।

সেটা ছিল ১৯৩৭ সাল। আজ ১৯৪৬ সাল। সেদিন নিজের ভাল মন্দ বুঝবার মত বয়স বুদ্ধি কোনটাই ছিলনা ওর। আজ-ওর বিবেক, ওর কর্তব্যবোধ সব কিছু নিয়ে ওর যে জীবন তার মালিক একমাত্র সে-ই। ও যা করবে তাই তো হবে। আমি কি ওর উপর কিছু চাপিয়ে দিতে পারি?

একান্ত যুক্তিসঙ্গত কথা, পরিণত মনের কথা। তবু কথাগুলো বলতে গিয়ে গলাটা আবার কাঁপল জাহেদের। কেন কাঁপল? ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হয়ত তারই উত্তর খুঁজছিল আর কি যেন বলতে যাচ্ছিল মালু। কিন্তু বলা হলনা। সমস্ত বারান্দাটা তোলপাড় করে এল রাবু, এসে তছনছ করল জাহেদের আলনাটা।

কি খুঁজছিস? কেমন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল জাহেদ।

তোয়ালে: কি করেছ আমার তোয়ালে?

তোয়ালে? আমি নিয়েছিলাম নাকি? তেমনি ভয়ে ভয়ে বলল জাহেদ। একশোবার বলেছি নিজের জিনিষ নিজে সামলে রেখ। আমার তোয়ালে আমার সাবানে হাত দেবেনা। তবু যদি আক্কেল হয় একটু। যত্তসব অনাসৃষ্টি অভ্যেস। এর তোয়ালে, ওর লুঙ্গি আর একজনের জামা, হাতের কাছে যা পড়ল, বলা নেই কওয়া নেই একটু জিজ্ঞেস করা নেই, অমনি গায়ে জড়িয়ে নিলেন সাহেব। এমন নোংরা অভ্যাসও মানুষের হয়? ছিঃ! রাবু চেঁচায় আর তছনছ করে ঘরের যত জামাকাপড়। অবশেষে বাথরুমে পাওয়া গেল তোয়ালেটা আর সাবানের কৌটোটাও। জিনসগুলো নিয়ে যেমন তোলপাড় করে এসেছিল তেমনি ঘরটা তোলপাড় করে চলে গেল রাবু।

কি যেন বলতে এসেছিলেন জাহেদের আব্বা সৈয়দ সাহেব। কিন্তু রাবুর ওই ক্রুদ্ধ মূর্তিটার মুখোমুখি হয়ে কোন কথা সরল না তার মুখ দিয়ে। শুধু ঘর আর বারান্দার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে দেখলেন রাবুকে, দেখলেন জাহেদ আর মালুকে। কেন যেন একবার তাকালেন এদিক ওদিক, বুঝি দেখে নিলেন আর কেউ আছে নাকি কাছাকাছি। ইতস্তত: করলেন। একটু সাহস সংগ্রহ করলেন। তারপর বিশেষ কাউকে নয়, ওদের তিনজনকে অথবা গোটা বাড়িটাকেই উদ্দেশ্য করে বললেন, এই প্রথম এল জামাইটা। বুজুরগ পরহেজগার আল্লাপরস্ত্ লোক, তাকে বৈঠকখানাতেই বসিয়ে রাখবে? একবার ভেতরেও আনবেনা?

না করছে কে আব্বা? ঘর থেকে শোনা গেল জাহেদের উত্তর।

এক মুহূর্তও আর দাঁড়ালেননা সৈয়দ সাহেব। দ্রুত উঠে গেলেন দোতলায়। তার নিজের মনের দ্বিধাকে তিনি কেমন করে লুকিয়ে রাখবেন? রাবু বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে বারান্দায়। এক হাতে ওর ছোট একটা স্যুটকেস, আর এক হাতে লম্বা ঝোলা। পেছনে চাকরের মাথায় বেডিং।

কোথায় চললে রাবু আপা?

স্যুটকেসটা ধরতো। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওর হাতে স্যুটকেসটা তুলে দিল রাবু।

বৈটকখানার সবগুলো চোখ স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখল রাবুকে। দেখল ওর হাতের ব্যাগটা, পেছনে মালু তার পেছনে বেডিং মাথায় চাকরটাকে। মোজাদ্দেদী সাহেবও দেখল।

কেউ চোখ ফিরিয়ে নিলনা। মোজাদ্দেদী সাহেবওনা।

কারও দিকে, কোন দিকে তাকাবেনা, সোজা বেরিয়ে যাবে, হয়ত তাই ভেবেছিল রাবু। কিন্তু মোজাদ্দেদী সাহেবের দৃষ্টিকে বুঝি কেউ কখনও পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি। রাবুও পারলনা। ঘরের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াতে হল ওকে। মোজাদ্দেদী সাহেবের চোখজোড়া সাঁড়াশির মত গেঁথে নিয়েছে ওকে।

মালু দেখেছে সাপের চোখ, আপন ক্রুরতায় সদা চঞ্চল, সদা অস্থির। কিন্তু মালু দেখেছে শিকারের মুখোমুখি, ছোবলের পূর্ব মুহূর্তে স্থির, তীরের ফলার মত তীক্ষ্ণ সে চোখ। সে চোখের মত ভয়ংকর কিছু নেই পৃথিবীতে। এ এ ভয়ংকর দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে রাবু বুঝি এগুতে চাইল এক পা।

ঠ্যাঁরো।

রাবুর পাটা যেমন উঠিয়েছিল বুঝি তেমনিই রয়ে গেল।
ঠ্যারো। বাত শুনো। ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ল মোজাদ্দেদী সাহেব। কয়েকটি মুহূর্ত সেই গর্জনের প্রতিধ্বনিটা ঘরের মেঝেতে আছড়ে পড়ে বুঝি ভূমিকম্প সৃষ্টি করে গেল।
কোথায় যাচ্ছেন আপনি? সহসা কণ্ঠটাকে স্বাভাবিক করে সাফ বাংলায় শুধাল মোজাদ্দেদী সাহেব!
পা কাঁপছে রাবুর। হয়তো এখুনি হাটু ভেঙ্গে পড়ে যাবে মাটিতে। হয়ত কিছু বলল ও। কিন্তু শোনা গেলনা কিচ্ছু।
এখানে বেগানা মরদ আছে। আমার খাদেমরা আছে। আপনি মাথায় ঘোমটা দিন। এবার একটা আদেশ দিল মোজাদ্দেদী সাহেব।
পা এখনও কাঁপছে রাবুর। মুখ রক্তহীন। কপালে ঘাম। এখুনি বুঝি সংজ্ঞা হারাবে রাবু। ওর শক্তি ফুরিয়ে এসেছে।
ঘোমটা দিন। আরও উচ্চস্বর হল মোজাদ্দেদী সাহেবের আদেশ।
আশ্চর্য! ঘামজমা কপালের নীচে রাবুর চোখ দুটো সহসা যেন জ্বলে উঠল এক জোড়া আগুন পাওয়া বারুদের মত। জ্বলে উঠে স্থির হল সেই সাপের চোখের উপর!
ওর তিক্ত অতীত আর অজানা ভবিষ্যৎ—বুঝি তারই মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে রাবু। মোজাদ্দেদী সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বুঝি ভয়কে জয় করল রাবু।
রাগে ফুলছে, ক্ষেপছে মোজাদ্দেদী সাহেব। এবার চেঁচিয়ে উঠল মোজাদ্দেদী সাহেব, এখনও খসমের নির্দ্দেশ অমান্য করছেন আপনি? আমি বলছি আপনি মাথায় কাপড় দিন।
না।
না। একটি শব্দ। যেন একটি বজ্রের বিস্ফোরণে কাঁপিয়ে গেল সারা ঘরটা, ঘরের লোকগুলোকে, মোজাদ্দেদী সাহেবকেও।
একমুহূর্তও দেরী করলনা রাবু। প্রায় দৌড়ে নেমে এল রাস্তায়।

উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্তের এলাকা পার্ক সার্কাস। হিন্দুও ছিল, সংখ্যায় তারা কম। কিছু কাটা পড়েছে দাঙ্গায়। বাকীরা উঠে গেছে বালিগঞ্জ অথবা ভবানীপুর। পার্ক সার্কাসে নতুন করে পত্তন হয়েছে মন্নুজান হষ্টেলের। হষ্টেলেই ফিরে এসেছে রাবু।

হষ্টেলের জীবনটা ভাল লাগে আমার। পড়ি। কাজ করি। নিজের মত করে থাকি। আত্মীয়স্বজন কারও তোয়াক্কা রাখিনে।
সাবাস! এই তো যুগের কথা, নতুন যুগের নতুন নারীত্বের কথা। খুশি হয়ে রীতিমত হাততালি দেয় মালু।
চুপ করতো। দিনে দিনে ফাজিল হয়ে উঠছিস তুই। ধমক ছাড়ল রাবু।
রাবু চটেছে। সেদিনও চটেছিল।
মোজাদ্দেদী সাহেবের মুখের উপর অমন একটা 'না' ছুঁড়ে মেরে রাবু যখন নেমে এসেছিল রাস্তায় মালু মনের খুশিটা ধরে রাখতে পারেনি। বলেছিল এর নাম বিপ্লব। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।
কটমটিয়ে তাকিয়েছিল রাবু। তারপর কিছু দূরে দাঁড়ান ফিটন গাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, গাড়িটাকে ডাক। মালগুলো তোল।
মালু দুস্তর কৌতুহল। রাবুর হষ্টেলের সিঁড়িতে মালগুলো নামিয়েই ও ফিরে এসেছিল পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িতে।
পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ির সামনে তখন ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে। সদলে ট্যাক্সিতে উঠবার আগে মোজাদ্দেদী সাহেব ছোটখাট একটা ভীড়ের সৃষ্টি করে ফেলেছেন রাস্তার পাশে। সৈয়দবাড়ির বুড়োবুড়ি, ছেলে মেয়েদের চরিত্র ইমান আর ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করছেন মোজাদ্দেদী সাহেব। রাবু সম্পর্কেও তার আখেরী মতামতটা প্রকাশ করেছেন, এই আউরত কসবী হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে আপন অন্দরমহলের পবিত্রতা নষ্ট করবেননা মোজাদ্দেদী সাহেব।
বাড়ির ভেতর জাহেদকে খুঁজে পায়নি মালু। রাবুর পিছু পিছুই বেরিয়ে গেছিল ও।
অবাক হয়েছিল মালু। রাস্তার লোক উপভোগ করছিল মোজাদ্দেদী সাহেবের জবান। সৈয়দবাড়ির কেউ প্রতিবাদ করছিলনা, দরজায় খিল এঁটে কি এক বিহবল আতংক আর ভয়ে জড়োসড়ো বসেছিল সবাই।
ভীড় ভেঙ্গে মালুই এগিয়ে এসেছিল। মোজাদ্দেদী সাহেবকে ঠেলে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিল।
এরপর ক্যাম্পে রাবুর সাথে দেখা হয়েছিল মালুর। ঘটনাটা বলেনি মালু। আজ বলল।
নিঃশব্দে শুনল রাবু। চুপচাপ পথ চলল। ওরা হাঁটছে ব্রেবোর্ণ কলেজের ক্যাম্পের দিকে।

মাষ্টার সাহেবকে মনে আছে তোর? হঠাৎ শুধাল রাবু। বাহ্, কেন মনে থাকবেনা?

মাষ্টার সাহেব বলতেন, এই তো, এইতো সমাজের চেহারা। এ চেহারাটা পাল্টাতে হবে।

খাঁটি কথা। সায় দেয় মালু।

এখানে সেখানে ব্যক্তিগত প্রতিরোধ তখনই সার্থক যখন সেটা রূপান্তরিত হয় সমষ্টিগত প্রতিবাদে।

মালু পুরোপুরি সায় দিতে পারলনা রাবুর কথায়। বলল, সার্থকতার কথা পরে। কিন্তু ছোট ছোট ব্যক্তিগত প্রতিরোধগুলোই তো সমষ্টিকে অনুপ্রাণিত করে। যেমন ত্যাগ, একের ত্যাগ অন্যকে প্রেরণা যোগায়।

রাবুর উত্তরটা শোনা গেলনা। ওরা পৌঁছে গেছে কলেজের চত্বরে। সেখানে চত্বর আর বারান্দা জুড়ে রীতিমত এক জটলা।

ভীড় এড়িয়ে রাবু উঠে গেল উপরে। জটলার ভেতরেই দাঁড়িয়ে পড়ল মালু।

দেখুন, আমি রায়টের বিরুদ্ধে। মানুষের শুভবুদ্ধি কখনো সায় দিতে পারে না এই অমানুষিক হানাহানির পক্ষে। কিন্তু, শুধু নিন্দে করলেই কি দাঙ্গা থেমে যাবে? থামবেনা। আপনাকে যেতে হবে গভীরে, খুঁজে বের করতে হবে এ দাঙ্গার অন্তর্নিহিত কারণ। দৃঢ় সংযমে ধীরে ধীরে কথাগুলো বলছেন রাকীব সাহেব।

সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত, ভেদবুদ্ধি। এটাই তো এ দাঙ্গার অন্তর্নিহিত কারণ। কিন্তু আমরা তো চোখে ঠুলি এঁটেছি। কিছুই দেখবনা বলে মনস্থির করেছি। হাত নেড়ে নেড়ে জবাব দিচ্ছে অন্য বক্তা। মালু তাকে চেনেনা।

বক্তার কথায় বুঝি অসহিষ্ণুতা, তাই একটু হাসলেন রাকীব সাহেব। বললেন: এইতো মুসকিল তোমাদের নিয়ে। এ্যালজেব্রার ফরমুলায় ফেলে সব সমস্যার সমাধান খোঁজ তোমরা। এই যে মুসলমান জাতটা, খাস বাংলা দেশে, প্রায় দু'শটি বছর ধরে এত অবিচার এত অসম্মান কুড়িয়ে আসছে তার সমস্ত দোষ কি ইংরেজের ঘাড়ে চাপিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে তোমরা? স্বীকার করি পরাধীনতার যত কুফল সবই আমাদেরই রোয়াঁয় রোয়াঁয়, কিন্তু আসন্ন স্বাধীনতার সনদে আমাদের নিরাপত্তা, আমাদের নিজস্ব বিকাশের গ্যারেন্টি যদি না পাই···

এক্সাক্টলী। পার্কসার্কাসটাকে বালীগঞ্জ বানাও, বেশী বেশী মুসলমানকে ডেপুটি বানাও, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বড় বড় চেয়ারে কিছু মুসলমান বসাও, আপনার

মতে তা হলেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমিও হয়ত ওখানে একমত আপনার সাথে কেননা আপনার আমার মত মধ্যবিত্তের সমস্যাটা একান্ত চাকুরীর সমস্যা। কিন্তু রহিমুদ্দী, সলিমুদ্দী, অগুনতি খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের কি হবে। হিন্দু বা ইংরেজকে হটিয়ে আমি কলিমুল্লা আপনি সলিমুল্লা ম্যাজিষ্ট্রেট হলে ডাণ্ডাটা কি ওদের মাথায় একটু আস্তে মারব? আপনার ভাই আলিমুল্লা যদি কেশোরাম জুট মিলের পাশে আর একটি রহিম জুটমিল বসায় সে কি শ্রমিকগুলোকে কম শোষণ করবে?

দমবার পাত্র নন রাকীব সাহেব। নির্বিচলভাবে আগের কথাটাই শেষ করলেন তিনি। আমরা মুসলমান। নিজেদের ধর্ম, নিজেদের আচার রীতি, নিজেদের মানস দিয়ে গড়ে তুলতে চাই নিজেদের জীবনটা। দেশের সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায় যতদিন আমাদের এই জন্মগত অধিকারে স্বীকৃতি না দেবে ততদিন এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা চলতেই থাকবে। এটা কি বুঝছনা তুমি?

অপর বক্তার উত্তরটা যেন তৈরীই ছিল। রাকীব সাহেব থামতে না থামতেই বেরিয়ে এল উত্তরটা: আমরা মাথা ফাটাফাটি করে মরি। ও দিকে মজাসে রাজত্ব করুক ইংরেজ, এই তো?

তা নিজেদের ঘর যদি সামলে না উঠতে পারি রাজত্ব ওরা করবেই তো? নিজেদের সমস্যা আর বিরোধগুলো যদি আমরা নিজেরা নিষ্পত্তি করতে না পারি তবে বলব আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইনি এখনো।

কিন্তু সমস্যার গোড়ায় তো ইংরেজের অনুচরগুলোই ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে, রাকীব ভাই। আর আমরা হিন্দু, মুসলমান, খেলছি তাদের হাতে। আমরা শত্রুকে ভুলে গেছি, ছুরি মারছি ভাইয়ের বুকে। এতো মহা পাপ, রাকীব ভাই। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে এর চেয়ে জঘন্যতম কোন অপরাধ হতে পারেকি? কী জবাব দেব আমরা ভাবী বংশধরদের?

আবেগ উন্মথিত কণ্ঠ ছেলেটির। ক্ষণকাল নিঃশব্দ চমকে ওকে দেখলেন রাকীব সাহেব, কী যেন বলতে গেলেন। কিন্তু অসংখ্য কাকলী গুঞ্জনে চাপা পড়ে যায় তার কথাগুলো।

প্রজাপতির ঝাঁকের মতো এক দঙ্গল মেয়ে এসে ঘিরে ধরেছে রাকীব সাহেবকে।

ভীষণ ফাঁকি দিচ্ছেন, রাকীব ভাই! একদিনও এলেন না রিহার্সালে। গানগুলোর কি হবে বলুন তো?

রাকীব ভাই, আপনি কি ডোবাবেন আমাদের ?

আজ কিন্তু ছাড়ছিনা আপনাকে।

ওদের সব অভিযোগের জবাবে সরল চোখের মিষ্টি দৃষ্টি দিয়ে হাসেন রাকীব সাহেব। ওই স্মিত হাসিটাই বুঝি ওদের নিরস্ত্র করতে যথেষ্ট।

মেয়েদের ছেড়ে সেই তার্কিক ছেলেটির দিকেই আবার তাকালেন রাকীব সাহেব। উৎফুল্ল কণ্ঠটাকে বেশ উঁচু মাত্রায় তুলে বললেন ; দেখ হে, দেখ। দেখে শেখ। মুসলমান মেয়েরা নাটক করছে। ঘরের কোনে জেনানা দর্শকের জন্যে নয়, একেকবারে খোলা ময়দানে তোমার আমার সকলের জন্য। সেই যে কোন্ পত্রিকায় না লিখেছে 'ক্ষুদে পাকিস্তান জিন্দাবাদ', তার অর্থটা এবার হৃদয়ঙ্গম করতে পারছ তো ? নতুন শক্তির 'বাঁধন' ছিঁড়েছে, তাকে রুখবার শক্তি মোল্লাদেরও নেই, তোমাদেরও নেই। বুঝে নাও কথাটা।

কথাটা শেষ করেই এমন এক কাণ্ড করে বসলেন রাকীব সাহেব যার জন্য প্রস্তুত ছিলনা মালু। ভীড়ের এক কোনে একরকম লুকিয়েই ছিল মালু। তবু বুঝি এড়াতে পারেনি রাকীব সাহেবের দৃষ্টি।

ওহে দূরে দূরে কেন, এদিকে এস। ডাকলেন, রাকীব সাহেব। তারপর মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন : গায়ক আব্দুল মালেক। খাঁটি, যাকে বলে একেবারে কাঁচ্চা সোনা, মানে পিউর গোল্ড। শোননিতো ওর গান ? শুনলে আর আমার কাছে আসবেনা। রিহার্সালটা ও-ই চালিয়ে নেবে। হেরফের হবেনা, একদম পাকা ব্যবস্থা।

আদাব দিল মেয়েরা।

প্রতি অভিবাদনে হাতটা তুলতে গিয়ে ও বুঝি উঠাতে পারলনা মালু। বিচিত্রবর্ণা প্রজাপতির মতো এতগুলো অপরিচিতা মেয়ের উৎসুক সন্ধানী চোখের সমুখে হাত পা বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে আসে মালুর।

ওরা একটা থিয়েটার আর একটা বিচিত্রা করছে দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্যার্থে। বুঝতেই পারছ, সৎ কাজ—উদ্দেশ্য মহৎ। গানগুলো তুমি একটু দেখে দিও। নিজেও গাইবে বইকি ? ফরজ কাজ কিন্তু, করতেই হবে। বুঝলে তো ? মালুর কাঁধে হাত রেখে বললেন রাকীব সাহেব।

সায় না দিয়ে উপায় কি মালুর !

রাকীব সাহেবকে ছেড়ে এবার বুঝি মালুকেই ছেঁকে ধরে মেয়েরা।·· ···বি সার্কাস রেঞ্জ। রোজ তিনটের সময় রিহার্সাল শুরু হয় আমাদের। ঠিক

সময় আসবেন কিন্তু। ···ও···, চেনেননা? বেশ, চলুন সঙ্গে, চিনে আসবেন।
ওরা কথার খই ফুটিয়ে চলে। মুখ মালু ঘামিয়ে একসার।
উহুঁ, এখুনি ওকে নিয়ে টানাটানি করনা। আমার সাথে জরুরী কাজ ওর।
বললেন রাকীব সাহেব। বেরিয়ে এলেন মেয়েদের ব্যূহ ভেঙে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মালু। রঙিন ডানা উড়িয়ে প্রজাপতির ঝাঁকের মতোই বুঝি উড়ে বেরিয়ে গেল মেয়ের দলটা।
রাকীব ভাই, চিরদিনই আপনি ফাঁকিবাজ। দিব্যি সটকে পড়লেন। যেতে যেতে একেবারে শেষ লাইনের মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে বলল।
সে কথার ধারেও ঘেঁষলেননা রাকীব সাহেব। চোখ নাচিয়ে ছুঁড়ে দিলেন একটা টিপ্পনি: ভুল করেছিসরে হাসিনা। এমন সকালে ছাই রংটা একটুও মানায় না। ওটা অপরাহ্ন বেলার বৈরাগ্য রং।
হাসিনা বুঝি হটবার পাত্রী নয়। চিবুক বেঁকিয়ে গ্রীবা দুলিয়ে জবাব দিল ও! পছন্দ হল না তো? বেশ, কাল থেকে কিন্তু খাঁটি গেরুয়া ধরছি আমি।
মুখ ফিরিয়ে নিলেন রাকীব সাহেব।
মেয়ের দঙ্গলটা দূর থেকেই পাঠিয়ে দিল একটি হাসির হররা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের ওপারে, রাস্তায়।
এই শোন্। একটি মেয়ে-ভলান্টিয়ার যাচ্ছিল সুমুখ দিয়ে। ওকে ডাকলেন রাকীব সাহেব।
বলুন। কাছে এসে দাঁড়ায় মেয়েটি।
রিলিফ করতে এসেছিস, না প্রেম করতে এসেছিস?
এমন বেয়াড়া প্রশ্নের জন্য বুঝি প্রস্তুত ছিলনা মেয়েটি। লজ্জায় লাল হয়ে যায় ওর শ্যামলাপনা মুখ।
মেয়েটির খোঁপায় একজোড়া সাদা টগর। আচমকা হাত বাড়িয়ে ফুল দুটো তুলে নিলেন রাকীব সাহেব, বললেন, যা। ভাগ।
ত্রস্তে পালিয়ে বাঁচল মেয়েটা।
হো হো করে হেসে বাতাস ফাটালেন রাকীব সাহেব। মালুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, আমার এক প্রিয় ছাত্রী।
নির্দোষ হাসি। হাল্কা কৌতুক। কিন্তু সে কৌতুকে যোগ দিতে পারেনা মালু। কোথায় যেন বাধে ওর। অথচ, কেমন সহজ অন্তরঙ্গতায় সকালের এক ঝলক উজ্জ্বল রোদের মতো ওই প্রজাপতির ঝাঁকে আপনাকে ছড়িয়ে

দিলেন রাকীব সাহেব। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই, সংকোচ নেই। আনন্দ বিতরণ আর গ্রহণের এ বুঝি এক দুর্লভ গুণ। সে গুণ নেই মালুর।

জীবনে এই প্রথম কোন কিছু 'নেই' বলে দুঃখ হল মালুর। আর যার 'আছে' সেই সৌভাগ্যবানের প্রতি কি এক ঈর্ষার আঁচে দগ্ধ হল।

এ যেন এই মহানগরীরই এক নতুন আর অভাবনীয় দিক। এখানেই এই ঈর্ষার জন্ম। কেমন কুৎসিত স্থূল আর অসহ্য তার জ্বালা। হৃদপিণ্ডের কোন অচিন গহ্বর থেকে উঠে এল সেই ঈর্ষাবোধ, ঘেন্না ছড়িয়ে দিল ওর সর্বাঙ্গে। ক্ষুদ্রতাবোধ, ঘিনঘিনে এক অস্বস্তি আর লজ্জা। মালুর মনে হল এই মহাগরীর মেলায় ও শুধু অপাংক্তেয় নয়, অশোভন।

আচ্ছা লক্ষীছাড়া ছেলে তো তুই ? গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে সেই যে উধাও হলি, আর দেখা নেই।

বারে, কোথায় উঠেছেন সেটা জানলে তো দেখা হবে ?

রাস্তায় নেমে ফুট পাথ ধরে হেঁটে চলে ওরা।

কি কাজ ছিল বলছিলেন ? শুধাল মালু।

বাসায় তো চল। তারপর ধীরে সুস্থে শুনবি। বললেন রাকীব সাহেব।

ধীরে সুস্থে শোনার আরামটা তো আপনিই কেড়ে নিলেন। তিনটের সময় যেতে হবে ওই মেয়েদের দঙ্গলে। ময়লা পোশাকে যাওয়া যায় ?

সত্যিই তো। তা হলে কি করা যায় ? সহানুভূতির ভান করে গম্ভীর হয়ে যান রাকীব সাহেব।

পার্ক ষ্ট্রীট যাব। সেখান থেকে মেজো ভাইয়ের একজোড়া পোশাক নিয়ে নেব। এছাড়া আর উপায় কি ?

মালুর দুশ্চিন্তা দেখে হাসি বুঝি চেপে রাখতে পারেননা রাকীব সাহেব।

তা হলে আমি যাই। পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে ডানমুখো হল মালু।

খবরটা তা হলে শুনবেনা ?

আপনি বলছেন না যে।

আহা ভাল খবর এত তাড়াতাড়ি বলে ফেললে মজা থাকে না কি ? কি যেন রহস্য রাকীব সাহেবের কথায়।

ভাল খবর ? বুঝি ধাঁধাঁয় পড়ল মালু।

তোমার রেডিও কণ্ট্রাক্ট তিনদিন ধরে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা খোলা খাম মালুর হাতে তুলে দিলেন রাকীব সাহেব।

সত্যি ? হাতের আঙুলগুলো বুঝি কাঁপছে মালুর।

শুধু হাত নয় বুকের ভেতরটাও কাঁপছে মালুর।

দুরু দুরু বুকে কম্পিত হাতে খামের ভেতরের কাগজটা বের করে আনল মালু।

মেলে ধরল চোখের সুমুখে।

মালুর মনে হল এতদিনের সমস্ত যন্ত্রণা সমস্ত লাঞ্ছনা সার্থক। আজ খুলে মধুময় আনন্দিত জীবনের দুয়ার।

রহস্য বৈচিত্র্যে অনুপম, আশ্চর্য সুন্দর এই পৃথিবী। অদ্ভুত এই পৃথিবীর মায়া। সেই যে দৈত্য বিধ্বস্ত মৃতের নগরী কলকাতা সেও বুঝি মৃতের কাফন খুলে বেরিয়ে এসেছে জীবনের রাজ্যে। জীবনের রক্ত চলাচল তার ধমনীতে। আবার ট্রাম নেমেছে রাস্তায়। গাড়ি ঘোড়া, যন্ত্র আর মানুষের বিচিত্র ঐকতানে আবার মুখর মহানগরী।

সেই যে উন্মাদ খুন খারাবি সে ছিল যেন হঠাৎ জ্বরের ঘোরে দুর্বোধ্য বিকার। কেটে যাচ্ছে সে বিকারের ঘোর। ছুরির ডগায় শানিয়ে ওঠা যে ভাষা, তার বদলে সহজ প্রেম আর প্রীতির ভাষাটা যেন ফিরে পাচ্ছে মানুষ। নিজের ভাষায় আবার কথা বলতে শুরু করেছে মহানগরীর নাগরিক। এই বুঝি মহানগরীর ঢঙ। ক্ষণে ক্ষণে তার নতুন রূপ, অভাবনীয় প্রকাশ। অবাক মানে বাকুলিয়ার সেই খোকা বয়াতি আব্দুল মালেক। এতদিন আজব আর অপরিচিত মনে হয়েছিল এই শহরটাকে। অবগুন্ঠিত ছিল তার মোহিনী রূপ। অনুদ্ঘাটিত ছিল তার বিপুল ঐশ্বর্য। তাই তো সেই নরক রাতের পর থেকে মালু কেবলই অভিসম্পাত দিয়ে চলেছিল এই মহানগরীর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আজ?

বিশাল এই নগরীর স্পন্দন ওর আপন সত্তার গভীরে।

মার্ভেলাস। ইউনিক। শৈলেন বাবুই আনন্দে উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠেন। বার বার পিঠ চাপড়ে দেন মালুর।

পর পর প্রোগ্রাম পেল মালু।

অজেয় গ্যাষ্টিন প্লেস খোদ আমাদেদের দ্বার খুলে দিয়েছে ওর জন্য। ওর সাধনার মুখে খড় কুটোর মতো উড়ে গেছে সব বাধা।

মালুর মনে হয়, এতদিনে বুঝি সার্থক ওর নগর-অভিযান। গানের সুরে দূর বাকুলিয়ার সেই সীমাহীন দিগন্তকে মালু টেনে এনেছে এই মহানগরীর ক্ষুদ্র আকাশে। একটি নতুন উপহার পেয়ে যেন কৃতজ্ঞ মহানগরী। বুঝি

প্রতিদানে এই মহানগরী বিপুল তার সম্পদ ভাণ্ডার উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে তরুণ শিল্পীর পায়ে।

এও বুঝি মহানগরীর কোন মহাকৌতুক। অজ্ঞাতকে, অক্ষমকে, শক্তিমানকে সবাইকেই সে টেনে নেবে, কিন্তু গ্রহণ করবেনা কাউকে। যার আছে সাধনার ধৈর্য, শক্তির দুঃসাহস, তাকেও অনেক কষ্ট করেই যেন পথ কেটে নিতে হয়। রুদ্ধ কপাট ভেঙ্গে অন্তপুরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিতে হয়।

মালু যেন অল্প আয়াসেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেল সেই অন্তপুরে। সেখানে মহানগরীর আপন সুর, বিচিত্র ঐকতান। সেই মহাতানে লীন মালুর অস্তিত্ব।

শহরটাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে মালু। চমকে উঠবারই কথা। সেই মালু, বাকুলিয়ার মিঞা—সৈয়দরা দেশ ছেড়েছে বলে বিদ্রূপের গান বেঁধেছিল, সে-ই কিনা এই শহরের মায়ায় আটকা পড়ে গেল?

সব কিছুই সুন্দর। সব কিছুই অপরূপ। ওই এ্যাসফাল্টের রাস্তা, ট্রামের ঘর্ঘর শব্দ, বাসের কিউ, মাথার উপরে মাকড়সার সুতোর মত ছড়ান অজস্র বিজলী তার। টেলিফোনের থাম্বার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কাকটাও কৃষ্ণশ্রীতে আজ রূপবান।

যুদ্ধ থেমে গেছে তবু বাফেলওয়ালগুলো ভাঙ্গা হয়নি। বিজলী বাতির চোখে যে কাল ঠুলী পরান হয়েছিল সেগুলো নামান হয়নি। পার্ক সার্কাস ময়দান বা অন্য কোন পার্কেই হাঁটার উপায় নেই। ট্রেঞ্চে ভর্তি। সেই ট্রেঞ্চগুলো এখনও ভরাট হয়নি। রোজই মেজাজ খারাপ করত মালু, নগরকর্তৃপক্ষ আর ইংরেজের বাচ্চা লাল বাঁদরগুলোর বিরুদ্ধে জিবে শান লাগাত।

কিন্তু বাফেলওয়াল, বাতির মুখের কাল বোরখা, পার্ক সার্কাস মাঠের ট্রেঞ্চ, কোনটাই আর বিসদৃশ মনে হয়না মালুর। মনে হয় এই তো স্বাভাবিক, এই তো কলকাতা, এবড়ো থেবড়ো নানা অমিল আর গরমিলের মহাতান, মহানগরী। আর তার চেয়েও সুন্দর এর মানুষগুলো, উদার আকর্ষণীয়। আর মালু বুঝি এই নগরীর সবারই প্রিয়। রিহার্সালের মেয়েগুলো বিমুগ্ধ চোখে শ্রদ্ধা ঝরায়, দেখা হলে আদাব দিয়ে বাড়িতে দাওয়াত জানায়। গানের মাষ্টার হিসেবে বহাল করে।

ছাত্ররা আসে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ নিয়ে।

বুকে জড়িয়ে ধরে জাহেদ। বলে, সাধনার ধন মিছে যায়না কখনো। শুধু

সাবধানী দেয় বাবু। বলে, মাথাটা ঠিক রাখিস। তারপরে বধে ক্রাউনে নিয়ে ব্রেইন কাটলেট খাওয়ায়।

কুয়াশা ঢাকা ভোর। দূরের ট্রামটাকে দেখে মনে হয় বুঝি এক চাক কুয়াশাই ছুটে আসছে। ভিজে রাস্তা। পিছল ফুটপাথ।

এ্যাসপ্ল্যানেডের মোড়টা পেরিয়ে আচমকা পেছন থেকে একটা ধাক্কা খেল মালু। কে জেন হুড়মুড়ি খেয়ে পড়েছে ওর ঘাড়ে।

আরে অশোকদা ?

সেই যে বৌ বাজারের মেস থেকে বেরিয়ে এসেছিল মালু আর দেখা হয়নি অশোকের সাথে। আর এখন, এখানেই তো দেখা হওয়া স্বাভাবিক। যায়গাটা হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়। যায়গাটা বিদেশী শাসকদের বিপনী কেন্দ্র। তাই সবাই আসে এখানে, নির্ভয়ে।

কেমন আছেন, অশোকদা ? খুসি ছড়িয়ে শুধাল মালু।

রাণু মারা গেছে। বিনা ভূমিকায় মালুকে এতটুকু প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়েই বলে ফেলল অশোক।

মৃত্যুই বোধহয় টেনে এনেছিল ওকে। এখানে বেড়াতে এসেছিল ভাসুর বাড়ি। এখান থেকে যাবে তালতলি। আজ যাই কাল যাই করে যাওয়া হচ্ছিলনা।

তারপর ? রুদ্ধশ্বাস মালু।

ওর ভাসুরের বাসাটা ছিল বেনে পুকুরে। সেই রাতেই আক্রান্ত হয় ওরা। কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল রাতটা। সকাল পর্যন্ত পারল না ঠেকাতে। সবাই মারা পড়ল। বেঁচে গেল শুধু রাণুর ছোট বাচ্চাটা। লেপ তোষকের গাদির ভেতর পড়েছিল। লক্ষ্য করেনি কেউ।

মনে পড়ল মালুর। যে সময়টিতে বাবুর শূন্য হস্টেলটার সুমুখে দাঁড়িয়ে নৃশংস কোন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় চেতনা হারিয়েছিল মালু, ঠিক সেই সময়টিতে নগরীর আর এক প্রান্তে আর একটি মৃত্যু অনেক কিছু ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এ পৃথিবী থেকে।

কারো মৃত্যু যে অনেক অর্থই কেড়ে নেয় জীবনের, আলোভরা পৃথিবীটাকে ঢেকে দেয় নিকষ আঁধারে, বুঝি এই প্রথম উপলব্ধি করল মালু।

তারপর ? তারপর কি, অশোকদা ? চেঁচিয়ে শুধায় মালু। আশে পাশের সচকিত লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বুঝি হুঁশ হল ওর।

কেন যেন মনে হল মালুর, মৃত্যুর পরও বেঁচে রয়েছে রাণুদি। আর সেই রাণুদির অনেক খবরই নেবার রয়েছে, অনেক কিছুই জানার রয়েছে।

অশোকদা শুনুন!

অশোক ততক্ষণে চলন্ত একটা ট্রামে লাফিয়ে উঠেছে। সেখান থেকেই মুখ ঘুরিয়ে বলছে: আমার বড় তাড়া। এই শহরে অসহ্য যন্ত্রণা। আজই রওনা দিচ্ছি দ্বারকার পথে। শিগ্‌গীরই ফিরে আসছি। দেখা করিস মেসে।

ফড়িংয়ের মতো তেমনি এখানে সেখানে লাফিয়ে ঝাঁপিয়েই বুঝি দিন কাটছে অশোকের। বেন্টিং ষ্ট্রীটের মোড় কেটে দ্রুত অপস্রিয়মান ট্রামখানার দিকে কি এক বেদনার দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে মালু।

এ্যাসপ্লেনেডের চৌমাথা পেরিয়ে আবার ধর্মতলার রাস্তাটা ধরল মালু; আস্তে আস্তে হেঁটে চলল।

মাত্র কয়েকদিন আগে যে সার্থকতার আনন্দে উপচে উঠেছিল ওর মনটা, মহানগরীর বিচিত্র ছন্দতানে নিবিড় আত্মীয়তার অনুভূতিতে আপনাকে বিরাট আর সম্পদময় মনে হয়েছিল ওর—সবই যেন উবে গেল এক লহমায়।

রাস্তায় লোক চলছে পাতলা পাতলা। কলকাতার বিশাল জনস্রোত, কাঁধে ঘেসাঘেসি করে, গায়ে গায়ে হুড় মুড়ি ঘেয়ে চলা, সেই জনস্রোত যেন অতীতের কোন কিস্‌সা কাহিনী।

সজাগ ইন্দ্রিয়, সতর্ক পা, কেমন ছাড়া ছাড়া ভাবে চলছে আজকের নাগরিক। ওদের মুখে মহানগরীর আতঙ্ক, ওদের চোখে কি এক সন্দেহ, কি এক অবিশ্বাস। ওরা যেন আপন দেশের আপন মাটিতে হাঁটছে না। প্রাণটাকে হাতে নিয়ে ওরা যেন হাঁটছে কোন্ শত্রুপুরীর অনাত্মীয় পথে। তাই এত ভীত শঙ্কিত পদক্ষেপ ওদের।

গাটা যেন কাঁটা দিয়ে গেল মালুর।

মহানগরীর নাগরিক; ফিরে পেয়েছে তার আপন ভাষা। আপন ভাষায় আবার কথা বলছে সে। তাই তো ভাবছিল মালু। এত বড় মিথ্যাটাকে কেমন করে সত্য বলে ভেবেছিল মালু?

আপন আনন্দের সুরমাখা চোখে বুঝি ভুলই দেখেছিল ও। এমনিই বুঝি হয়। বাইরের পৃথিবীতে আমরা শুধু আপন মনের প্রতিবিম্বটাই দেখি, দেখতে চাই। তাই সঠিক দেখাটা কদাচিৎ সম্ভব হয় জীবনে।

মহানগরীর ক্ষত এখনো শুকায়নি।, কলঙ্কের চিহ্নগুলো এখনো অদৃশ্য হয়নি।

দুষ্ট ব্যাধির বিষাক্ত জীবাণুরা এখনো কিলবিল করে বেড়ায়, প্রকাশ্যে নয়, নগর দেহের গোপন অন্ত্রে, গিঁটে গিঁটে।
কোন্ বন্যায় ভেসে যাবে এত ব্যাধির বীজাণু ?
অকস্মাৎ সেই যুদ্ধকালের বিষাক্ত তালতলির কথাটা মনে পড়ল মালুর। রিক্ততার হাহাকার ভরা দখিন ক্ষেত, বিরানা গ্রাম আর তালতলির তাল সারির মাথায় সেই শকুনগুলো।
সেই শকুনীর দলটা এখনো বুঝি বিষাক্ত লালা ঝরিয়ে চলেছে। উড়ে উড়ে সর্বত্র ছিঁটিয়ে দিচ্ছে সে বিষ-লালা। সে বিষ পান করে মানুষ হারিয়েছে তার সত্তা, আত্মাকে করেছে কলুষিত, মনকে করেছে পঙ্গু।
দ্রুত পা চালায় মালু। এই মৃত্যুর বেড়াজাল থেকে বুঝি পালিয়ে বাঁচতে চায় ও।

স্যার।
সেই কখন থেকে বেয়ারা করিম দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। কে যেন মালুর সাথে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করে আসছে অনেকক্ষণ।
মুখ তোলেনা মালু। কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে চলেছে ও।
পাঁচ মিনিট পরে। কথাটা বলেই আবার কাগজের তাড়ায় ডুব দেয় মালু। সই চালায় খস খস।
চিঠিও জমেছে অনেক। ভক্তের চিঠি। সমালোচকের পত্রবাণ। গভীর মনোযোগের সাথে চিঠিগুলো পড়ে মালু। উত্তর দেয় সব চিঠিরই ; নিষ্ঠার সাথে সময় নিয়ে, সুন্দর করে।
এটা ওর গানেরই অংশ। তাই গানের মতোই একাগ্রতা ঢেলে উত্তরগুলো লেখে মালু। ডাকে ফেলবার আগে পড়ে দেখে আর একবার।
উদ্বেল ভক্তি। জানবার বুঝবার সে কী সীমাহীন আকুতি। গভীর জিজ্ঞাসা। নিবিড় মমতা। চিঠিগুলো পড়ে আর অভিভূত হয় মালু।
দূর দূরান্তে ছড়ান কত শ্রোতা মালুর। এই চিঠিগুলো যেন ওদের আত্মার পরিচয়। ওদের প্রশ্ন, ওদের কৌতূহল, ওদের প্রশংসা-সবই যেন শিল্পীর প্রতি উষ্ণ এক প্রীতির ঘোষণা। সে প্রীতির স্পর্শে বল পায়, শক্তি পায় মালু। তাই উত্তর দেয়ার পরও চিঠিগুলো জমিয়ে রাখে মালু। আপিসে আর বাড়িতে পুরনো চিঠির ছোট খাট টিলে বানিয়ে তুলেছে ও।

স্যার, বাক্সে কাগজ মেলা জমেছে, ফেলে দেব? করিম মিঞা কত দিন অনুমতি চেয়েছে।

না না। ও সবে হাত দিও না তুমি। চেঁচিয়ে উঠেছে মালু। বুঝি সাত রাজার ধন। যক্ষের মতো আগলে থাকে মালু।

"...মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই তোমার গান শুনে। কখনো হারিয়ে যাই সুরের বন্যায়। কখনো চমকে উঠি। প্রশ্ন করি নিজেকে : এত সম্পদ এত ঐশ্বর্য আমার। এই ঐশ্বর্যকে চিনে নিতে এত দেরী লাগল কেন? ধিক্কার দেই নিজেকে...

আমার সেই ঐশ্বর্যকে চিনিয়ে দিলে তুমি। আমার অনাবিষ্কৃত ভাণ্ডার আমারই সুমুখে তুলে ধরলে তুমি। আমার গৌরব ফিরিয়ে দিলে আমাকে। তাই তো তুমি শিল্পী। তুমি সার্থক; প্রণাম তোমাকে। ইতি..."

রি...।

পড়াটা শেষ করে খামটা উল্টে পাল্টে দেখল মালু। একই খাম, হলদেটে রং দামী বিলেতী কাগজের খাম। একই হস্তাক্ষর, সেই একই জেনারেল পোষ্ট অফিসের কালি জড়ান অস্পষ্ট ছাপ। ভাল লাগে মালুর। কি এক রোমাঞ্চিত ছোঁয়ায় সাড়া জাগে প্রাণে। কিন্তু আজ অবধি এই অচেনা 'রি'-র একটি চিঠিরও উত্তর দিতে পারল না মালু।

স্যার, আরো দুজন সায়েব এসেছে দেখা করতে। মালুর অন্যমনস্কতার সুযোগে বুঝি একটু সাহস সঞ্চয় করে নিল করিম।

বসতে বল। আগের সায়েবটাকে নিয়ে এস। চিঠি পত্রের ফাইলটা সরিয়ে রাখে মালু। নোট বইয়ের ফাঁক থেকে মুখ বের করে আছে দু তা কাগজ। চোখ পড়ায় মালু টেনে নিল কাগজের তা। বিরক্ত রেখার কুঞ্চন জাগে ওর জোড়া ভ্রুর সংগম কেন্দ্রে।

ইস, নজরুল জয়ন্তীর গানগুলোর রিহর্সাল এখনো শুরু হয়নি। বিড় বিড় উচ্চারণ করে মালু। আবার নোট বইয়ের ভেতর চাপা দিয়ে রাখে কাগজগুলো। কি এক অসন্তোষে ছুঁড়ে দেয় নোট বইটা। বন্ধ ফাইলের উপর একটু কাত হয়ে পড়ে থাকে নোট বই।

করিম মিঞা। তোমাকে আবার বলছি। লোকজন এলে ফওয়ান বিদায় করে দেবে। দেখছনা, কত কাজ জমেছে! ছড়ান দু'টো হাত উল্টিয়ে সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর ঘুরিয়ে আনল মালু। ফেলে রাখা কাজের

বিপুল পরিমাণটা যেন স্পষ্ট করেই দেখিয়ে দিল করিম মিঞাকে। করিম সবে এসেছে ওঘর থেকে। পুরো কথাটা বোধ হয় কানে যায় নি। ওর। তবু অভ্যাস মতোই বলল, জী স্যার।
আবার জী স্যার? না করেছিনা স্যার বলতে? খেঁকিয়ে ওঠে মালু।
জী। মুখ নামিয়ে নেয় করিম।
আর একটা শক্ত কিছু বলতে যাচ্ছিল মালু। সামলে নেয়। করিমের পেছনেই আগন্তুক ভদ্রলোক।
বসুন।
দেখুন, নেহাৎ অপারগ হয়েই আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। আপনি যদি একটু দয়া···
ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে লম্বা ভনিতা, সে ভাবেই বুঝি প্রস্তুত হয়ে এসেছিল ভদ্রলোক। কিন্তু শুরুতেই বাধ সাধল মালু!
কি বলবার সে কথাটাই বলে ফেলুননা। ভূমিকার কোন প্রয়োজন আছে?
তেলতেলে চেহারা কেতা দুরস্ত ছেলেটি। মালুর অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় হকচকিয়ে যায়, গুলিয়ে যায় তৈরী করা কথাগুলো। কেমন আমতা আমতা করে বলে: হ্যাঁ, দেখুন, আপনি যদি কিছু মনে না করেন···মানে, আপনার কি সময় হবে?
না। শুধু রুক্ষ নয়, বড় অভদ্র মালুর জবাবটা। অপমান বোধে রাঙিয়ে উঠে মুখ নীচু করে ছেলেটা।
বুঝি কৃপাবোধে নরম হয়ে আসে মালু। আর একটু হলে সশব্দে হেসেই দিচ্ছিল। হয়ত বড় লোকের সুখে পালা অপদার্থ ছেলে। অথবা: অক্ষর-বর্জিত ছোকরা, সহসা পয়সা বানিয়ে ফেলেছে। মনে মনে ভাবল মালু।
এবার বলে ফেলুন আপনার কথাটা। আমার মেলা তাড়া। মুচকি হেসে অভয় দিল মালু।
ভড় ভড় করে বলে গেল ছেলেটি: দেখুন! আমার একটি ছোট বোন, খালাত বোন। কলেজে পড়ছিল। পড়া ভাল লাগেনা। এখন বাড়িতেই বসে আছে।···এবং বাড়িতে বসে সকালে চা পান করে। দুপুরে ভাত খায়, রাতে খায় পরোটা। তারপর ঘুমুতে যায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে···বলুন, বলুন বলে চলুন। ছেলেটির কণ্ঠস্বর নকল করে ভেংচিয়ে চলে মালু। অর্থহীন ভনিতায় এবার সত্যিই চটেছে মালু।
প্লিজ, মেহেরবানী করে শুনুন আমার কথাটা। বোনটির আমার ভারি সখ,

গান শেখে। বেশি না, হপ্তায় দুটো করে বৈঠক নেবেন, মাসে হবে আট কি নয়টি বৈঠক, প্রতি বৈঠকে দশ টাকা করে আশী বা নব্বই। তা আপনাকে শতটা পুরিয়েই দেব। বলুন, আপনি রাজি?

না।

কিন্তু, আপনাকে ছাড়া যে আর কারু কাছে গান শিখবেনা আমার বোন।

দুঃখিত। আপনার বোনের সখের গান শেখানোর মতো ফুরসুত হাতে নেই আমার।

দেখুন, একশোয় না হয়, দেড় শো? যা চাইবেন আপনি। তবু দোহাই আপনার…

সাহেবের বুঝি খুব পয়সা আছে?

এমন একটা বেমক্কা আক্রমণে চুপসে যায় ছেলেটা। ফ্যাকাশে মুখে কথা জোটেনা ওর।

ইশারা পেয়ে ততক্ষণে অপর দর্শনার্থীদের নিয়ে করিম ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতর। ওদের দিকে মন দেয় মালু।

দেড় শো থেকে দু শো তেও উঠতে পারে ছেলেটা, এই ফাঁকে সে কথাটা জানিয়ে দেয়। সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে যায় ক্ষুন্ন মুখে।

দু'ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে আবার কাজে মন দিল মালু।

অনেক কাজ ওর। অনেক দায়িত্ব। নাজিমুদ্দীন রোডের সেই হলদে বাড়িটা। সেদিন সেটাই ছিল ঢাকার বেতার ভবন। এবাড়ির একটি নির্দিষ্ট কক্ষকে কেন্দ্র করে মালুর নতুন জীবন। কর্ম-ঠাসা সদা-উদ্বিগ্ন ব্যস্ত জীবন। সাফল্য নাকি নিয়ে আসে দায়িত্বের বোঝা। সে দায়িত্বের ভার বইতে হয় সাফল্যের নতুন নতুন পরীক্ষার সিঁড়ি ডিঙিয়ে। তাই নাকি নিয়ম। সে নিয়মেই কদাচিৎ একটু ফুরসুত মেলে মালুর।

গান শেষ হল তো শুরু হল রিহার্সাল। আর সে রিহার্সালের মা-বাপ আগা-মাথা কোন কিছুরই ঠিক নেই। অমুক এল তো তমুক এলনা। অমুককে আনতে ছোট। ততক্ষণ হাতপো গুটিয়ে বসে থাক।

সব চেয়ে মুশকিল মেয়েগুলোর অভিভাবকদের নিয়ে। দেশটা আজাদ হলেও সমাজ বা পারিবারিক জীবনে আজাদীটা মকসো করতে সায় দেয়না তাঁদের রক্ষনশীল মন। রেডিও-থিয়েটার সিনেমা, সবই তাদের চোখে সমান, ইতরামি আর নোংরামির আখড়া। অতএব সে সব যায়গায় বাড়ির মেয়েদের নাচতে গাইতে দিতে নারাজ, তারা।

অবশ্য, তারা বলেন, মালেক সাহেবকে তারা বিশ্বাস করেন। তিনি অর্থাৎ মালেক সাহেব স্বয়ং নিয়ে যাবেন মেয়েদের, খেয়াল রাখবেন ওদের উপর, অর্থাৎ বদ ছেলেদের পাল্লায় পড়ে ফষ্টিনষ্টির সুযোগ যেন না পায় ওরা। তারপর প্রোগ্রাম শেষে পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবেন বাড়ি বাড়ি। তা হলে দুএকজন নেহাৎ মোল্লা-কিসিমের অভিভাবক ছাড়া আর সবাই রাজি। উপায় কি। সে দায়িত্বটা পুরোপুরিই নিতে হয়েছে মালুকে।

মেজো ভাই, দেখছো কাণ্ডটা? বাড়ি বাড়ি গিয়ে মেয়েদের কুড়িয়ে আনতে আর ফেরত দিয়ে আসতেই দিনের কতগুলো ঘণ্টা চলে যায় আমার। একটু পড়ব, একটু অনুশীলন করব, সে উপায় নেই। এর উপরেও কত গার্জিয়ানের যে পায় ধরতে হয়। ক্ষুণ্ণ, অভিযোগ ভরা স্বর মালুর। কার উপর রাগ করছিসরে?

এই কমবখ্‌ত্‌ অভিভাবকগুলো—

হো হো করে হেসে দেয় জাহেদ। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্নেহ ঝরিয়ে বলে: একটু ধৈর্য ধর, একটু সবুর কর। তুই ভুলে যাচ্ছিস, মধ্যযুগীয় পঙ্ককুণ্ড থেকে উঠে আসছি আমরা। পিছিয়ে পড়া জাত, স্বাধীনতার সনদটা পেয়ে গেলাম বলেই রাতারাতি বদলে যাবে দৃষ্টিভঙ্গিটা, ভাবছিস কেন?

চুপ করে শোনে মালু। এ সব যে বোঝেনা সে তাও নয়। কিন্তু এত সব ঝামেলা সামলে নিজের জন্য একটুও সময় পাচ্ছে না ও। সেখানেই তো ওর যত ক্ষোভ, যত অভিযোগ।

শোন্‌ মালু। এই দেশের মাটির ধাঁচই আলাদা। এ মাটির মানুষ একবার যেটাকে ধরে, তার শেষ অবধি দেখে একেবারে হেস্ত নেস্ত করেই ছাড়বে। আজ তোর অভিযোগ, উৎসাহিত ছেলে পাচ্ছিস না—কাকে গান শেখাবি, ঘর ছাড়তে নারাজ মেয়েরা। কিন্তু দেখছিস না তুই, শুরু হয়ে গেছে উৎসাহের প্রথম জোয়ার? আরম্ভ হয়েছে ঘর ছাড়ার অভিযান? তোড়ের মুখে এই অভিযান কোথায় গিয়ে যে শেষ হবে সে আজ কল্পনাও করতে পারবিনা তুই। তোর পক্ষেই তখন তাল মিলিয়ে চলা দায় হয়ে পড়বে।

পরিচিত সেই বক্তৃতার ঢংয়ে কি এক উদ্দীপনায় বলে চলে জাহেদ। সেই ছোট বেলার মতো প্রতিটি কথায় প্রশ্নাতীত বিশ্বাসটা হয়ত আসেনা মালুর। কিন্তু শুনতে ভাল লাগে মালুর। নিজের বুকেও যেন প্রচণ্ড এক প্রেরণার শক্তি পাক খেয়ে যায়।

বাঁধ যখন ভেঙ্গেছে একবার, দুর্বার সেই স্রোতের মুখে কোন সংস্কার, কোন

সনাতনী বাঁধনই আর টিকছে না। এটা মনে রাখিস। শুধু নিজের কাজটা নিষ্ঠার সাথে করে যা। এই দেশকে যে তোর অনেক কিছু দেবার আছে! মালুর কাঁধে সস্নেহ হাতের স্পর্শ বুলিয়ে কথাটা শেষ করে জাহেদ। জাহেদের উৎসাহে ঝামেলা পেরেশানীর ভারটা হয়ত একটু কম মনে হয় মালুর। কিন্তু সময় নিয়ে টানাটানি ওর দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এর উপর রয়েছে দৈনিক গড়পড়তা দুটো ট্যুশনি আর একটা গানের স্কুলে এক ঘণ্টার মাষ্টারি। এ সব সেরে যখন একটুখানি সময় ছিনিয়ে নেয় মালু তখন হারমোনিয়ামটা নিয়ে 'বসে। সঙ্গে থাকে খাতা কলম। নতুন কোন গানে সুর বাঁধে। পুরনো গানের সুর সাধে। কিন্তু, সে আর কতক্ষণ। ক্লান্তির ঘুমে বুজে আসে চোখের পাতা। শিথিল হয়ে ঢলে পড়ে শ্রান্ত দেহ। এমনি করে ক্ষুদ্র হতে হতে ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসছে ওর অনুশীলনের অবসরটুকু।

এই অতৃপ্তিটা ঢেকে রাখতে পারেনা মালু। অসন্তোষের চাপা আগুনটা ধিকি ধিকি পুড়িয়ে যায় ওর বুকের ভেতরটা। এই অসন্তোষের আগুনটাই বুঝি উল্কার আকারে ঝরে পড়ে তাদের উপর যারা আসে অনুগ্রহের প্রত্যাশায়, আসে প্রলোভনের ডালি নিয়ে। আসে দুর্লভ সময়ে অকারণ ভাগ বসাতে।

তাই বলে নিজের সহজ স্বভাবটাকে একেবারেই পাল্টিয়ে দেবে মালু? বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে এই পরিবর্তনটাকে কেমন করে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করবে মালু?

এ যেন ওর নিজের বিরুদ্ধেই কঠিন এক সংগ্রাম। নিজের সাথেই ওর সংঘাত—আপন শিল্পী সত্তার সাথে সামাজিক সত্তার, আপনার অন্তর্নিহিত মানবাত্মাটির বিরুদ্ধে শিল্পী আত্মার। দায়িত্বের বোঝাটাই যেন অস্থির করে তুলেছে ওকে। সে অস্থিরতার চাঞ্চল্যে নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারছে না ও। পারছে না সংযত পরিমার্জিত সামাজিক আচরণের স্পষ্ট একটা সীমারেখা টেনে নিতে। উগ্রতার, হয়ত আত্মম্ভরিতার একটা দুরত্ব, আপনার অজানাতেই, গড়ে তুলেছে ঘর সংসার করা স্বাভাবিক মানুষগুলোর সাথে। কিন্তু মালু তো কোনদিন এমনটি ছিল না? এখানেই বুঝি স্ববিরোধীতা। বুদ্ধির সাথে আচরণের। বিশ্বাসের সাথে ব্যবহারের। এখানেই বুঝি বিরোধ: শিল্পী মানুষের সাথে সামাজিক মানুষের।

গোলগাল চেহারার সেই কেতাদুরস্ত ছেলেটার প্রতি অহেতুক দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হল মালু।

দেয়ালে টাঙান ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কুঁচকে আসে ওর ভ্রু জোড়া। অফিস

বন্ধ করার সময় প্রায় হয়ে এল। ওর না বেরুনো পর্যন্ত করিম আর কেরানী ইয়াসীনকেও বসে থাকতে হবে। বুঝি ওদের দিকে চেয়েই ফাইলগুলো বন্ধ করে রাখল মালু। কয়েকখানি চিঠি বেছে নিয়ে পুরে নিল হাত ব্যাগে। শোবার আগে উত্তরগুলো লিখে রাখবে।

সেই হলদেটে খামটা একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় রাখা আছে এক পাশে। দামী কাগজটা রেশমের মতো চক চক করছে। চিঠিখানা তুলে বুক পকেটে রেখে দিল মালু।

এ এক অদ্ভুত মেয়ে। প্রায় হপ্তায় হপ্তায় চিঠি লিখে চলেছে। উত্তর চায় না। হয়ত নিজেকে খুসি করার জন্যই লেখে, তাই উত্তরের প্রয়োজন নেই ওর।

কিন্তু মেয়ে কি ? খটকা লাগে ওর মনে। কেমন করে এই অনামাকে মেয়ে ধরে নিয়েছে মালু ? গোটা গোটা হাতের লেখা দেখে ? সে তো পুরুষেরও হতে পারে !

সেই প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হয়েছে মালুর, ওই উৎসাহ ভরা পত্রগুলোর উৎস কোন রহস্যময়ী মেয়ে। ওর গানের অনুরক্তা। ওর শুভার্থিনী। প্রিয় শিল্পীর কাছে বুঝি প্রেরণার অজ্ঞাত ঝরনা হয়েই থাকতে চায় মেয়েটি।

একটুখানি হাসি ঠোঁটের প্রান্ত থেকে উঠে এসে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে মালুর। ওই বিচিত্র কৌতুকিনীর চিঠিগুলো মালুর জন্য নির্মল এক আনন্দ।

করিম, ইয়াসিন,—চললাম। বেরিয়ে এল মালু।

গেটের সুমুখেই অপেক্ষমান রিক্সাটায় চড়ে বসল ও, বলল—টিকাটুলি।

ঘরোয়া জলসা বলেই জানা ছিল মালুর। কিন্তু বাড়িটার ভেতরে ঢুকে ওর চক্ষু স্থির। প্রশস্ত আঙ্গিনায় শামিয়ানা টাঙিয়ে চেয়ার পেতে রীতিমতো শানদার জলসার আয়োজন। শামিয়ানা ছাড়িয়ে বারান্দা তক ভরে গেছে লোকে।

অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ মালু। উদ্যোক্তরা পূর্বাহ্নেই সে কথাটা ঘোষণা করে দিয়েছেন। হয়ত তাই এত লোক। সার্থক শিল্পীর গর্ব আর আনন্দের তৃপ্তিতে ভরে যায় মালুর বুকটা। ওর নামে যে কোন জলসায় ভীড় করে আসে শ্রোতার দল।

প্রধান শিল্পীর মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ মালু। মন দিয়ে গাইল ও। গাইল তালতলি বাকুলিয়ার সেই আদিম সুরে। ভূমিষ্ট হয়েই যে সুর শুনে আসছে এ দেশের মানুষ। যে সুরে স্বপ্ন রচনা করেছে, অতীতকে দেখেছে, ভবিষ্যতকে ডেকেছে।

ওরা শুনল ওদের নাড়ির সুর, ওদের মাটির সুর। ওরা চমকিত হল।

মালু থামল।

নিস্পন্দ নির্বাক দর্শক। সুরের মূর্চ্ছনায় বুঝি তলিয়ে গেছে ওরা। ওদের চেতন লোক কোন অতীন্দ্রিয় আবেশে যেন ঘুমিয়ে গেছে। অথবা সুরের পাখায় ভর করে ওরা হারিয়ে গেছে নিজেদেরই কোন ভাবলোকে, বিলীন হয়েছে স্পর্শ আর দৃষ্টির অতীত সুরেরই কোন নিজস্ব পৃথিবীতে।

তারপর যেন অকস্মাৎ বিমূঢ় চমকের ঘোর কাটিয়ে ওরা ভেঙ্গে পড়ে প্রচণ্ড হাত তালিতে। সামনে থেকে, পেছনে থেকে, চারিদিক থেকে ওঠে চীৎকার— আবার আবার।

মালুর চোখ ফিরাল সেই মেয়েটির দিকে প্রথম সারির দক্ষিণ কোণে ছবির মতো বসে আছে যে মেয়েটি। এখনো চোখ মুদে আছে, যেন স্বপ্ন দেখছে ও। সেই স্বপ্নের আমেজেই বুঝি ঠোঁটের কার্নিশে ফুটে উঠেছে একটি চিকণ মৃদু হাসির রেখা, আলো আঁধারির সন্ধিক্ষণের ছায়াটির মতোই অস্পষ্ট কিন্তু অপরূপ। ওরা ফর্সা টকটকে মুখখানিতে লাবণ্যের পাতলা ছিলকের মতো লেগে রয়েছে বুঝি অতীন্দ্রিয় সেই সুর-লোকের মায়া।

হাত জোড় করে মাফ চাইল মালু, আর গাইতে পারবে না সে।

কিন্তু জ্বলে উঠেছে ওর ভেতরটা, রোমকূপের অসংখ্য ছিদ্র দিয়ে সে জ্বালাটা পলায়নের পথ খুঁজেও যেন পথ পাচ্ছে না। ব্যর্থ নিরুপায় কোন কান্নার মতো ওর শরীরটা ফুলে ফুঁসে উঠছে। সহসা কি এক অপমান এসে বিঁধল ওর শিল্পী সত্তাতে।

চোখে খুলছেনা কেন মেয়েটি? এখনো কি ও ডুবে রয়েছে মূর্চ্ছিত সুরের স্বপ্ন মায়ায়? এত লোক—ওরাই বা কেন ঝিমিয়ে পড়ল নির্জিব নিস্তেজ স্বপ্নালুতায়? মালু তো গায়নি কোন ঘুম পাড়ানি গান! তার চেয়ে রেগে মেগে যদি তেড়ে আসত ওরা, অথবা শিস দিয়ে অঙ্গ দুলিয়ে একটা ইতর হুল্লোড় মুচিয়ে তুলত, তা হলেই যেন খুসি হত মালু, তৃপ্তি পেত। গানের সুরে মানুষের হৃদয়টা নিঙড়ে নিয়ে তার মনের কথা আর ভাষার ফোয়ারাটা যদি খুলেই না দিতে পারল মালু, তবে কী সার্থকতা ওর গানের? আজই প্রথম নয়। বিমুগ্ধ শ্রোতাদের মোহাবিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে আগেও প্রশ্নটি মনে জেগেছে ওর।

চোখ মেলেছে মেয়েটি। মখমলের মতো নরম চোখ। শিশির ফোটার মতো টলটলে ওর চোখের তারা। ত্রস্তে মুখ ঘুরিয়ে নিল মালু। মেয়েটিও বুঝি এক খুঁট আঁচল তুলে ঢাকতে চাইল ধরা পড়ার লজ্জাটা।

উদ্যোক্তাদের একজন এসে হাত জোড় করল, স্যার আর একটা গান আপনাকে গাইতে হবে।

বেশ। রাজী হল মালু। পাশে বসা নবীন গায়ক বরকতের দিকে তাকিয়ে বলল ও, বরকত তুমি একটা বাউল ধর। ইতিমধ্যে মেজাজটা একটু দুরস্ত্ করে নিই আমি।

আজ নিয়ে বার দশেক, কি আরো বেশি, দেখা হল মেয়েটির সাথে।

কথা হয়নি একবারও। শুধু চকিত একটি দৃষ্টি বিনিময়। একটুবা চোখের হাসি। একটু রাঙিয়ে ওঠা। তার পর মুখ ঘুরিয়ে নেয়া।

একরাশ লজ্জার বোঝায় মিইয়ে গেছে মালু। মেয়েটিও। মেয়েটির অস্তিত্ব সম্পর্কে কেমন করে যেন সজাগ হয়ে উঠেছে মালু।

যে কোন জলসা অথবা আসরে ও আসবেই, একটা আজকাল এক রকম ধরেই নেয় মালু। মঞ্চে উঠে প্রথমেই মেয়েটিকে খোঁজে ও। পেয়েও যায়। সেই প্রথম সারির কোণের সিটে পটের ছবিটির মতো বসে আছে মেয়েটি। এও এক ধাঁধাঁ।

অচেনা সেই পত্র লেখিকার মতো এও বুঝি এক অদ্ভুত মেয়ে। নীরবতার আড়াল থেকে শুধু দৃষ্টির ভাষায় নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে মালুকে। আপনাকে উন্মোচিত করবার এতটুকু ব্যাগ্রতা নেই ওর। ব্যাগ্রতা নেই চোখের ভাষাকে মুখের বোলে ফুটিয়ে তুলবার।

কিন্তু, মেয়েটির চোখে শুধু কি প্রেরণার ভাষা? কি যেন নিবেদন, সুরে সুরে আপনাকে লীন করার কি এক ব্যাকুলতা, কতদিনের ভীরু চাহনিতে তাই যেন দেখতে পেয়েছে মালু।

সেদিন ছিল টিকেটের ব্যবস্থা। কোন দাতব্য কাজে সঙ্গীত জলসা। প্রথম সারির কোণের চেয়ারে পঞ্চাশ টাকার সিটে বসেছিল মেয়েটি। 'নিশ্চয় কোন পয়সাওয়ালার মেয়ে। অথবা বউ? না, বউ নয়। তাই যদি হত তবে একটা সুখী আত্মমগ্ন পুরুষ মুখ মেয়েটির পাশে দেখা যেত নিশ্চয়। মালুতো মেয়েটিকে বরাবর একলাই দেখে আসছে।

গায়ক গায়িকাদের মাঝে বসে এমনি সব কথাই ভাবছিল মালু। ভাবতে ভাবতে চোখ গিয়ে পড়েছিল কোণের চেয়ারটিতে। হৃদপিণ্ডটা কেঁপে উঠেছিল মালুর।

বুঝি অনেক দুঃখ মেয়েটির। দুঃখের ভারে নুয়ে এসেছে ও। এ দুঃখের পীড়ন থেকে কেউ কি মুক্ত করবেনা ওকে? মেয়েটির শিশির টলটল চোখের

তারায় এ কথাগুলোই যেন লেখা ছিল সেদিন। ওর মুখের উপর থেকে দৃষ্টিটা তুলে নিতে সেদিনের মতো কথনো এত কষ্ট পায়নি মালু।
আর একটা দিন ব্যতিক্রম। মেয়েদের কলেজে কি এক উৎসব। মেয়েটি সেদিন প্রথম সারিতে ছিল না। ছিল দাঁড়িয়ে, মঞ্চের উইংসে। লাল সালুতে মোড়া একটি বাঁশের গায়ে কাঁধের ভারটা ছেড়ে দিয়েছিল ও। হাত দুটো ছিল বুকের উপর, একটি অপরটিকে জড়িয়ে। সাড়ির আঁচলটা ছিল কোমরে প্যাঁচান। উদ্ধত বক্ষের ভারে ওর সরু কোমরটি বুঝি বেঁকে গেছিল। অথবা সে ছিল ওর হেলান দিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গি। অদ্ভুত মনোরম ভঙ্গি। কিন্তু, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে পলকেই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছিল মালু।
কি ছিল মেয়েটির চোখে?
দিগন্তের কিনারে সদ্য ঘুম ভাঙ্গা কোন মেঘের হাতছানি? তেমনি একটা কিছু, যা ব্যক্ত করা যায় না; পুরোপুরি বোঝা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়।
ওর চোখের কোলে যেন জমেছিল ঘন কৃষ্ণ মেঘের সকরুণ স্তব্ধতা।
সেখানে ছিল হারিয়ে যাওয়ার ডাক, কি এক মিনতি আর গভীর আকুতি পরম সমর্পণের। বার বার তাকিয়ে সে চোখের অতগুলো নীরব কথা পড়তে পড়তে হয়েছিল মালুকে।
আরো আশ্চর্য! সেদিন চোখ ফিরিয়ে নেয়নি মেয়েটি। যেন জিদের বসে বাজি ধরেই তাকিয়ে ছিল মালুর দিকে।
তারপর কয়েকটা গানের শেষে আড়-চাহনিটা আর একবার উইংসের দিকে পাঠিয়েছিল মালু। তখন বিজয়িনীর কৌতুকে নাচছে মেয়েটির চোখজোড়া। যেন ঠিকরে পড়ছে কি এক বিদ্রূপ! উপেক্ষা করবে? সে শক্তি নেই তোমার। চোখে চোখ না মিলিয়ে পারলে কই উদাসীনতার ভান করতে? যা ইচ্ছে তাই মনে করতে পার তুমি। কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব? চোখে চোখ রেখে জবাবটা দিয়ে ফেলছনা কেন?
এ কী প্রশ্ন কথা-না-বলা মেয়েটির?
অজানা এক রোমাঞ্চে দুলতে দুলতে সেদিন বাড়ি ফিরেছিল মালু; নীরব চোখের সেই জিজ্ঞাসাগুলো ছুটে এসেছিল ওর পিছু পিছু।
কথা-না-বলা মেয়েটি কি চায় মালুর কাছে? মালু জানে জানেনা। মালু শুধু জানে, যখন ও ভাবে মেয়েটির কথা, মধুর এক রোমাঞ্চের আবেগে দোল খায় মালু, ঘুমের মাঝে, কাজের ফাঁকে. এ এক নতুন অনুভূতি মালুর

জীবনে। বুঝি বিচিত্র কৌতুকিনী মেয়ে। মধুর এক প্রচ্ছন্নতায় আপনার আকর্ষণকে দুর্নীবার করে তুলতে চায়। অথবা বড় ভীতু মেয়ে। দারুণ ইচ্ছে মনে, কিন্তু সাহস নেই এগিয়ে এসে এক টুকরো হাসি বা দুটো কথার বিনিময় করুক মালুর সাথে।

জলসা শেষে কত লোকই তো ঘিরে ধরে মালুকে। জনপ্রিয় শিল্পীর একটু হাসি অথবা দুটো কথার প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ মনে করে নিজেদের। কিন্তু ওই নাম-না-জানা চোখে-চোখে-কথা-বলা মেয়েটি কখনো আসেনা মালুর কাছাকাছি। ভীড়ের সাথে মিশে গিয়ে অলক্ষ্যেই বেরিয়ে যায় ও।

সেই নবীন গায়ক শেষ করেছে। আবার দাবী উঠেছে মালুর জন্য। চীৎকার করছে দর্শকরা।

মালুর মনে হল চীৎকারটা যেন ধীরে ধীরে ইতর হল্লায় রূপান্তরিত হচ্ছে। ওকে দিয়ে যেন জোর করেই গান গাওয়াবে ওরা।

মেজাজটা আবারও বিগড়ে গেল মালুর।

ওরা কি জানেনা গাইয়ে বাজিয়ে লিখিয়েদের জোর করে বাগ মানান যায় না? হৃদয় মনের সুকুমার বৃত্তি নিঙড়িয়ে যারা রস আহরণ করে তাদের উপর কি জবরদস্তি চলে? জোর খাটিয়ে কোনদিন কেউ কি পেরেছে ওদের কাছ থেকে কাজ হাসিল করতে? কি এক গোঁ চাপল মালুর। অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণায় হাত গুটিয়ে বসে রইল ও। গান সে গাইবেনা, দেখা যাক কি করে ওরা।

অসাবধানেই বুঝি দৃষ্টিটা ওর ঘুরে গেল সেই কোণের আসনটির দিকে। স্বপ্নঘোর ভেঙ্গে গেছে মেয়েটির। কোমল এক দীপ্তি এসেছে ওর চোখে। অন্যদের হয়ে যেন মাফ চাইছে ও। আর ছোট্ট একটি অনুরোধ এঁকে রেখেছে চোখের কোলে। অনুচ্চারিত সেই আবেদনটা কেমন করে অস্বীকার করবে মালু? তবলচিকে ইশারা দিয়ে গলাটা একটু ঝেড়ে নিল সে।

একটি পুরনো গানে নতুন সুর যোজনা করল মালু। সুরটিও বোধ হয় পুরনো। কিন্তু নতুন তার ঝংকার। নতুন ঠাট। নতুন ব্যঞ্জনা। ঘুম পাড়ায় না, টেনে নেয় না স্বপ্নের অলস পরিমণ্ডলে। মোহের পর্দা টেনে আচ্ছন্ন করেনা মনকে।

এ এক উদ্দামতার গান। যৌবনের উদ্দামতা। চিরকালের যৌবন, যা টগবগিয়ে উপচে পড়ে, ফেনা ছাড়ে। হয়ত ভারি করে তোলে জীবনের বাজে খরচের হিসেব। কিন্তু, সুপ্তি-মুক্তির সেই তো সুর। শুধু আরোহণ,

অবরোহণের শঙ্কা মুক্ত। হয়ত তাই এ গানের ভাষা মোলায়েম নয়। এর উচ্চারণ অমসৃণ, এর স্বর যেন শিলায় শিলায় প্রচণ্ড ঘর্ষণে রুদ্র নির্ঘোষ। এ কী করছে মালু? ও কি সম্বিত হারাল? রুক্ষতার ছন্দে এ কোন ভৈরবী রাগিনীর আরাধনা করছে ও?

হিমসিম খেল তবলচি। হয়রান হল বাজিয়েরা। ওদের হাত আর চলতে চাইছে না; আঙুল এসেছে অবশ হয়ে। কিন্তু, এ যে সুর। সুরের তো অন্ত উন্মাদনা। চাঁদের আকর্ষণ যেমন করে টেনে নেয় পৃথিবীর পানি, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে তোলে জোয়ারের আলোড়ন, তেমনি অপ্রতিরোধ্য সুরের আকর্ষণ। উন্মাদের মতোই যন্ত্রের বোল তুলে গেল ওরা।

যেন আচমকাই থেমে গেল ওরা।

কিন্তু, একি? কোন প্রতিক্রিয়া নেই দর্শকদের আসনে। যেন থম ধরে গেছে ওরা। অথচ ওরা সজাগ। স্বপ্নালুতার পর্দা নামেনি ওদের চোখের উপর।

ওরা হাততালি দিল। উত্তাপ নেই সে তালিতে। নেই ওদের প্রিয় শিল্পীর প্রতি সেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কলকাকলি। কে ওদের বলে দেবে এই এক পুরুষ আগেও নজরুল নামের কোন কবির কণ্ঠে এ গান জীবনের প্লাবন ডেকেছিল। এ গানের ভাষা এসেছিল সে কবিরই কলমের সাধনায়। লাল হয়ে এল মালু। যেন লাঞ্ছিত হয়েছে ও। এ রুদ্র রাগিনী গ্রহণ করল না ওর শ্রোতারা।

কত বিশ্বাস, কত আশ্বাস ও দুটো চোখে। যেন বলছে: বুঝেছি আমি, বুঝেছি। আজীবন এ গানই গেয়ো তুমি। মালু দেখল মখমল নরম চোখ গলে ঝরে পড়ছে স্নিগ্ধ সহানুভূতি আর অন্তহীন মমতার ধারা। সে ধারা ধুয়ে দিল ওর লাঞ্ছনার গ্লানিটা।

অনুষ্ঠান শেষ হল। কলকলিয়ে বেরিয়ে গেল শ্রোতার দল। জলযোগ আর ধন্যবাদের পালাটা শেষ করে আমন্ত্রিত শিল্পীরাও চলে গেল একে একে।

গেটটার কাছে এসে থমকে পড়ে মালু। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই নাম-না-জানা চোখে-চোখে-কথা-বলা মেয়েটি। মালুকে দেখে এগিয়ে এল ও। একটা চিরকুট মালুর হাতে গুঁজে দিয়ে সরে পড়ল। গেটটা পেরুতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। যেন বাতাসও শুনতে না পায় তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলল: অপেক্ষা করব কিন্তু।

অবাক হবারও বুঝি অবসর পেলনা মালু। সেই তখন থেকে দাঁড়িয়ে ছিল

মেয়েটি ? চিরকুটের ভাঁজটা খুলে ফেলল ও। লেখা আছে :...লারমিনী স্ট্রীট, উয়ারী। আগামীকাল বিকেল সাড়ে পাঁচটা। কোন সই নেই লেখার নিচে। গেট পেরিয়ে দেখল মালু, একখানি কালো গাড়ি মোড় নিয়েছে বাঁ দিকের রাস্তায়।

শহরের পথে পথে কত বিস্ময়। কত ধাঁধাঁ। মালু যেন এখনো তার হদিস করে উঠতে পারে না। সেই যে মহানগরী, যা ছেড়ে এসেছে মালু এত বছর বাস করেও তার বিচিত্র জীবনের বেড় পায়নি সে। আর এই ছোট্ট শহরটি যেন ওই মহানগরীরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। পদে পদে বিস্ময়ঘেরা জটিলতা এখানেও।

ওই নাম-না-জানা চোখে-চোখে-কথা-বলা মেয়েটি, আর সেই নামহীন ঠিকানাহীন চিঠির উৎস কোন মেয়ে, ওরাও এই শহরেরই জটিলতার অংশ। ওরা বিচিত্র ধাঁধাঁ।

চিরকুটটার সাথে সেই ঠিকানাহীনার চিঠিগুলো মিলিয়ে দেখল মালু। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি ছত্র প্রতিটি শব্দ অক্ষর আর টান, পাশাপাশি রেখে মিলিয়ে চলল।

না। সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নেই। ঠিকানাহীনার অক্ষরের সাথে কথা-না-বলা মেয়েটির হাতের লেখায় সামান্য অমিল নেই।

হয়রান মানে মালু। একি অদ্ভুত কৌতুকবোধ মেয়েটির ? হয়ত অন্য কিছু। কিন্তু মেয়েটা কেমন বোকা বানিয়ে গেল মালুকে। যে লেখে চিঠি, ঠিকানা জানায় না, যার চোখে অভয়, মুখে নীরবতা—ছুটো মেয়ে যে এক হতে পারে, প্রশ্নটা কোনদিনই জাগেনি মালুর মনে। মালু না হয়ে যদি হত কোন শহুরে ছেলে, যাদেরকে বলা হয় চৌখস, ছুটো কিসসার মাঝে অদৃশ্য সূত্রের যোগাযোগটা অনায়াসেই খুঁজে পেত ওরা। পৌঁছে যেত অনিবার্য সিদ্ধান্তে।

মালুর আনাড়িপনায় নিশ্চয় মনে মনে হাসছে মেয়েটি।

একটা অনিশ্চিত সুন্দর বিকেলের মিষ্টি প্রতীক্ষায় দিনটা কেটে গেল মালুর।

গেটের কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল মেয়েটি। পাতলা কাঠের ফালির ছোট্ট গেট। কোমর সমান উঁচু। ওকে দেখে গেটের মাথায় বাঁকান লোহার আংটাটা

আলগা করে এক পাশে সরে দাঁড়াল মেয়েটি। বলল না, আসুন, অথবা অন্য কিছু। শুধু চোখের একটি চকিত ঝিলিকে জানিয়ে দিল খুব খুশি হয়েছে ও।

কথা যখন বলবেন-ইনা আপনি তখন উদ্যোগটা আমাকেই নিতে হচ্ছে। গেট পেরিয়ে দোতলা দালান অবধি নুড়ি ছড়ান ছোট্ট পথটিতে পা রেখে বলল মালু। তারপর মেয়েটির দিকে চোখ এনে শুধাল: কি নামে ডাকব বলুন তো?

যে নামে ভাল লাগে আপনার? উত্তরটা যেন আগে থেকেই তৈরী রেখেছিল মেয়েটি।

শহুরে চতুরতার আবহাওয়ায় অনেকগুলো বছরই তো কাটিয়ে দিল মালু। কিন্তু, এ ধরণের সপ্রতিভতায় এখনো বুঝি তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বিব্রত হল মালু। আমতা আমতা করেই বলল: মানে, মানে, আপনার নামটা···

ভারি দুঃসাহস তো আপনার! প্রথম সাক্ষাতেই নাম জানতে চাইছেন? মৃদু হাসির রেখা মেয়েটির মুখে।

বা-রে, প্রথম সাক্ষাৎ কেন হবে?

তাহলে বলুন তো কোথায় কোথায় দেখেছেন?

যেখানেই গান সেখানেই···

যেখানে গান সেইখানেই? যেন অবাক হয়েছে মেয়েটি। কেমন টেনে টেনে মালুর কথাটারই পুনরুচ্চারণ করল।

বসুন। ঘরে এসে একটা কাউচের দিকে ইশারা দিয়ে বলল মেয়েটি। নিজেও বসল পাশের কাউচে।

সত্যি তো। ওদের তো আর প্রথম পরিচয় নয়। অনেক দিনের চেনা জানা। সহজ হয়ে আসে মালু। পায়ের উপর পা রেখে আরামের ভঙ্গিতে হেলান দিল ও, বলল: অপনি কিন্তু আমাকে প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের চমক লাগিয়ে দিয়েছেন!

বিস্ময়ের চমক? খুব মজা পাচ্ছে ও, তেমনি করে মালুর কথাটারই পুনরাবৃত্তি করল মেয়েটি। চোখের কোলে দ্যুতির তরঙ্গ খেলিয়ে শুধাল আবার, কি রকম চমক, বলুন তো?

রকম বড় মারাত্মক। দুর্বোধ্য এক ধাঁধা, যার কোন কিনারা পাই না। ধাঁধা? কেমন ধাঁধা? আবারও মালুর কথা দিয়েই কথা বলে মেয়েটি।

চিঠি লিখবেন, ঠিকানা জানাবেন না। পত্র দেবেন, উত্তর চাইবেন না। চেয়ে থাকবেন, কথা বলবেন না। শেষে ঠিকানা দিলেন, নাম রাখলেন লুকিয়ে।

শুনেছি, যা থাকে লুকিয়ে শিল্পীরা নাকি তাকেই উন্মোচন করে। আপনার হৃদয়ে তেমন কোন বাসনা জাগেনি কখনও ?

মালু বোবা। কোত্থেকে এক ঝলক রক্ত ছুটে এসে মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে ওর, কানের লতিগুলো গরম করে তুলেছে। নিজের এই নাজেহাল অবস্থাটা যেন নিজের আয়নায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মালু।

মেয়েটি কিন্তু মিটিমিটি হেসে চলেছে। ওর মখমল চোখের মতোই স্নিগ্ধ আর মিষ্টি ওর মুখের হাসিটা।

অপরাধটা তা হলে স্বীকার করছেন ? হাসি থামিয়ে সহসা গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটি।

শুধু নাজেহাল নয়, ওকে অপরাধী, হয়ত কাপুরুষ প্রতিপন্ন করেই ছাড়বে মেয়েটি।

পায়ের উপর রাখা পাটা নামিয়ে নড়ে চড়ে বসল মালু। বলল : অপরাধ কার এখুনি সে বিচার নাই-বা করলেন। কিন্তু হয়রানীর আমার এক শেষ হয়েছে, সেই প্রথম চিঠি পাবার পর থেকে। অদম্য আগ্রহ চেনবার জানবার, জানবার, অথচ উপায় নেই, এটাকে হয়রানী বলবেন না ?

জীবনে বুঝি কারো জন্য হয়রানী পোহান নি ?

না।

মেয়েটির সমাজে বুঝি অমন স্পষ্ট করে কথা বলার রেওয়াজ নেই। হয়ত সে জন্যই হঠাৎ করে চোখ তুলে ওকে দেখল মেয়েটি। বলল : একটু আগে যে বলছিলেন ধাঁধা, সেই ধাঁধাটা ?

মানে আপনি, বিচিত্র ওই পত্র দান, প্রথম সারির কোণের আসনটায় বসে থাকা সেই শুভেচ্ছা, সেই মমতার সুধা ঝরান এক জোড়া চোখ, সবই—সবই শুধু হয়রানী, তাই না ? কৌতুক ঝরে মেয়েটির হাসিতে।

নিজের কথার প্যাঁচে পড়ে নিজেই যেন ঠকে যাচ্ছে মালু। ত্রস্তে প্রতিবাদ করে উঠল : না না। হয়রানী হবে কেন ? সে তো আনন্দ !

ওর নৈপুণ্যের অভাব দেখে আবারও বুঝি হাসল মেয়েটি।

পর্দা ফাঁক করে উঁকি দিল একখানি মাঝ বয়সী মুখ, বলল : রিহানা, তোমাদের চা কি এখানে পাঠাব, না ডাইনিং রুমে আসবে ?

এখানেই চাটা জমবে, তাই না? খুব নীচু গলায় মালুকেই শুধাল মেয়েটি। কিন্তু ওর মত বা উত্তরটার জন্ত অপেক্ষা করল না। পর্দার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল—এখানে।

অদৃশ্ত হয়ে গেল মাঝ বয়সী মুখখানি।

মা। মালুর দিকে তাকিয়ে বলল মেয়েটি।

নামটা কিন্তু সুন্দর আপনার।

ও। এই ফাঁকে শুনে নিলেন বুঝি? কিন্তু, আপনি তো জানতে চেয়েছিলেন কি নামে ডাকবেন।

ছোট্ট একটা হুঁ উচ্চারণ করে মুখ নামিয়ে নেয় মালু। সপ্রতিভ রিহানার সুমুখে আজ ও বিধ্বস্ত।

কিছুক্ষণ কেটে যায় চুপচাপ।

চা এল। চায়ের সাথে নাশতা।

বলুন না, কি নামে ডাকবেন? নাশতার তশতরিটা এগিয়ে দিয়ে রিহানই শুধাল এবার।

কেন, রিহানা নামটি তো বেশ?

ও নামে তো সবাই ডাকে। যেন ক্ষুণ্ন হল রিহানা।

যে নামে সবাই ডাকে মালুও কি সে নামেই ডাকবে ওকে? মালু ডাকবে ওর সুর ভরা কণ্ঠে, ওর নিজের দেয়া নামে, নিজের রচিত অভিধায়। অনুযোগের চোখে তাই যেন বলে গেল রিহানা।

ভাবতে হবে যে, মাথা চুলকিয়ে বলল মালু।

এতদিন ভাবেননি বুঝি? মালুর আনাড়িপনায় আর একবারও যেন হাসল রিহানা।

মায়ের মুখখানি আর একবার উঁকি দিয়ে গেল। পর পর আরো কয়েকখানি মুখ পর্দা সরিয়েই চকিতে অদৃশ্ত হয়ে গেল।

শুধু কৌতুহল নয় ওদের, আরো কিছু। হয়ত সন্দেহ। সোমত্ত কুমারী মেয়েকে একেবারে পাহারাবিহীন পর পুরুষের সান্নিধ্যে ছেড়ে দেয়ার আধুনিকতাটা বোধ হয় এখনো রপ্ত হয়নি এ বাড়িতে। অন্ততঃ তাই মনে হল মালুর। গান শেখাতে গিয়ে অনেক ছাত্রীর বাড়িতে এ অভিজ্ঞতাটা পেয়েছে ও। তবু অস্বস্তিটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও, অবিশ্বাসের এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করার মতো নির্লিপ্ততা আয়ত্ত হয়নি ওর।

রুমালে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল মালু।

সে কি? একটি করুণ মিনতি অস্ফুটে ঝরে পড়ল রিহানার মুখ থেকে। ও দৌড়ে গেল ঘরের কোণে। সেখানে ছোট্ট একটি টুলের উপর রাখা হারমনিয়ামটা এনে রাখল নীচের গালিচায়। বলল: এবার গান হবে। আজকের গানের শ্রোতা শুধু আমি।

অনুরোধ নয় রিহানার। মনের সুন্দর ইচ্ছাটাকে সহজ আদেশের ভঙ্গীতে ব্যক্ত করে গেল ও। যেন এটাই স্বাভাবিক, যেন কতদিন এমনি করে ওকে গান শুনিয়েছে মালু।

যেন চুম্বকের আকর্ষণে হারমোনিয়ামটার কাছে এসে বসল মালু। গান ধরল।

ওর সমুখেই গালিচার উপর পা গুটিয়ে বসল রিহানা।

আঞ্চলিক টানের একটি দেহাতী গান ধরেছে মালু। সেই পুরোনো দিনের মালু বয়াতির কণ্ঠে পাওয়া গণি বয়াতির গান। পুরোনো গান, পুরোনো সুর, কিন্তু নতুন প্রাণ। কথা তার মুখ্য নয়, মুখ্য তার ভাই। সুর তার প্রধান নয়, ঝংকার তার প্রাণ। ভাবে আর ঝংকারে প্রাচীন গান পেয়ে যায় নতুন অর্থ, নতুন বিস্তার। এ যেন সেই মান্ধাতার আমলের বুড়ো বাতাস, বসন্তের ছোঁয়ায় যার রূপশ্রী গন্ধ সবই গেছে বদলে।

কি এক আবেশ মুগ্ধতায় নীমিলিত রিহানার দুটো চোখ। কখনো কেঁপে যায় চোখের পাতাগুলো হাওয়া লাগা পাপড়ির মতো। তারপর যেন প্রদীপের স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে উঠলো চোখ জোড়া। কাছে আরো আছে যেন মালুর মুখের উপর নেমে এল সে চোখ। সুরগুলো বুঝি আপনাদের বিছিয়ে দিয়েছে সে চোখের মখমল কোলে। ধীরে ধীরে ঘন নিবিড়তায় ঠাঁই নিয়েছে স্থির অকম্প্র মণির গভীরতায়। তারপর কি এক উত্তাপ হয়ে ঝরে পড়ছে, একটি নিবেদিত হৃদয়ের উষ্ণতা নিয়ে ফিরে আসছে ওদেরই স্রষ্টার কাছে।

এ দৃষ্টির আশ্বাস, এ নির্ভয় প্রেরণা, এতদিন দূর থেকেই তো পেয়ে আসছে মালু। কিন্তু আজ ওরই সুর গুলো মধুর সে দৃষ্টির নির্মাল্য নিয়ে অনাস্বাদিত কোন অমৃত ধারার মতো ঝরে পড়ছে। সে ধারায় অবগাহন করছে মালু। এ এক আশ্চর্য মধুর অনুভব মালুর জীবনে। মালু কৃতার্থ। এ তো আর মোহ নয়। অচেনার রহস্য মোড়া রোমাঞ্চও নয়। এ যে ওর গান সুর ভাব, ওরই আত্মার প্রতিবিম্ব। ও দেখছে। অনুভব করছে। লেহন করছে।

শিশির টল টল সেই একজোড়া চোখ। আজ যেন বন্দীত্বের ডাক সে চোখের ভাষায়। যে হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ওই চোখ, সে হৃদয়ের গভীরে বুঝি লীন হল মালু। সে হৃদয়ের গভীরে ওর সুরের প্রতিভাস, ওর গানের প্রতিধ্বনি।

চোখের কথায় আর গানের সুরে ঘরের ভেতর ওরা রচনা করে নিল মায়াময় এক পৃথিবী। মায়াময় সেই পরিবেশে ওরা বিমুগ্ধ, আচ্ছন্ন নয়। সত্তায় ওদের সঙ্গীতের অনুরণন, কিন্তু বিশ্লেষণ সচেতনতায় উন্মুখ ওদের তন্ত্রী। সুরের পাখায় ভর দিয়ে খুইয়ে গেলনা ওরা কল্পলোকের কোন বিবশ অচেতনতায়। সূক্ষ্ম আনন্দবোধটিকে সূক্ষ্মতর করে চুনিয়ে চুনিয়ে উপভোগ করছে ওরা। সুডোল ছোট খাট হাত রিহানার। সে হাত সুন্দর শৈথিল্যে উঠে আসে ওর খোঁপার দিকে। খোঁপার গন্ধরাজ কলিটি খুলে বাড়িয়ে দেয় মালুর দিকে।

আপনাকে সম্পূর্ণ করে তুলে দেবার যে প্রতীক, সে ফুলটা গ্রহণ করল মালু। ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল, নাকের কাছে এনে গন্ধ নিল। তার পর যত্ন করে রেখে দিল বুকের পকেটে।

আসি তা হলে? হারমোনিয়ামের চাবিগুলো বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল মালু।

কাল আসছেন ঠিক আজকের সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। বলল রিহানা।

কালই? আশ্চর্য হল, খুসিও হল মালু।

হ্যাঁ, কালই তো! আপনি যে এখন আমার মাষ্টার। গান শেখাচ্ছেন। যেন আগে থেকেই এসব ঠিক করা, মালুই ভুলে যাচ্ছে।

মাষ্টার? গান শেখাচ্ছি? রিহানা বুঝি ওকে শেষ পর্যন্ত নাজেহাল আর বেকুব বানিয়েই ছাড়ল।

আপনি সত্যিই একটা বোকা। কিচ্ছু বোঝেননা। কেমন দুষ্টু হেসে বলে রিহানা।

এ ব্যাপারে কেমন করে আর দ্বিমত থাকতে পারে মালুর? সত্যিই সে বোকা।

গানই যদি না শেখাবেন, তবে এ বাড়িতে আসবার পথটা কি, বলুন তো? কিচ্ছু বোঝেননা আপনি। সেই মখমলের চোখে এবার চটুল তরঙ্গ খেলা।

ঠিকই। রিহানার মতেই সায় দেয় মালু, কিচ্ছু বোঝেনা ও।

আচ্ছা, কাল পর্যন্ত তবে বিদায়। শাড়ির ঢেউ তুলে দোতলার দিকে উঠে যায় রিহানা।

মালু আসে। গান শেখায়না, গান করে।
রিহানা বসে। গান শেখেনা, গান শোনে।
সেই ছোট ঘরটিতেই বসে ওরা। গানে আর সুরে বুঝি স্বপ্ন বোনে। স্বপ্ন নামে চোখের কোলে। চোখের মিনতিতে ঝরে পড়ে হাজার গান। তার পর গান যায় থেমে। স্তব্ধ হয় সুর। সুরের প্রতিধ্বনিটিও মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। শুধু ঘরময় ছড়িয়ে থাকে একটি সূক্ষ্ম অনুরণন। সে বুঝি ওদের হৃদয়ের স্পন্দন।
তুলতুলে নরম হাত রিহানার। কখন সে হাত উঠে আসে মালুর মুঠোয়। মালুর স্পর্শ পেয়ে যেন কথা কয়ে ওঠে আঙুলগুলো।
টনটনিয়ে ওঠে রিহানার হাতের আঙুলগুলো। কিন্তু মিষ্টি, অদ্ভুত মিষ্টি সেই ব্যথাটা। হাতটা সরিয়ে নেয়না রিহানা।
কি মনে হয় জান? চোখ তুলে বলল মালু।
কি? সুখের ভারে আধবোঝা অস্ফুট স্বর রিহানার।
মনে হয় তুমি আমার গানের মেয়ে, আমার সুরের মেয়ে।
গানের মেয়ে? আমি তোমার সুরের মেয়ে? কী এক আনন্দের ঢেউ নেচে যায় রিহানার মুখের ঔজ্জ্বল্যে। গান? সুর? সে তো অনেক আবেগ, অনেক আনন্দ, হৃদয় নিঙড়ান অনুভূতি? আমি কি তাই?
ঠিক তাই। ওর মাথার উপর হাত রাখল মালু।
জানো? বড় ভয় করে আমার। এত সুখ কি সইবে আমার কপালে? অমঙ্গল আশঙ্কায় বুঝি কেঁপে যায় রিহানার স্বর।
অমন ভাবছ কেন গো?
কী জানি। আগে কি ভেবেছি কখনো? না। এখুনি যেন মনে এল, বলে ফেললাম।
না, অমন করে ভেবনা।
ভাববো না? সত্যি বলছ তো? মালুর কাছ থেকে যেন আরো আশ্বাস চায় ও। চুপ করে কি যেন দেখে মালুর মুখের ডোলে। তারপর হঠাৎ করে শুধায়: আচ্ছা মালু, নিজেকে যখন আর ধরে রাখতে পারলাম না আমি, নির্লজ্জের মত প্রকাশ করলাম; তার আগে তুমি কখনো ভাবতে আমার কথা? যখন দেখতে প্রথম সারির কোনের চেয়ারটিতে সাধারণ একটি মেয়ে বোকার মতো ....
ও হ রে, কি রে আমার বোকা। ওকে থামিয়ে দেয় মালু। মিষ্টি করে

হাসে। নরম করে তাকায়, বলে : এক জোড়া কোমল চোখের স্নিগ্ধ আলো সারাক্ষণ ঘিরে থাকত আমায়।

সত্যি ? গ্রীবা ভঙ্গিতে বাঁকা রামধনুর অপরূপ রেখা আঁকে রিহানা। অপূর্ব ওর এই ভঙ্গিটা। ভাল লাগে মালুর।

আংটিটা খুলে খেলা করে রিহানা। মালুর কড়ে আঙুলে লাগিয়ে পরখ করে। দেখে, উল্টে পাল্টে। খুলে নিয়ে আবার গলিয়ে দেয় আপন মধ্যমায়।

ধ্যাত, বাসায় একটুও মন ভরে গল্প করা যায় না। অভিযোগটা যেন মালুর বিরুদ্ধে তেমনি করে ওর দিকে তাকায় রিহানা।

এ এসে বসল, ও এসে উঁকি মারল। আমার একটুও ভাল লাগেনা। এবার আরো স্পষ্ট রিহানার অনুযোগের স্বরটা।

ভাল যদি না লাগে, কীইবা তার প্রতিকার হতে পারে! গালে হাত দিয়ে তাই যেন ভাবে মালু। ভেবে বুঝি উপায় পায়না খুঁজে। তাই গম্ভীর হয়ে যায়।

কেমন মরদ গো তুমি? আমাকে নিয়ে যাবার মতো একটি যায়গাও নেই তোমার। সহসা যেন একটা বিদ্রূপ ঝিলিক তুলে যায় রিহানার কণ্ঠে। চমকে তাকায় মালু। রিহানার মুখে লঘু হাসির চপলতা।

রিহানাকে কি নিজের ঘরে নিয়ে যাবে মালু? ওর তো রয়েছে একখানি ঘর। একলাই থাকে ও। ওদের নিভৃত আলাপনে উঁকি দেবার মতো কেউ থাকবেনা সেখানে। কিন্তু কি এক সংকোচ আর লজ্জা এসে যেন টিপে ধরে ওর গলাটা। রিহানার অমন স্পষ্ট অভিপ্রায় সত্ত্বেও আমন্ত্রণের কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারেনা মালু।

বুঝেছি এ ব্যবস্থাটাও আমাকেই করতে হবে। কোন কম্মের নও তুমি। কী যে অকম্মাকে নিয়ে পড়লাম। কৃত্রিম অভিমান রিহানার।

একেবারেই অকম্মা। হাতে নাতেই প্রমাণিত হয়ে গেল। স্বীকার করতেই হয় মালুকে।

কিন্তু, কম্ম যা করার সে তো তুমিই করছ, প্রথম থেকেই। আমার তো শুধু গান।

হাঁ মশাই হাঁ। তোমার শুধু গানই। আমুদে গলায় এবার মালুর কথাতেই সায় দেয় রিহানা। বুঝি আশ্বস্ত করে ওকে।

বেশ, ব্যবস্থা হল, আগামী কাল দুপুরে তুমি আমায় খাওয়াচ্ছ। ওই যে নতুন রেষ্টুরেন্ট খুলেছে রমনায়, সেখানে।

রিহানার বুদ্ধি আর পরিষ্কার মাথাটার তারিফ না করে পারেনা মালু। এক মিনিটের মধ্যেই একটা চমৎকার ব্যবস্থা বের করে ফেলেছে মাথা থেকে। একটু স্বস্তিও পেল মালু। বাসার চাইতে রেস্তোঁরায় সাক্ষাৎটা বুঝি নিরাপদ।

কেবিনের আব্রুতে বসে আছে ওরা। পাশাপাশি। ধুঁয়ো ছাড়ছে কফির পেয়ালা।

কথা বলছেনা ওরা। নীরবতার মাঝে পরস্পর সান্নিধ্যটাকেই কি এক বিমুগ্ধতায় উপভোগ করে চলেছে। ওদের অনুভূতি জগতে বুঝি কোন শব্দহীন সঙ্গীতের শান্ত প্রবাহ। সুন্দর নৈকট্যে হারিয়ে যাবার মোহবিস্তার ওদের ঘিরে।

আধ বোঝা চোখ মালুর, কি এক সুখের আচ্ছন্নতায় জাবর কাটা গরুর মতো। নিঃশ্বাস টানে ও। বাতাসের সাথে রিহানার নিবিড় ঘনিষ্টতার আস্বাদ এসে ভরে দেয় বুকটা।

রি-সু। যেন দূর কোন স্বপ্নের ডাক মালুর কণ্ঠে।

দুনিয়ার যত দুষ্টুমী রিহানার মুখে। ছোট্ট হেসে সে দুষ্টুমীগুলো যেন ছড়িয়ে দেয় মালুর সারা গায়ে। একটু সরে বসে। কিন্তু আঁচলটি রেখে যায় মালুর কোলে।

হঠাৎ মুখর হয় রিহানা। ওর সুগোল ছোট ছোট হাত আর মুখের পেশীগুলো চপল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে যায়।

সে কী মজাই না হোত। ভোরে উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়তাম পত্রিকার ওপর, খুঁজতাম ক্লাব-জলসার খবরগুলো। সব সময় যে তোমার নাম থাকত তেমন নয়। কিন্তু কোন অনুষ্ঠান গানের হোক, সাহিত্যের হোক, ধরে নিতাম তুমি আসবেই। আর কি আশ্চর্য। তুমি আসতে। স্রেফ আন্দাজের উপর এসে কতদিন যে তোমায় পেয়ে গেছি। আহা, সে হিসেবটা যদি লিখে রাখতাম। তখন কি আর জানতাম নাগাল পাব তোমার··· !

নাগাল বলতে নাগাল! একেবারে হাতের মুঠোয়। ওকে থামিয়ে নিজের কথাটা বলে নিল মালু।

আহা শোননা। মালুর মাথার কয়েকটা চুল আঙুলে পেঁচিয়ে টেনে ধরে রিহানা।

বড় খারাপ তোমাদের এই পত্রিকাগুলোর স্বভাব। মা-বাপ নেই ওদের খবরের। খবর দিল অমুক তারিখে অমুক জলসা। এ দিকে তারিখটা যে পাল্টে গেল সে খবরটি ছাপাবার নাম নেই। কতদিন যে বেকুব বনেছি আমি। এই না দেখে কি ব্যবস্থা করলাম, জান?

পানির মতো কলকল করে গড়িয়ে পড়ছে রিহানার কথা। মন দিয়ে তাই শুনছে মালু। সংক্ষেপে শুধু ওর প্রশ্নটাই ফিরিয়ে দেয় ওকে; কি করলে?

সে এক মজার ব্যাপার। আমার ছিল এক চেলা, ইংরেজীতে যাকে বলে ছুজ, আমার খালাত ভাই। ওকে লাগালাম কাজে। তোমার গতিবিধির পাকা খবর ও-ই সংগ্রহ করে আনত আমার জন্য। সোজা গোয়েন্দাগিরী আর কি!

ঝর্ণাধারা যেন আপন আনন্দে বয়ে চলেছে। মালু বাধা দেয়না। কিন্তু ও ভাবে কিসের জন্য রিহানার এই প্রচ্ছন্নতার কৌতুক? হয়ত আদৌ প্রচ্ছন্ন নয় রিহানার মন। কৌতুকের রেশ নেই সেখানে। এ মন একান্তভাবেই অপরিণত, তরল রোমাণ্টিকতায় ভরপুর। সেই তরল মনের খোরাক মালু। রিহানার নিবিড় নৈকট্য শব্দহীন সঙ্গীতের মায়া। সেই মায়ায় হারিয়ে গিয়েও এ কথাগুলো মনে জাগে মালুর।

রিহানা তখন জিজ্ঞেস করছে, ব্যাপারটা খুব মজার না? বিশেষ করে কোন মেয়ের পক্ষে?

মজারই বটে। ছেলেরাই এদেশে মেয়েদের পিছু ছোটে। মেয়েরাও যে ছোটে, এদেশে এটা নতুন।

আহা ফুলে যে একেবারে ঢোল হচ্ছ: কিন্তু মশাই আমি সে কথা বলিনি। আমি বলছিলাম, ওই স্পাই লাগানোটা।

সেটা শুধু মজার নয়, রীতিমত রোমাঞ্চকর লোমহর্ষক ঘটনা। বলল মালু। যাহ্ ফাজিল, কেন ঠাট্টা করছ? মালুর গালে ছোট্ট একটা চড় বসিয়ে দিল রিহানা। চড় বসান হাতটা খপ করে ধরে ফেলল মালু। সে হাতের প্রসারিত তালুতে মুখ বিছিয়ে চোখ বুজল মালু।

কফির ঠাণ্ডা পেয়ালাটা ঠেলে দিয়ে চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়েছে রিহানা। যেমন মুখর হয়েছিল হঠাৎ, তেমনি হঠাৎই চুপ করে যায় ও।

এতক্ষণে, এই যেন প্রথম চোখ মেলে চাইল মালু। দেখল এক পিঠ ছড়ান চুল রিহানার। চুলের অবিন্যস্ত গোছাগুলো ওর মুখের চারপাশে, বুকের উপর এলো মেলো। কালো চুলের ঝালর মেলা ওর ফর্সা মুখখানির দিকে লোভীর

মত চেয়ে থাকে মালু। সে মুখ বুঝি মেঘের আলিঙ্গনে এক খণ্ড শুভ্রতা। ধীরে ধীরে মালুর হাত জোড়া এগিয়ে গেল। তুলে নিল এক মুঠো চুল। তারপর মেঘের সুতোর মতোই সেই চুলগুলোকে ছড়িয়ে দিল আপন মুখের উপর।

ঝিরঝিরে ভোরের হাওয়ার আলতো ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙ্গে মালুর।
রাতে বুঝি বৃষ্টি হয়েছিল। বাতাসে তার শৈত্য স্পর্শটা লেগে রয়েছে এখনো। মালুর ঘরের বাতাস কি এক গন্ধে আমন্থর। বুক ভরে সে গন্ধটা টেনে নিয়ে আবার চোখ বুঝল মালু। তারপর হাতখানি বাড়িয়ে দিল শিথানের দিকে। তুলে নিল সেই মিহি সুবাসের উৎসটি।
কয়েকটা শুকনো গন্ধরাজ, শুকিয়ে কেমন খরখরে হয়ে গেছে তার পাপড়ি-গুলো। আর কয়েক গাছি চুলের একটা গোল চাকতি।
বার বার ওর চুলগুলো এলোমেলা করে দিচ্ছিল মালু। মাথাটা সরিয়ে নিয়ে শুধিয়েছিল রিহানা, আমার চুলটা বুঝি খুব পছন্দ তোমার ?
খুব। মনে হয় মেঘের সুতো, নরম ভিজে ভিজে। আর অপূর্ব এক সুরভি। মাঝে মাঝে কেমন সুন্দর কথা বলে মালু। সেটাই বুঝি ভাবছিল রিহানা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল মালুর মুখের দিকে। তারপর ছিঁড়ে নিয়েছিল কয়েকখানি চুল। সুন্দর চাকতির মতো বানিয়ে গুজে দিয়েছিল মালুর পকেটে। বলেছিল, নাও, আমার সুরভিটা রইল তোমার সাথে।
আর প্রতিদিনের বিদায়ের উপহার ওই গন্ধরাজগুলো। শুকিয়ে চিমসে আর বিবর্ণ ফুলগুলো। তবু কোনটাই ফেলে দেয়নি মালু।
চুলের ছড়াটি আর গন্ধরাজের শুকনো পাপড়িগুলো নাকের কাছে ধরল মালু। আবার টেনে নিল সেই বিচিত্র সৌরভ।
হঠাৎ মনে পড়ল ওর। এ গন্ধের সাথে ওর যেন আবাল্য পরিচিতি রাণুর ঘরে ছড়িয়ে থাকত চাঁপার সুবাস। তালতলির সব বাড়িতেই যেন ভুর ভুর করত এ গন্ধটি।
সৈয়দ বাড়ির বাতাসে উড়ে বেড়াত যে ফিন ফিনে এক সুরভি, সেটা ফুলের ছিল না। বিশেষ কোন তেল বা প্রসাধনেরও নয়। সে ছিল বড় বাড়ির মেয়ে রাবু আর আরিফার বিচিত্র এক অঙ্গ সুরভি।
আশ্চর্য হয়ে যায় মালু। সেই একই সুরভি এই গন্ধরাজ মেয়টাকে ঘিরে।

ওরা একই জাতের, একই গোত্রের। বুঝি সবটাতেই অমন মিল ওদের। শিথানের চাদরটা উল্টিয়ে হাতে ধরা সুরভিগুলো রেখে দিল মালু।

চাদরটা আবার ঠিক করে রাখল। তারপর উঠে এল। হারমনিয়ামটা টেনে সুর সাধতে বসল মালু।

মুহূর্তের মাঝেই উল্লসিত এক উন্মাদনায় হারিয়ে যায় মালু। সুরের সমুদ্রে একক অবগাহনের এই মুহূর্তগুলো বুঝি পরমতঃ আনন্দ, বুঝি গোটা পৃথিবীর বিনিময়ে কিনে নেওয়া কোন দুর্লভ সম্পদ। রিহানার মুখটাও এই মুহূর্তে ম্লান আর অদৃশ্য। এই ঘরে এতক্ষণ ছড়িয়ে থাকা ওর সুরভিটুকুও মুছে গেছে। অন্য কোন জগতের অন্য এক সুরভি, অন্য এক অনুভব এসে ঘিরে নিয়েছে মালুকে। সেখানে লুপ্ত এই পৃথিবীর অস্তিত্ব, রিহানা, বেতার ভবন—সব কিছু। কিন্তু সত্যি কি হারিয়ে যায় মালু? অতি মাত্রায় সজাগ আর সতর্ক ওর তন্ত্রীর সূক্ষ্মলোক, যেখানে ওকে বিচার করতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম সুঁচের আগায় বিদ্ধ করে যেতে হয় সুর তান লয়ের সামান্যতম বিচ্যুতি। এখানেই অধ্যবসায়, ধৈর্য আর নিষ্ঠার পরীক্ষা। এখানেই আনন্দ লোকের সেই বিচিত্র সুধা। যেন একতাল মোম নিয়ে বসেছে মালু। চেপে চেপ্টে ফুলিয়ে চটকিয়ে বার বার ভেঙ্গে গড়ে মহা সৃষ্টির প্রয়াস চলেছে ওর। সৃষ্টির এই মহালগ্নে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ আর বেদনা এক সাথে মিলে মিশে কি যেন প্রলয়ের ডাক দিয়ে যায় ওর অন্তরের গভীরে। সুর থামিয়ে অকস্মাৎ নিজের দিকে তাকায় মালু। অনুভব করে অন্তরের অতলে আনন্দ-বেদনার মিশেল সেই প্রলয় মূর্চ্ছনা। অবাক হয় ও। সুরের সাধনা কি বিচিত্র পৃথিবীর সন্ধান দিয়ে গেছে ওকে। আজ সে পৃথিবীর সাথে রিহানার অস্তিত্বটাও যেন অবিভাজ্য। রিহানাকে বুঝি আর বাদ দেয়া যাবে না মালুর জীবনের কোন কিছু থেকে।

নতুন রচিত একটা স্বরলিপির উপর চোখ রেখে আবার গলা ছাড়ল মালু। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই থেমে যেতে হল ওকে। কে যেন কড়া নাড়ছে নীচে। গলা বাড়িয়ে দেখল মালু, নীচের বাসিন্দারাই খুলে দিয়েছে দরজাটা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে একটি মেয়ে। পেছনে একজন পুরুষ।

হুরমতি বুয়া?

হাঁরে ভাই আমি। চিনতে পারছিস?

ভাল করে দেখবার আগেই দুটো শীর্ণ বাহুর আলিঙ্গন টেনে নিল মালুকে। বিব্রত হল মালু। ছাড়িয়ে নিল নিজেকে।

পেছনে তাকিয়ে আরো আশ্চর্য হল মালু। ওকি! লেকু ভাই? এস এস।
ওরা বসল।
হুরমতি তো নয়, হুরমতির কংকাল। খেংরা কাঠির মতো শরীর। চিমসে যাওয়া হাতে মুখে বিশ্রী কালচে মতো দাগ। স্বাস্থ্যের সাথে সাথে রূপটিও গেছে ওর। সেই কাঁচা হলুদ রঙের ক্ষীণতম আভাটুকুও আজ খুঁজে পাওয়া যায়না ওর মুখে।
এ কেমন করে হল হুরমতি বুয়া? কিন্তু মালুর প্রশ্নটা যেন মালুকেই ব্যঙ্গ করে গেল।
আমার অসুখ। এইটুকু বলে চুপ করে গেল হুরমতি।
লেকুর দিকে তাকাল মালু। আগের চাইতে অর্দ্ধেক হয়ে গেছে ও। কিন্তু জীবন সম্পর্কে এখনো কি এক তপ্ত আগ্রহ আঁকা ওর চোখের কোণে। ওদের জিজ্ঞাসা না করেও বুঝল মালু, এই শহরেরই কোথাও ঘর পেতেছে ওরা। উজান টেনে টেনে ওরা ক্লান্ত হয়নি এখনো। কত ঘূর্ণীর আবর্তে পড়েছে। স্রোতের মোচড়ে হাড় ভেঙ্গেছে, ছিটকে পড়েছে। তবু কীসের জোরে, সবস্ব হারিয়েও, দ্বৈত জীবনের স্বর মিলিয়েছে ওরা? কে রাখে সে খবর। মালু তো ভুলে গেছিল ওদের। আজই বা সে খবর শোনবার ফুরসুত কোথায় মালুর? অথবা মনটাই তার বদলে গেছে। স্মৃতির পাতা উল্টিয়ে বিগত অধ্যায়কে স্মরণ করতে চায়না মন।
অথচ·· হুরমতি, লেকু, ওদের নিয়ে দুর্ভাবনার অন্ত ছিলনা মালুর। কিশোর দিনের কত দুঃখবোধ, কত চোখের জল ঝরিয়েছে ওদের জন্য। ওদের কেন্দ্র করেই কিশোর মনের কত আকুতি, কত নিস্ফল ক্রোধ গুমরে উঠেছিল সেদিন। আজ বুঝি তার সামান্য চিহ্নও খুঁজে পায়না মালু। আসলে সংকুচিত হয়ে এসেছে মালুর পৃথিবীটা। ইচ্ছা উদ্দেশ্য বাসনা, আহ্নিক গতির মতো ওর গোটা জীবনটাই এখন আবর্তিত হচ্ছে একটি মাত্র নির্দিষ্ট কক্ষপথে। গান—বেতার—ছাত্রী, সম্প্রতি রিহানা। জীবনটা এখন এই নির্দিষ্ট আবর্তন। স্বপ্নও বুঝি তাই। এর বাইরে কোন স্বপ্ন নেই, কোন অন্বেষণ নেই জীবনের। বাকুলিয়ার হুরমতি-লেকু ওরা আর জীবনের অংশ নয় মালুর। ওদের সাথে অনেক তফাত আজকের মালুর। তবু অতীতটাকে তো কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে পারেনি মালু! তাই ওদের কথা শুনতে হয়। ওদের বেদনায় ভার হয়ে আসে বুকটা।
হুরমতির ব্যারাম। ডাক্তার দেখাবার সামর্থ্য কোথায় লেকুর। হাসপাতালে

যদি ভর্তি করিয়ে দিতে পারে মালু, সেই আশাতেই ওর কাছে আসা। রেডিও অফিস থেকেই গত বিকেলে ঠিকানাটা সংগ্রহ করে এনেছিল লেকু।
চল। জামা পরে বেরিয়ে এল মালু। পেছনে লেকু-হুরমতি।
রিকসা চালায় লেকু। সে রিকসাতেই চড়ে বসল মালু আর হুরমতি। কত টাকা পাও? কিছু না বললে খারাপ দেখায় তাই জিজ্ঞেস করল মালু।
কত আর! কোনদিন পাঁচ। কোনদিন চার। কোনদিন আবার ছয়েও উঠে যায়। এর থেকে মালিকের ভাড়া কাটা যাবে। তিন, সাড়ে তিন। মনে মনে একটা হিসেব কষল মালু। বলল! গড়ে তা হলে সত্তর-আশি টাকা থাকে মাসে। দুজনের সংসার এতে চলে কেমন করে?
লেকুও বুঝি অবাক হল এই উদ্ভট প্রশ্নে। জবাব দিলনা।
লেকুকে ছেড়ে হুরমতির দিকেই মনযোগ দিল মালু। কি অসুখ, কবে থেকে শরীর খারাপ ইত্যাদি, সবই কেমন সৌজন্যের প্রশ্ন। নিজের কানেই বেখাপ্পা ঠেকছে মালুর।
আধময়লা একটা মিলের শাড়ি হুরমতির পরনে। কিন্তু দেহ ওর ফুলেল তেলের গন্ধ ছড়ায় এখনো। এখনো বুঝি সেই তেল ব্যবহার করে ও। যেন আচমকা ওর কপালটার উপর নজর পড়ল মালুর। উদ্ধত কপালে সেই বিদ্রোহের তিলক বুঝি শিলার লিখন, কোনদিন বিলুপ্তি নেই তার।
পুরনো ব্যাধি। জরটাতো মনে হয় টাইফয়েড। দেখে শুনে বললেন ডাক্তার।
পরিচিত ডাক্তার। মালুর অনুরোধে বিনা হয়রানিতেই ভর্তি করে নিলেন। দাওয়াইর একটি লম্বা তালিকা মালুর হাতে দিয়ে বললেন, এই ওষুধগুলো কিনে দিয়ে যাবেন।
মালুর চোখে প্রশ্ন। লক্ষ্য করে আবার বললেন ডাক্তার, আপনি তো শুধু ভর্তি করিয়েই খালাস হতে চান না! চিকিৎসা চান।
বুঝেছি। হাসল মালু।
মানিব্যাগটা খুলে কয়েকটা দশ টাকার নোট বের করল ও। টাকা আর ওষুধের তালিকাটা লেকুর হাতে দিয়ে বলল: ওষুধগুলো কিনে এই ডাক্তার সাহেবের হাতে দিয়ে যেও। বাকী টাকা রেখে দিও তোমার কাছে। রোজ কিছু ফল কিনে দেবে হুরমতিকে।
গেটের কাছে রাখা লেকুর রিক্সাটা। লেকু ডাকল: আসেন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ত্রস্তে যেন দু পা পিছিয়ে এল মালু। লেকু ওকে আপনি করে বলছে? আসবার সময় হুরমতি ছিল সাথে, তাই লেকুর রিকসায় চড়ে মনটা ওর খুঁত খুঁত করলেও কোন অপরাধ বোধ করেনি। কিন্তু এখন মনে হল মালুর, লেকুর রিকসায় জীবনে কখনো উঠতে পারবেনা ও।

নাছোড়বান্দা লেকু। রিক্সাটাকে ঘুরিয়ে একেবারে মালুর পায়ের কাছে এনে দাঁড় করায়, বলে: অল্প পথ। আর ওষুধের দোকানে ও পথেই তো যাচ্ছি আমি।

না না তুমি জলদি জলদি চলে যাও ওষুধ কিনতে। লেকুকে কোন কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে গেট ছেড়ে রাস্তার দিকে দ্রুত পা ফেলল মালু। কী এক অপরাধ বোধ যেন পেছন থেকে তাড়া করে চলেছে মালুকে! মালু বুঝতে পারেনা কি সেই অপরাধ।

ইচ্ছে থাকা সত্বেও বিকেল বেলায় একবার হাসপাতালে এসে হুরমতিকে দেখে যাবার ফুরসুতটা করে উঠতে পারে নি মালু। পর দিন বিকেলে এসে দেখা পেলনা হুরমতির।

সবার অলক্ষ্যে দুপুর বেলায় হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে হুরমতি। ডিসচার্জ সার্টিফিকেট নেয়নি। ডাক্তার নার্স কাউকে কিছু বলেনি। মালু কি আর কোন দিন খোঁজ পাবে হুরমতির?

অনেক কাজ জমে আছে অফিসে। অনেক লোক বসে আছে দেখা করবার আশায়। নতুন গায়কদের কণ্ঠ পরীক্ষা. তারাও এসে গেছে।

পরীক্ষার্থী আর দর্শনার্থীদের বিদায় দিয়ে চেয়ারটায় এসে বসল মালু। সংবিদানামাগুলোয় সই সেরে ডাকটা দেখল। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল চিঠিপত্রের উপর! এর মাঝে দুটো চিঠি রিহানার।

গুণী গো গুণী! কণ্ঠে তোমার এত সুধা, কিন্তু মনের ভেতর এত সিসে ঠেঁসে রেখেছ কেন গো? ··সারাটা দিন কেমন করে বন্দী থাক ওই হলদে পিঞ্জরায়? একবারও কি আমার কাছে ছুটে আসতে ইচ্ছে করেনা তোমার? লক্ষীটি, আজ একটু সকাল সকাল এস। আহা, বিকেলগুলোকে যদি আর একটু লম্বা করা যেতো। যায় না? ইতি।

প্রতি বিকেলটা এখন বাঁধা রিহানার জন্য। কোন দিন বা দুপুরটাও। তবু যেন তৃপ্তি আসেনা রিহানার। না-বলা থাকে অনেক কথা। তাই চিঠি লেখে ও। পাঁচ সাত লাইনের ছোট্ট চিঠি। অজস্র উচ্ছ্বাস। অসংযত আবেগ। কখনো বা অভিমান। ছেলেমানুষিই বলে মালু। তবু ভাল লাগে মালুর।

ইচ্ছে হল মালুর রিসিভারটা তুলে দুটো কথা বলুক রিহানার সাথে। কিন্তু বাড়ান হাতটা ফিরে এল ওর। সারা ঘরটা যেন চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। কি কথা বলবে ও, তাই শোনার জন্য যেন উন্মুখ ঘরের আসবাব আর ওই দুটো মানুষ, করিম, ইয়াসীন। আর ও দিকে, রিহানার বাড়িতে? সেখানেও তো ধরা পড়ে যাবে মালু।

মালুর মনে হয় গেঁয়ো শরম বোধটা এখনো ছাড়তে পারেনি ও। তাই কোনদিনই রিহানাকে টেলিফোনে ডাকতে পারেনি ও। রিহানার বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও।

এই অপারগতার কারণটা শুনে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল রিহানা। ঠাট্টা করেছিল: টেলিফোন করতে শরম লাগে, পাছে কেউ দেখে ফেলে, শুনে ফেলে। এ কোন্ ধারা প্রেমিক গো!

স্যা— বলেই জিব কাটল করিম। বলল, হুজুর—

আবার? চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকায় মালু।

কিন্তু, করিম বুঝি আজ বেপরোয়া। ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না ও। বলল করিম: স্যার না, হুজুর না, তবে বলব কি?

সত্যি তো। কি বলে সম্বোধন করবে করিম? মালু হল উপরওয়ালা। তাই সম্বোধনের শব্দটাও হতে হবে সম্মানসূচক। এ দিকটা ভেবে দেখেনি মালু।

পাশের টেবিলে ইয়াসীন। মালুর দুরবস্থাটা দেখে বুঝি ঠোঁট টিপে হাসছে ও। তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিল মালু। করিম মিঞার পা থেকে মাথা অবধি নজরটা বুলিয়ে নিয়ে বলল: কিছু না বললেই হয়।

মানে এ-ই, হে-ই এ সব তো? ওই রাস্তার যত ছোট লোকদের মতো! চটে যায় করিম মিঞা। আঠার বছর ধরে নানা অফিসে এই কাজ করে আসছে সে। কিন্তু এমন বেঢক সাহেব কথনো দেখেনি ও। এমন বেয়াক্কলে কথাও শোনেনি কখনো। বিড় বিড় করে ও দুর্ভাগ্যটার উপরই সকল দোষ চাপিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যায় করিম মিঞা।

ময়মনসিংহের আবদুল বয়াতি পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী। আসতে পারবে না জানিয়েছে। কাছে এসে জানায় ইয়াসিন।

এ্যা! তা হলে? চেয়ার থেকে বুঝি ছিটকে পড়বে মালু। একটা স্থিরিকৃত প্রোগ্রাম বানচাল হবার অর্থ যে কত ঝামেলা দিকদারী সেটা মালু বা ইয়াসীনের মত করে আর কে বুঝবে।

চটপটে বুদ্ধিমান ইয়াসীন। একটা উপায় নিজেই বের করে ফেলল ও। শুনাই বিবির দলটা এখনো ঢাকা ছাড়েনি। ওদের আর একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দিলে কেমন হয়? শ্রোতারাও পছন্দ করবে।

চমৎকার চমৎকার। খুসিতে ইয়াসীনের পিঠটা চাপড়ে দিল মালু।

রিসিপসন রুমেই তো বসে আছে ওদের লোক। ডেকে নিয়ে আসি? বলল ইয়াসীন।

যাও। এখ্খুনি।

ইয়াসীন বেরিয়ে গেল।

কাগজ-পত্রগুলো ঠেলে রাখল মালু: রিহানার চিঠিটার উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে রেখে দিল পকেটে। টেলিফোনটার দিকে চোখ পড়ল। লোভ হল। ঘরটা এখন একেবারেই খালি। রিহানাকে কি ডাকবে একবার?

ক্রিং ক্রিং, যেন মালুরই গোপন ইচ্ছায় সাড়া দিয়ে বেজে উঠল টেলিফোন। হ্যাঁ, রিহানারই গলা। হাত ঘড়িটার উপর চোখ বুলিয়ে আনল মালু। প্রত্যাশিত সময়ের কিছু আগেই আজ রিহানার ফোন এল।

হ্যা লো··। কি এক উৎকণ্ঠা রিহানার স্বরে।···তুমি কিন্তু এস না বাসায়। ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেছে। ···আচ্ছা শোন। অফিসেই তো আছ তুমি। থাকো, আমি আসছি।

কী সে ভীষণ ব্যাপার। মালু কি জানতে পারে না?

এত অস্থির হচ্ছ কেন, রিহানা? কি হয়েছে, বলনা শুনি?

না না। এখন না। আসছি···

হ্যা লো।

না। নির্জীব তার। রিহানা ছেড়ে দিয়েছে লাইন।

ধুক ধুক প্রতীক্ষায় মুহূর্তগুলো গড়িয়ে যায়।

গত রাত আর আজকের একটি বেলা। এর মাঝে এমন কি ঘটে গেল। এমন ভীষণ ব্যাপার, যে টেলিফোনে আলাপ করতে পারেনা রিহানা? মিনিটের কাঁটাটা গড়িয়ে গড়িয়ে ঘণ্টা পার করে দেয়।

আকাশ পাতাল, সম্ভব অসম্ভব ভেবে চলে মালু। কিন্তু, আসছি বলে এখনো আসছেনা কেন রিহানা? এত দেরী হবার কোন কারণ খুঁজে পায় না মালু। অবশেষে এল রিহানা।

ও কাঁপছে। ও ভয় পেয়েছে। কি এক শঙ্কা টেনে নিয়েছে ওর মুখের রক্ত। পাণ্ডুর মুখের রক্তহীন সাদা শুকনো ঠোঁট জোড়া কিছুতেই নড়তে চাইছে না।

আর ওর চরিত্রে এবং প্রকাশে যা ছিল গভীরতার স্বাক্ষর সেই মখমল চোখের স্নিগ্ধ দীপ্তিটা কারা যেন ছিনিয়ে নিয়েছে। সেখানে এখন বিহ্বল আতঙ্ক।

বাবা মা বড় ভাইয়া, সবাই জেনে ফেলেছে। কাল রাতে ওরা শাসিয়েছে আমায়। বলেছে : গান শেখা বন্ধ, বাইরে যাওয়া বন্ধ। ঘুস ঘুস পরামর্শ চলেছে ওদের রাত ভর। সকালে ওদের আখেরি সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিয়েছে—পরশুদিন আমার বিয়ে, আমার সেই খালাত ভাইয়ের সাথে।

যেন দুঃসাধ্য চেষ্টায় কথাগুলো বলল রিহানা। বলে, হাঁপাল কিছুক্ষণ। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ছোট ছোট নিঃশ্বাস টানল অনেকগুলো। তার পর বলল : আমি পালিয়ে এসেছি।

বুদ্ধিটা যখন সজাগ চিন্তাটাও তখন স্পষ্ট। মনের গতিটা যুক্তির নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু হৃদয়, শুধুমাত্র হৃদয় দিয়েই যখন বুঝতে হয়, ভাবতে হয়, অনুভব করতে হয়? তখন যুক্তির বাঁধ যায় ভেঙ্গে। দুর্বার এক আবেগের প্লাবনে ভেসে যায় মানুষের স্বাভাবিক সতর্কতা, পৃথিবীর ছোট বড় হিসেব। চল। একটা আস্তানা তো আছে আমার। একজনার যখন অসুবিধে হয় না, দুজনারও হবে না নিশ্চয়।

একটু হাসল মালু।

সে হাসির ছটা পড়ল রিহানার মুখে। ও বলল—চল।

ওরা যেন হারিয়ে রইল।

পৃথিবীর কোন অনন্ত মায়ায় লীন হল ওদের সত্তার ভেদ।

মালুর কাছে এ এক অভাবনীয় পরিপূর্ণতা। হৃদয়ে ওর আশ্চর্য আর নিটোল এক স্থিতি। সার্থকতা আর সাফল্যের আনন্দ উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে মালু। কিন্তু পরিপূর্ণতার এই শান্ত স্থিতিটা যেন সব কিছুকেই ছাড়িয়ে যায়।

ওরা ঘুরে বেড়াল।

শ্রীহট্ট, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম। উত্তরবঙ্গের গেরুয়া মাটির দেশে।

ট্রেনে চড়ল। নৌকায় করে ঘুরল। গরুর গাড়ি, মোষের গাড়িতে চড়ল। আড়াই মাস পর ফিরে এল।

কি এক আচ্ছন্নতায় রিহানা বুঝি ঘুমিয়ে থাকে সারাক্ষণ। সুখের ভারে ঘুম ঘুম আবেশে নিজেকে মেলে দেয়, রেণু রেণু ঝরিয়ে দেয় আপনাকে।

দু কোষ ভরে সে আনন্দ রেণু তুলে নেয় মালু। মিশিয়ে দেয় আপনার অস্থি পাঁজরে।

চল না ঘুরে আসি। মালুর বুকের কাছটিতে এতটুকু হয়ে বলে রিহানা। কোথায় যাবে? তার চেয়ে কি এই ভাল না? এমনি নিঃশব্দে মুখোমুখী বসে থাকা?
তা হলে চল সিনেমায়।
এত আনন্দ আর এত আলো ছড়ান এই ঘরে। সেটা ফেলে বদ্ধ ঘরে চোখ খারাপ করতে যাবে? চোখের কোলে কৌতুক খেলিয়ে বলল মালু। তারপর রিহানার ঠোঁটে চিবুকে এঁকে দিল দুরন্ত দুষ্টুমী।
যাও···নিজেকে আলগা করে শিথিল খোঁপাটা পাট করে রাখে রিহানা।
এস, গান শোন।
ওর কোলে মাথা রেখে চোখ বুজে গান শুনল রিহানা। গান শেষ হলেও ওর কোলে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ নিথর হয়ে পড়ে রইল। উঠে বসল, বলল: বাবা মার সাথে দেখা করে আসি। যাবে?
একটু যেন চমকে উঠল মালু। শুধাল: ওরা কি আমাদের গ্রহণ করবেন? তারা কি চান আমরা যাই?
মা তার মত পাল্টিয়েছেন। বিয়ে যখন করেই ফেলেছি আমরা, তিনি আমাদের মেনে নেবেন। তার ধারণা, আমরা যদি বাবার সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হই, বাবাও মেনে নেবেন।
কি করে জানলে?
আমার এক বান্ধবীর মারফত খবর পাঠিয়েছেন মা।
জানালার বাইরে ল্যাম্পপোষ্টটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মালু। কি যেন ভাবে।
চুপ করে গেলে যে? শুধাল রিহানা।
তোমার ভাইরাও তো একবার আসতে পারত।
হয়ত বাধছে ওদের মর্যাদায়।
মর্যাদা কি আমার নেই? বুঝি অসাবধানেই কড়া ঝাঁঝ ফুটল মালুর কথায়।
তা হলে যাচ্ছ না?
না।
চুপ করে যায় ওরা। নিকটের কোন বাসা থেকে ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ এক শিশুর কান্না। এক মনে সে কান্নাটাই যেন শুনে চলেছে ওরা।

এ ভাবে দিন রাত বাসায় বসে বসে আমার ভাল লাগছে না বাপু। না আছে দুটো গল্প করার লোক, না আছে একটা পরিবেশ। অনেকক্ষণ পর বলল রিহানা।

ধুপ করে কি যেন পতনের শব্দ পেল মালু ওর হৃদপিণ্ডের অতলে। সামলে নিল মুহূর্তেই। সহজ হেসে বলল: বা-রে। আমি রয়েছি সারাক্ষণ তোমার পাশে পাশে। ঘরময় আমাদের গান আর সুরের মেলা। তবু তোমার পরিবেশ লাগবে?

লাগবে না? শুধু গান নিয়েই কি বাঁচতে পারে মানুষ?

পারে না? এবারও বুঝি চমক খেল মালু। বলল: আমি তো জানতাম গানের মাঝেই তোমার অস্তিত্ব, সুরের ধারায় তোমার প্রাণ।

ভাল জিনিসটিও কি সব সময় ভাল লাগে?

তিন মাসেই কি সব বাসি হয়ে গেল?

নিরুত্তর রিহানা সুমুখের দেয়ালটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। সেখানে একটা টিকটিকি। স্থির স্ফটিক চোখ টিকটিকির। সে চোখ দিয়ে রিহানাকেই যেন দেখছে টিকটিকিটি।

হয়তো একঘেঁয়েমির ক্লান্তি এসেছে রিহানার। বাপ মা ভাইবোন আত্মীয় পরিজনদের ছেড়ে কখনো দূরে থাকেনি। তাই এই ছোট্ট পরিসরের সঙ্কুচিত জীবনে একটু বাইরের হাওয়া চায় ও। ভাবল মালু, বলল: চল, রাবু আপার বাসা থেকে বেড়িয়ে আসি। সেই কবে গেছিলাম। এর মাঝে রাবু আপা বুঝি তিন চার বার দেখে গেছে আমাদের।

টিকটিকিটা দৌড়ে পালিয়ে গেল চৌকাঠের আড়ালে। সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রিহানা। হঠাৎ মুখটা নামিয়ে মালুর চোখে চোখে তাকাল ও। বলল, উনি তোমার কেমন আপা?

কী জানতে চাইছে রিহানা? রাবুর পরিচয় পেতে গেলে মালুর গোটা জীবনটাই যে শুনতে হবে ওকে।

আর একদিন শুনে নিও, সংক্ষেপে বলল মালু।

এ কথার পর রাবুর বাসায় বেড়াতে যাবার প্রসঙ্গটা যেন আপনা আপনিই চাপা পড়ে গেল।

ওরা চুপ করে গেল।

জানালার কপাট কাঁপিয়ে এক দমকা বাতাস এল। গলির আবর্জনার গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। নাকে আঁচল চাপল রিহানা, বলল: ইস, কি দুর্গন্ধ! এখানে মানুষ থাকে? তুমি যে বাসা খুঁজছিলে কি হল তার?

খুঁজছি।

খুঁজছি নয়, জলদি কর। এই ঘিঞ্জি ঘর আর এই নোংরা পাড়ায় দম বন্ধ হয়ে মরব আমি। অনুযোগের স্বর রিহানার।

খোঁজ খবর তো কয়েক জায়গায়ই লাগিয়েছি। কিন্তু, জান তো টাকা থাকলে ঢাকার বাজারে হিমালয় পর্বতটাও কিনতে পাওয়া যায়। যা পাওয়া দুঃসাধ্য সে হল বাড়ি। আত্মপক্ষে কেমন একটা কৈফিয়তের মতো শুনাল মালুর স্বরটা।

খট খট, দুটো শব্দ হল দরজায়।

কে? নীচে এসে দরজাটা খুলে দিল মালু। রিহানাও পিছে পিছে নেমে এসে উঁকি দেয়।

ওমা। আহসান ভাই। এস এস। কী আমার সৌভাগ্য। উচ্ছ্বসিত হয় রিহানা। ফিরতি সিঁড়িগুলো ডিঙ্গিয়ে যায় তর তর করে।

আমার খালাত ভাই, আহসান। চাটগাঁয়ে খুব বড় ব্যবসা। ঢাকায়ও। পরিচয় করিয়ে দেয় রিহানা।

হয়ত নিষ্প্রয়োজন পরিচয়টা। পুরনো পরিচিতের মতই হাত মিলায় মালু। অভ্যর্থনা জানায়—বসুন।

জান, এই আহসান ভাইই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু। এর কথাই তোমাকে বলছিলাম। সেই তো তোমার সব খবর যোগাড় করে আনতো।

তিন মাস বিচ্ছিন্নতার পর আত্মীয় মানুষের সঙ্গ পেয়ে বুঝি উপচে পড়ছে রিহানা।

তোমরা গল্প কর। আমি আসছি এখ্খুনি। মালুর দিকে অপাঙ্গে একটা ইশারা ছেড়ে পাশের ছোট্ট ঘরটিতে অদৃশ্য হয়ে যায় রিহানা।

ফ্যামিলির তরফ থেকে, নিজের তরফ থেকে তো বটেই, কংগ্রাচুলেশান জানাচ্ছি আপনাকে। বিলম্বের জন্য লজ্জিত। আটকা পড়ে গেছিলাম খুলনায়। পাকা আঙুরের মতো টসটসে মুখে সপ্রতিভ হাসি ফোটায় আহসান।

ভ্রূ উঁচিয়ে তাকায় মালু।

পরিবেশ ভেদে কত তফাৎ মানুষের। রেডিও অফিসের সেই কাচুমাচু অপ্রস্তুত মুখ আগন্তুকটিকে আজকের আহসানের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমনিই বুঝি হয়। টাকা আনা পাই, যোগ আর গুণের বিরাট অংকের স্থূল হিসেবের জগতে যারা সার্থক সপ্রতিভ সেই মানুষগুলোই সূক্ষ্ম কোন কারুময় পরিবেশে কেমন বুদ্ধিহারা। সইতে পারে না সেই পরিবেশের

ধারাটা। হয়ত তাই সহজ হতে গিয়ে সেদিন হাস্যাস্পদ হয়েছিল আহসান। আর কারুময়ী এক কন্যার প্রেম পেতে গিয়ে নিজেকে করে তুলেছিল তার আজ্ঞাবহ দাস। কিন্তু নিজের পরিবেশে আর দশটি মানুষের মতোই সহজ স্বাভাবিক আহসান।

দেখুন, জীবন সম্পর্কে আমি খুব ইয়ে, মানে ইংরেজরা যাক বলে স্পোর্টস্‌ম্যান-লাইক। দৌড়ে আপনারই জিত হয়েছে। হঠাৎ গোলাকার মুখটা মালুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল আহসান। একটুক্ষণ থেমে আবার বলল, আমার হারটাকে, বলতে পারি, সাহসের সাথেই গ্রহণ করেছি আমি। আর পরাজিতের প্রতি আপনিও নিশ্চয় একটা উদার মনোভাব নেবেন, যেমন আলেকজাণ্ডার নিয়েছিল পুরুর প্রতি। কি বলেন? করমর্দনের ভঙ্গিতে মালুর দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিল আহসান। অনিচ্ছা সত্বেও প্রসারিত হল মালুর হাত।

আচমকা কেন যেন কেঁপে গেল মালু। কি এক সন্দেহ অথবা ঈর্ষা বিদ্যুতের মতো দৌড়ে গেল ওর মনের উপর দিয়ে। আহসান কি এখনো আশা রাখে?

চা আর নাশতা নিয়ে এল রিহানা।

নিন। ভদ্রতার খাতিরেই অতিথিকে পরিবেশন করল মালু। কেন যেন আলেকজাণ্ডার আর পুরুর সেই উদ্ভট উপমাটা এখনো ঘূর্ণীর মতো ঘুরে চলেছে ওর মাথায়।

আহসান ভাই, একটা ভাল বাসা খুঁজে দাওনা আমাদের! নখের চিমটের একটা কেকের কণা ভাঙতে ভাঙতে বলল রিহানা।

ভা—লো—বা—সা? কেমন করে যেন উচ্চারণ করল আহসান। তার পর গোল মুখখানা ফুটবলের মতো ফুলিয়ে পুরো গাল হাসল ও। বলল তার আর অভাব কি? আমার বাড়িটা তো খালিই পড়ে থাকে। এসে থাকনা তোমরা।

মালুর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝি সম্মতি খুঁজল রিহানা। মুখটা অন্য-দিকে ফিরিয়ে নিল মালু।

বেশ তোমার একতলাটা ছেড়ে দাও আমাদের। কত ভাড়া নেবে বল! কেন যেন গলার স্বরে অতিরিক্ত স্পষ্টতা আর জোর জুড়ে দিল রিহানা।

নিষেধের ইশারা দিল মালু। কেসে, হাত নেড়ে ওর দৃষ্টিটা আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু রিহানা উত্তরের প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রয়েছে আহসানের মুখের দিকে।

আহসান বলছে : জানি তোমাদের মর্যাদায় বাধবে, ভাড়া একটা গছাবেই আমাকে। তা, যা খুশি একটা দিও। তারপর মালুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল : তা হলে উঠে আসছেন কবে ? আগামী হপ্তায় আমাকে আবার ছুটতে হবে করাচী।

কি বলবে মালু ? রিহানাই উত্তরটা দিক। বলুক, না। ধন্যবাদ। কাতর মিনতির দৃষ্টিটা রিহানার মুখের উপর ধরে রাখল মালু।

না। রিহানা এক মনে চায়ের পেয়ালার ধুয়ো দেখে চলেছে। তারপর কিছু একটা বলার জন্য ও যেন মুখটা তুলল। কিন্তু, ততক্ষণে আহসানের দেয়াল কাঁপানো হাসিটা ছিটকে পড়েছে ওদের মাঝে।

আপনি কি বলছিলেন ? ল্যাংবোট ? হা হা হা। আর আমি কি ছিলাম, জানেন ? এন এভার অবলাইজিং স্লেভ মানে বশম্বদ গোলাম। হা হা হা। হাসির চোটে ওর টসটসে মুখের লালচে আভাটা যেন ঝিলিক খেলে গেল। মানুষের হাসি কেমন করে এত বিশ্রী, এত কদর্য হতে পারে ? গাটা বুঝি ঘিন ঘিন করে ওঠে মালুর। এখুনি মানুষের এই ইতর সংস্করণটিকে আস্তে করে তুলে জানালা গলিয়ে ফেলে দিতে পারলেই যেন স্বস্তি পেত মালু।

যাই বলুন, মেয়ে জাতটার বাহাদুরি আছে। ওরা বাঘকে ভেড়া বানায়, মানুষকে পশু বানায়, অমানুষকে আবার মানুষও বানায়। ওরা সবই পারে। ওদের অসাধ্য কিছুই নেই......বলে চলেছে আহসান।

রিহানাকেই দেখছে মালু। দেখছে ব্যথাভরা চোখের অনুযোগ মেলে, আহত বিস্ময়ে। কিন্তু সে দৃষ্টি স্পর্শ করেনা রিহানাকে।

আপনি গুণী, আপনি সাধক। আপনার কাছে হার মেনেছি বলে আমার কোন লজ্জা নেই, এ কথা কিন্তু হলফ করেই বলতে পারি মিষ্টার মালেক। হাসতে হাসতেই বলে চলেছে আহসান।

আচ্ছা আসি। হঠাৎ হাসি এবং কথা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আহসান। চায়ের জন্য ধন্যবাদ দিল। রিহানার দিকে তাকিয়ে বলল : ধুয়ে মুছে ঘরগুলো রেডি করে রাখব। যখন খুশি চলে এস তোমরা।

ভালই হল ব্যবস্থাটা। পাড়াটাও ভাল। বাড়িটাও চমৎকার। ভাড়াটা নিশ্চয় আনরিসনবেল কিছু হবেনা। আহসানকে বিদায় দিয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলল রিহানা।

শক্ত উত্তরে ফেটে পড়বার মুখেই সামলে নিল মালু। শুধু সেই অমানুষিক চেষ্টার ক্ষীণ একটি রেশ জেগে রইল ওর ঠোঁটের কুঞ্চনে।

কেমন নির্দোষ চোখ তুলে তাকায় রিহানা। সে চোখে চাঁদের হাসি, মোমের আলো।
আর সে চোখের নীচে গলে গেল মালুর দৃষ্টির ঘৃণা, মনের প্রাচীর। ওর মনের বাধা ডিঙিয়ে রিহানার ইচ্ছাটাই পথ করে নিল।

নতুন বাসায় এসে খুসির ঝর্ণায় উপচে পড়ে রিহানা, মনের মতন করে সাজায় ঘরগুলো—বসবার ঘর, শোবার ঘর, খাবার ঘর। সব ঘরেই ওর নিপুণ হাতের বিন্যাস। কার্পেটের রঙে, আসবাবে, সাজে, কুশানের আস্তরে, দেয়ালের ছবিতে ওর মার্জিত রুচির ছোঁয়া।
মনের মতন ঘর পেয়ে, সে ঘরকে মনের মতন সাজিয়ে সত্যি খুশি রিহানা। রিহানার এই খুসিকে উপেক্ষা করতে পারেনা মালু। রিহানার খুসির ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যায় মালুর মনের দ্বিধা।
সুন্দর করে সাজে রিহানা। সকালে এবং বিকেলে। গোসল করে নতুন বেশে রিহানা যখন এসে বসে সাজানো ড্রয়িং রুমে তখন ওকে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষনীয় মনে হয় মালুর। প্রলুব্ধের মত চেয়ে থাকে মালু।
মালুকে স্বীকার করতেই হয়, এই ঝকঝকে ঘরের ঔজ্জ্বল্যেই মানায় রিহানাকে। এখানে রিহানা বরবর্ণিনী নিরুপমা। ইসলামপুরের সেই পচা গলির নোংরা ঘরে কিছুতেই মানায়নি, মানতোনা ওকে। সেখানে ম্রিয়মান ছিল ওর রূপ, এমনকি ওর তন্বী দেহের আকর্ষণটাও।
কোমরে হাত দিয়ে ঘরের দেয়ালগুলো নিরীক্ষণ করে রিহানা. বলে, অল্প আলো একটুও ভাল লাগেনা আমার। আলো হবে ঝলমল উজ্জ্বল। মালুকে তাই ছুটতে হয় মিস্ত্রীর সন্ধানে। মিস্ত্রী এসে নতুন পয়েন্ট লাগিয়ে যায়, চারদেয়ালে চারটে, মাঝখানে ঝাড়।
অসম্ভব। পঁয়তাল্লিশ পাওয়ার বাল্ব চলবেনা। ওতে নিজের হাতটাই চোখে পড়বেনা তোমার। রিহানা ভ্রূ কুঁচকায়।
মালুকে আবার ছুটতে হয় দোকানে। ফরমাশ মাফিক পাল্টিয়ে আনতে হয় বাল্বগুলো। কোনটা পঁচাত্তর পাওয়ার। কোনটা এক শো পাওয়ার। আর যখন সব কটি আলো জ্বালিয়ে দিয়ে মধুর হাসির তৃপ্তি ছড়ায় রিহানা মালু তখন বোবা। মালুকে তখন মেনে নিতে হয় রিহানাই ঠিক। নিয় আলোটা

অন্ধকারের চেয়েও কুশ্রী। আলোকে হতে হবে ঝলমল উজ্জ্বল। সেই ঝলমল উজ্জ্বল আলোর রাজ্যে বুঝি রূপের রাণী রিহানা।

মুগ্ধ মালু।

ব্যবসার কাজে করাচী ঘুরে ফিরে এসেছে আহসান। বেরোবার পথে, ফেরবার পথে রিহানার ঘরে একবার উঁকি দিয়ে যায়। প্রশংসা করে রিহানার রুচির, ওর সাজানো ঘরের মনোরম স্নিগ্ধতার। নতুন পাড়ায় এসে কেন যেন সখ চেপেছে মালুর, রিহানাকে নিয়ে বেড়াবে, এখানে সেখানে, কাছে দূরে, নির্দিষ্ট কোথাও নয়।

রিহানার সখ, ওর ভাষায়, সপিংয়ের অর্থাৎ বাজার করবার। ও যায়, মালুকে নিয়েই যায়, বাজার করতে। কখনও দুপুরে যখন ভীড় থাকেনা পথে অথবা দোকানে। কখনও বা সন্ধ্যায়। কখনও রিক্সায় চড়ে, কখনও বা আহসানের ভক্স ওয়াগনে।

চলনা সিনেমায় যাই। সোহাগী স্বরে আমন্ত্রণ জানায় মালু।

সিনেমায় আপত্তি নেই রিহানার, মালুর সাথে সিনেমায় যায়। কিন্তু দশ মিনিটের বেশী সিনেমা কখনও দেখেনা রিহানা। সেলুলয়েডের গায়ে প্রতিবিম্বিত চিত্রগুলো অন্ধকারে সিনেমাহলের পর্দায় জেগে উঠতে না উঠতেই ঘুম পায় রিহানার। ও ঘুমিয়ে পড়ে। সন্ধ্যার শো বলে নয় ম্যাটিনী শোতেও দেখেছে মালু, দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে রিহানা। অগত্যা বাড়ি ফিরে আসতে হয় মালুকে। বাড়ি এসেই সজাগ রিহানা। কিছুক্ষণের অনুপস্থিতিতে কোথাও ধুলো পড়েছে এক কণা, অথবা কোন একটা টেবিল ক্লথ এলোমেলো হয়েছে বাতাসে, তাই নিয়েই কোমর বেঁধে লেগে যায় রিহানা।

নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে চেয়ে থাকে মালু। রিহানার হয়ত চোখে পড়ে। রিহানা বলে, আসলে সিনেমা আমার একটুও ভাল লাগেনা। কি ভাল লাগে? মালুর স্বরে ক্ষুব্ধ বিরক্তিটা চাপা থাকেনা।

মখমল চোখের তারায় অনুরাগ ফুটিয়ে অপরূপ হল রিহানা। মালুর প্রশ্নটাই ফিরিয়ে দিল মালুকে—কি ভাল লাগে? ভাল লাগে এই ঘর আর তোমাকে। বুঝলে? তারপর দুহাতে মালুর গলা জড়িয়ে ওর কাঁধে মুখ রাখল রিহানা। নিথর হল। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল।

মনের ক্ষুব্ধ বিরক্তিটা কখন ভেসে গেছে রিহানার সোহাগের ধারায় জানতে পারেনা মালু।

এও এক পরমাশ্চর্য অথবা ধাঁধা মালুর কাছে। সেই মধুমাসের কথা
রিহানাই তখন বায়না ধরত সিনেমা যাওয়ার।
ঘর সাজানো শেষ হয়না রিহানার। নিত্য নতুন খুঁত বের হয়। আর সে
খুঁত ঢাকতে প্রয়োজন পড়ে নতুন আসবাবের, নতুন সাজের।
জমান টাকাগুলো সে দুহাতে উড়িয়ে দিচ্ছ। ভবিষ্যতের কথাটা একবার
ভাবছ কি? ভীরু ভীরু একটা প্রতিবাদ জানায় মালু।
রাখতো তোমার কিপ্টেমী। ওকে থামিয়ে দেয় রিহানা। তারপর
অনুপম সেই চোখের হাসিতে ধুইয়ে দেয় ব্যথা পাওয়া মালুর মুখের
অন্ধকার।

তিনমাসের ছুটিটা ফুরিয়ে গেল মালুর।
সেই ঘুম ঘুম আবেশে রেণু রেণু ঝরে পড়া রিহানা, মায়া মুগ্ধতার কোল ছেড়ে
বুঝি জেগে উঠল।
জেগে উঠল ওরা দুজনই।
আচম্বিতে।
প্রচণ্ড ঝাঁকুনী খেয়ে।
হঠাৎ বিস্ফোরণে।

আপিসে এলো মালু।
প্রথমেই এগিয়ে এল করিম মিঞা। গাল ভরা তার হাসি। চোখ ভরা খুশী।
বলল, পেয়েছি।
কি পেয়েছ, শুধাল মালু।
ওই যে ডাক? স্যারওনা। হুজুরওনা, ভাই। কৃতিত্বের আনন্দে চক চকিয়ে
যায় করিম মিঞার চোখ।
ভাই? বাহ চমৎকার তো, ছোট বড় আমরা সব ভাই, তাইনা করিম মিঞা?
নতুন সম্বোধনটা খুব পছন্দ হয়ে যায় মালুর, সহকারী ইয়াসীনেরও। সেও
হাসছে মিটি মিটি।
কিন্তু, এই তিন মাস করিম কি শুধু এ কথাটাই ভেবে চলেছে? চোখে শ্রদ্ধা
ঝরিয়ে ওর দিকে তাকায় মালু।

কি ইয়াসীন সাহেব! ওপক্ষের খবর কি? করিমকে ছেড়ে এবার ইয়াসীনের দিকে মন দেয় মালু।

লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে ইয়াসীন। ফাইলের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট করে বলল, পরীক্ষা তো শুরু হয়েছে।

শুরু হয়েছে? তবে আর ভাবনা কি?

ইয়াসীনের চেয়ে মালুরই যেন বেশি ফুর্তি। চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে ও। ইয়াসীনের কাঁধে হাত রেখে বলে, মক্কার মিনার তা হলে দেখা যাচ্ছে? লাজুক হাসিতে রাঙিয়ে যায় ইয়াসীনের কালোপনা মুখখানি।

ভাই করিম। এস এদিকে। লাগাও চা মিষ্টি। করিমের হাতে দুটো টাকা তুলে দিল মালু। বলল আবার: খবর টবর রাখ কিছু? পরীক্ষা হচ্ছে তো! খবর কি আর রাখেন করিম মিঞা! ইয়াসীনের ওপক্ষের খবরটা এ আপিসের অনেকেই তো রাখে। তিন বছর ধরে ওপক্ষের সাথে ঝুলে রয়েছে ইয়াসীন। কিন্তু ওপক্ষ বড় কড়া পক্ষ। বলে রেখেছে, ম্যাট্রিক পাস না করে একটা চাকরির ব্যবস্থা না করে বিয়ে টিয়ের কথা কানেই তুলবেনা।

প্রতীক্ষার ধৈর্যে আপন অনুরাগকে লালন করে আসছে ইয়াসীন। বিগত তিনটি বছর প্রতিদিন নতুন নতুন কল্পনার রঙ ফেলে চলেছে প্রত্যাশিত সেই একটি দিনের স্বপ্নে। অবশেষে শুরু হয়েছে ম্যাট্রিক পাশের পরীক্ষাটা।

করিম মিঞাও খুশি খুশি চোখের এক ঝলক হাসি ছড়ায়। তারপর বেরিয়ে যায় মিষ্টি কিনতে।

অনেকদিন পর আপিসে এসেছে মালু। দেখা সাক্ষাৎ, এ কামরা সে কামরা গল্প করেই কাটিয়ে দিল দিনটা। একেবারে শেষ ঘণ্টায় দু একটা ফাইলের উপর চোখ বুলিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য উঠে দাঁড়াল ও, বেজে উঠল টেলিফোন। রাবু বলছে: আমি যাচ্ছি তোর বাসায়, দরকারী কথা আছে তোর সাথে। শিগগীর চলে আয়।

বাসায় এসে দেখল মালু, রাবু পৌঁছে গেছে, নতুন বাসার ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে। প্রশংসায় কলকলিয়ে তুলছে ওদের নীরব আঙ্গিনা। পাক ঘরে গিয়ে চেখে দেখছে নতুন বৌর রান্না।

মালুকে দেখে প্রশংসার তোড়াটা যেন বেড়ে যায় রাবুর। বলে, ভারি লক্ষ্মী বৌ। তোর সাত রাজার ভাগ্যি মালু, এমন বৌ পেয়েছিস্, মাথায় তুলে রাখবি। বুঝলি? তার পর সোনাবরণ হাত দিয়ে রিহানার চিবুকটা তুলে ধরে আদর করে রাবু।

গল্প গুজবে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতটাও কিছু দূর গড়িয়ে যায়। তবু দরকারী কথাটায় আসেনা রাবু।

এক সময় উঠল রাবু, যাবার আগে রিহানার হাতটা ধরে বলল : কাল রাতে আমার বাসায় তোমাদের দু জনের দাওয়াত রইল। আগে আগেই এসে পড়ো। গল্প করা যাবে। কেমন?

ওকে রিক্সায় তুলে দিতে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এল মালু।

মালু, চাকরিটা আমি ছেড়ে দিলাম, রাস্তায় নেমে বলল রাবু।

হঠাৎ? কি ব্যাপার?

ব্যাপার দেশে যাচ্ছি। কালই যাচ্ছি।

কালই? কেন? কি এক উদ্বেগ মালুর কণ্ঠে।

আব্বা ফিরে এসেছেন বাড়িতে। এই শেষ বয়সে একটু সেবা যত্ন কি তাঁর প্রাপ্য নয়?

কি তার প্রাপ্য আর কি নয়, সে আমি জানিনা। কিন্তু, তুমি কি শুধু তার সেবার জন্যই দেশে চলেছ?

জবাব না দিয়ে রিক্সায় চড়ে বসল রাবু। বলল, ও কথা বাদ দে। যে জন্য তোর কাছে আসা, মেজো ভাইকে একটা খবর দিতে পারবি?

চুপল কি যেন ভাবল রাবু, বলল আবার, না খবর নয়, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে আসবি আমার বাসায়।

কেন, মেজো ভাই বাসায় নেই?

তা হলে কি আর তোর কাছে ছুটে আসতে হত? বেঘোরে পড়ে কোথায় কথন যে মরে থাকবে লোকটা? আল্লাহ জানে।

মালু কি ভুল শুনল? না, ভুল দেখল? কেমন ভেঙ্গে ভেঙ্গে গেল রাবুর কম্পিত কণ্ঠ। চোখের কোনে দুটো মুক্তোর বিন্দু চিক চিক করে ঝরে পড়ল অকস্মাৎ।

কোন কিছু শুধাবার আগেই মালু দেখল, রাবুকে নিয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছে রিক্সাটা।

নতুন রাস্তার বিরল আলোর মিটি মিটি ছায়ায় মালুর চোখের সুমুখে ভেসে উঠল আর এক ছবি। কানে এসে বাজল অনেক কথা।

কলকাতার দাঙ্গা থেমে গেছে। মেয়েদের কলেজের সেই আশ্রয় শিবিরটা গুটানোর কাজে ব্যস্ত রাবু আর জাহেদ। গেটেই ওদের সাথে দেখা। কোন কোথা নয় এখুনি পাকড়াও কর ওকে, বলল জাহেদ।

নিশ্চয়। এখুনি। বলল রাবু।

মালুকে একরকম লুফে নিয়েই ট্রামে চড়ে বসল ওরা।

কয়েকদিন আগে বেশ বড় ধরণের একটা সাংস্কৃতিক জলসা বসেছিল পার্ক সার্কাস ময়দানে। সেখানে প্রচুর হাততালি পেয়েছে মালু। সেটাকে উপলক্ষ্য করে আজ ওকে খাওয়াবে জাহেদ এবং রাবু।

শুনলাম তোর গান। ভাল লাগল আর বুকটা কি এক গর্বে ভরে গেল। ট্রামে বসে বলল রাবু।

উত্তর না দিয়ে অপলক চোখে রাবুকেই দেখছে মালু। সেই দাঙ্গা-বিরোধী মিছিলগুলোর শেষে রাবুর মুখে যে আনন্দিত দীপ্তি দেখেছিল মালু সে দীপ্তি যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রখর হয়েছে। এখন জাহেদের সাথে রাবুও বজবজ আর গার্ডেনরীচের বস্তি এলাকায় ঘুরে বেড়ায়, মিটিং করে, বক্তৃতা দেয়। জাহেদের সব কাজের সঙ্গী ও। বুঝি সেই কর্মের আনন্দটাই আশ্চর্য এক সৌন্দর্যের ছটা হয়ে লেপে রয়েছে রাবুর মুখে। আর রাবু যেন ফিরে পেয়েছে সেই চৌদ্দ বছর বয়সের হারিয়ে যাওয়া হাসিটা।

বা-ব্বা। এদ্দিনে সেই পুরনো হাসিটি ফিরে এল মুখে, বলল মালু।

তুই এ সবের কি বুঝিসরে? কপট ধমকে ওকে থামিয়ে দেয় রাবু।

চৌরঙ্গীর কোন আধা বিলেতী আধা দেশীয় রেস্তোঁরায় একটা টেবিলে মালুর সঙ্গীত সাফল্যের উৎসব বসাল ওরা।

ওরা ফিরে গেল অতীতে, বাকুলিয়ায়, তালতলিতে। ওরা স্মরণ করল সেকান্দর মাষ্টারকে, লেকু-কসিরকে। ফেলু মিঞাকেও। ওরা চলে এল বর্তমানে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতটাকেও চোখের সামনে যতটা সম্ভব স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাইল ওরা।

আর একদিন খেতে খেতে রাবুকে যে কথাটা বলেছিল আজ এক ফাঁকে জাহেদকেও সে কথাটাই বলল মালু। বলল, মেজো ভাই, এবার বিয়েটা করে ফেল।

দেশ জুড়ে স্বাধীনতার লড়াই। এ সময় বিয়ে? ক্ষেপেছিস তুই? জাহেদ উড়িয়ে দিতে চাইল মালুর আবদারটা।

হটবার পাত্র নয় মালু। মালু বলল, এটা কোন যুক্তির কথা হলনা, মেজো ভাই।

কেন?

তুমি কি বলতে চাও তোমার বন্ধু ওই অজিতদার চেয়ে বেশি কাজ কর

তুমি? অজিতদার চেয়ে বেশি ত্যাগ তোমার? অজিতদা তো বিয়ে করেছে মালতি দি-কে। তোমার চেয়ে স্বাধীনতার লড়াই কি কম করছেন তারা? একটা হালকা কথার উত্তরে এমন গুরু-গম্ভীর কথা পাড়বে মালু, ভাবতে পারেনি জাহেদ। মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল ও। তারপরই হেসে উঠল সশব্দে। হা আল্লা! কোথায় জাহেদ, কোথায় অজিতদা। কোথায় মালতি দি আর কোথায় সৈয়েদা রাবেয়া খাতুন। ছি। সত্যি বলছি মালু, তোর মাথা খারাপ হয়েছে।

মাথা যে খারাপ হয়নি মালুর সেটা সবিস্তারে এবং সপ্রমাণে উপস্থিত করছিল মালু কিন্তু ততক্ষণে অন্য দিক থেকে এসে গেছে কঠিনতর প্রতিবাদ। রাবেয়া খাতুন কি কখনও মালতি দি-র সাথে তুলনা করেছিল নিজের? আহত, বুঝি বা অপমানিত কণ্ঠ রাবুর।

ওই দেখ আর একজন গাল ফুলিয়েছে। জোর করেই হাসল জাহেদ। বলল আবার, আরে আমি কি তুলনা করছিলাম? কথার পিঠে একটা কথা এসে পড়ল, এই তো।

মোটেই না। কথার পিঠে আসার মত কথা এটা নয়।

পাশাপাশি যারা বাস করে, এক সাথে কাজ করে তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণ, উত্তম এবং অধমের তুলনা আসবে। না আসাটাই তো অস্বাভাবিক। মালতির সাথে তুলনাতে আপত্তি নয় রাবুর। আপত্তি—যে তুলনা আমি কখনও করিনি, যেখানে আমার ক্ষুদ্রত্ব আর অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব নিয়ে আমি নিজেই বিব্রত, জীবনটাকে কিছু মাত্র অর্থপূর্ণ করে তোলার জন্য আমার চেষ্টার অন্ত নেই সেখানে কেন তুমি বারবার খোঁচা দেবে? পানিতে টলটল করছে রাবুর চোখ জোড়া। এখুনি বুঝি কেঁদে ফেলবে রাবু।

দেখেছিস মালু? মাথা শুধু তোরই খারাপ হয়নি, এই মহিলারও মাথা খারাপ হয়েছে। পরিহাসের স্বরে আবহাওয়াটাকে সহজ করতে চাইল মালু। আমি পাগল, এ কথাইতো বলবে তুমি। কোনদিন তো পারলে না আমাকে সমানের মর্যাদা দিতে। হিতোপদেশ, নীতি কথা, উপহাস, করুণা, ভালবাসার নামে অনুকম্পা এ সবই তো পেয়ে আসছি ছোট বেলা থেকে। আর কেন মেজো ভাই···জাহেদ···আমি আর সহ্য করতে পারি না···কথার দমকে দমকে দ্রুততর রাবুর বুকের ওঠানামা। মালুর মনে হয় বিশাল কোন সমুদ্রের জলরাশি এখুনি বুঝি আছড়ে পড়বে সে বুকের বাঁধ ভেঙ্গে। কেমন করে, কোন্ কথা তুলে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেবে ভেবে পায়না মালু।

থ মেরে গেছে জাহেদ। কোত্থেকে কোথায় এসে গেছে রাবু।

যেন মালুরই অনুচ্চারিত প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এসে গেল একদল ছেলেমেয়ে, রাবু এবং জাহেদেরই বন্ধু। ওরা খেতে এসেছে। যে দম্পতিকে কেন্দ্র করে এত কথা সেই অজিত এবং মালতিও আছে দলের ভেতর। মালুদের টেবিলের পাশে এসেই বসল ওরা।

তর্ক করতে করতেই ঢুকেছিল ওরা। টেবিলে এসে তর্কটা আরও তুমুল হল।

দেখে নিও নুরেমবার্গ ট্রায়ালে কিচ্ছু হবে না।

মানে? তুমি কি বলতে চাও লক্ষ কোটি নির্দোষ নর-নারীর রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত সেই নাৎসী ঘাতকদের শাস্তি হবে না?

দু চারটে চাঁইকে লোক দেখানো শাস্তি দিলেও দিতে পারে কিন্তু বেশির ভাগই পার পেয়ে যাবে। দেখছ না ইংরেজ আর মার্কিনরা ইতিমধ্যেই জার্মেনীর পশ্চিম অংশে ব্যবসা করতে লেগেছে, ওদের পিঠ চাপড়াতে শুরু করেছে?

অসম্ভব। মানুষের ইতিহাসে জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী যে হিটলার তার পাপের দোসরগুলোকে সমুচিত শাস্তি দেবেনা এমন বিচারক নেই পৃথিবীতে। পৃথিবী দেখেছে হিটলারের গ্যাস চ্যাম্বার অসউইজ, বুখেন ওয়াল্ড; পাইকারী নর হত্যা, শিশু হত্যা। এ পাপ মানুষ কখনো ক্ষমা করবে না।

সিরাজ, এ তো তোমারই মনের বাসনা। ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবটা যে কী সে তো ভারতকে দিয়েই বুঝতে পারছ। যুদ্ধের সময় মানবতার বুলি খই ফুটিয়েছে চার্চিলের মুখে। আর এখন? সোজা বলে বসল, ভারতকে স্বাধীনতা দেয়া হবে না। ইয়াল্টা চুক্তির কালি এখনো শুকোয়নি কিন্তু ইতিমধ্যেই সে চুক্তি ভঙ্গ করতে লেগেছে ওরা।

না ভাই, স্বাধীনতার কথা যদি বল তবে আমি বলল এটা আমাদেরই মোহ। গোল টেবিলে বসে স্বাধীনতা পাওয়া এ আমি বিশ্বাস করি না।

জাহেদও যোগ দিয়েছে ওদের তর্কে।

ইয়াল্টা থেকে পটুসড্যাম, জাঞ্জিবার থেকে জিব্রাল্টার, জেনী লী থেকে রুশ বীরাঙ্গনা তানিয়া, মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা—ওদের তর্কালাপের পরিধি বেড়েই চলে।

মালু আর রাবু নীরব শ্রোতা। এক সময় উঠে পড়ল ওরা। জাহেদের দিকে একবার তাকাল। ইশারায় বোঝাল জাহেদ—তোমরা যাও, আমি এখানেই আছি।

বড় অন্যায় করলাম। অহেতুক কষ্ট দিলাম তাহেদের মনে। রাস্তায় পড়ে বলল রাবু।

আমি তো অবাক হচ্ছিলাম। অমন আনন্দিত পরিবেশে সহসা নিরানন্দকে ডাকলে কেন তুমি? বুঝি উত্তরের প্রত্যাশায় রাবুর মুখের দিকে তাকাল মালু।

রাবুর চোখে থমথমে অন্ধকার। রাবুর মুখে অরুন্তুদ কোন বেদনার কান্না। মালুর নিজেরই ভ্রম হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ট্রামে ওর পাশে বসেছিল আনন্দের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময়ী যে মেয়ে সে বুঝি অন্য কেউ।

রাবু আপা, তোমার অনেক দুঃখ, মেজো ভাইয়ের অনেক কষ্ট! আমার একটুও ভাল লাগে না।

শত দুঃখেও মানুষ হাসে। বুঝি তেমনি হাসল রাবু। বলল, আমাদের দুঃখে তোর বুঝি ঘুম হয়না?

সত্যি ঘুম হয়না আমার। বিশ্বাস কর রাবু আপা।

আবারও হাসল রাবু। বলল, তুই এখনও সেই বার বছরের খোকাটিই রয়ে গেছিস। হ্যাঁরে, এখনো কি কথায় কথায় কেঁদে বুক ভাসাস তুই?

মালু বুঝল সহজ হয়ে আসছে রাবু। নীরবে রাবুর কথাগুলোই শুনে গেল ও।

আসল কথা কি জানিস? আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত আর ছোট ছোট দুঃখ কষ্টগুলোকে অযথা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় করে দেখি আমরা। আর সত্যিকার বড় বড় দুঃখ যা তোর আমার ব্যক্তিগত কষ্ট বা দুঃখ নয়, যা বিশাল মানব গোষ্ঠীরই দুঃখ সে সব হয় আমাদের স্পর্শ করে না, অথবা কিছুক্ষণের জন্য ব্যথিত হয়েও ভুলে যাই সহজে।

বুঝলাম না। বুঝবার আশায় রাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মালু।

আমার নিজের কথাটাই ধরা যাক। অল্প বয়সে, যখন আমার কোন বুদ্ধি গজায়নি, বাবার পছন্দমত বরের সাথে তিনি বিয়ে পড়িয়েছেন আমার। খুবই অন্যায়। কিন্তু এ রকম অন্যায় ঘটনা তো রোজই ঘটছে আমাদের দেশে। এর চেয়েও সহস্র গুণে কঠিন এবং নৃশংস পীড়নে ভুগছে আমাদের দেশের মেয়েরা। তাই না?

নিশ্চয়। একমত হয়ে ঘাড় নাড়ল মালু।

একটু আগে মুখে মুখে ঘুরছিল কয়েকটি নাম—মিউনিক, ডানকার্ক, লেনিনগ্রাড, প্যারি, বুখেনওয়াল্ড—এই এক একটি নামের পেছনে পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের কত ত্যাগ, কত যন্ত্রণা, কত দুঃখ। মানব জাতির এত বড়

দুঃখের পাশাপাশি আমার এই ব্যক্তিগত দুঃখটা কি তুচ্ছ আর হাস্যকর নয়?

গভীর আবেগে কম্পিত স্বর রাবুর। এক নিঃশ্বাসেই কথাগুলো বলেছিল রাবু। তারপর উদাস চোখে চেয়েছিল দূর পথের দিকে।

কলকাতায় রাবু এবং জাহেদের সাথে এটাই ছিল মালুর শেষ সাক্ষাৎ। এর কিছু দিন পর লণ্ডন আর দিল্লী থেকে যুগপৎ এক ঘোষণা প্রচারিত হয়েছিল। সে ধাক্কায় ওরা সবাই চলে এসেছিল ঢাকায়।

ঢাকায় এসে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলো তোলেনি মালু। রাবুও না। বাড়ি ছেড়ে স্কুলের শিক্ষিকার চাকুরী নিয়ে কেন আলাদা বাসা করেছে রাবু, সে প্রশ্নও শুধায়নি মালু। শুধায়নি, শিক্ষিকার খুঁটিনাটি ব্যস্ততার জীবনে কোথায় ঠাঁই দিয়েছ মেজো ভাইকে?

কিন্তু, এ কী জীবন বেছে নিচ্ছে রাবু! প্রজাপতির মতো রঙিন পাখনা উড়িয়ে কতো মেয়েই তো এই নতুন রাজধানীতে এনে দিয়েছে বর্ণের শোভা! কই, ওরা তো, তোমার মত নয়? ওদের হাসির চমকে বাতাস উৎকীর্ণ। ওদের চরণ ছোঁয়ায় মুখর শতাব্দীর ধুলো জমা এ শহরের পথ। এই শহরের নব ছন্দের গান ওদের কণ্ঠে। কই, ওরা তো তোমার মতো হাল্কা বাতাসের উড়ো পথটাকে দুঃখের কাঁটা ছড়িয়ে দুর্গম করে তোলেনি? দুর্নিবার ইচ্ছা জাগল মালুর, দৌড়ে গিয়ে প্রশ্নটা শুধিয়ে আসুক রাবুকে। দু'কদম এগিয়ে আপন মনেই হেসে উঠল মালু। রিকসাটা হয়ত এতক্ষণে রাবুকে ওর বাসায় নামিয়ে দিয়ে ছুটেছে অন্য কেরায়ার পেছনে।

সকাল সকাল হাজিরা বইতে একটা সই মেরে বেরিয়ে পড়ল মালু।

জাহেদের কয়েকটা আড্ডার খবর জানত মালু। আর চিনত তার দু একজন বন্ধুকে। সে সব আড্ডায় গেল ও। সে সব বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিল। তাদের মুখে শুনে আরো কত বাসায় পাত্তা লাগাল মালু। কিন্তু, কোথাও পাওয়া গেলনা জাহেদকে। কেউ বলল, এই তো সেদিন খেয়ে গেছে। কেউ বলল, গেছে চাটগাঁও। কেউ বা বলল শ্রীহট্টে। নির্দিষ্ট সমাচার কারো কাছেই নেই। পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়িটা শান্তিনগরে কিছু জমি আর একটা দোতলা বাড়ির সাথে বদল করেছে সৈয়দরা। কোন অর্থ হয়না সেখানে খোঁজ করার। তবু সেখানেও গেল মালু।

মালুর কপাল। সৈয়দ সাহেব অাপিসে ছুটি নিয়ে বাড়িতেই অবস্থান করছেন, এটা জানার কথা নয় ওর। আর পড়বিতো পড়, সৈয়দ সাহেবের সামনেই পড়ে গেল মালু।

প্রশ্ন শুনে তেলে বেগুনে হলেন সৈয়দ সাহেব। ওই বদমাইশটার খোঁজ নিতে এসেছ বাড়িতে? বাড়িতে তো ভদ্রলোকেরা থাকে। সে কী ভদ্রলোক? সে তো ভেগাবণ্ড, কুলি মজুর আর দুনিয়ার যত কমজাত কমবখ্‌ত্‌ ছোট লোকদের সাথে থাকে সে। সেখানে খোঁজ নাও গিয়ে।

মালু মরীয়া। যেমন করে হোক জাহেদের খোঁজ তো ওকে পেতে হবে। ও শুধাল—

কিন্তু বাড়িতে কি মাঝে মাঝেও আসেন না তিনি? শেষ কখন এসেছিলেন? বাড়ী আসবে? বাড়ি এলে ওর ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবনা আমি? জান? ওই কম্‌বখতটার জন্য আমার একটা প্রমোশন আঁটকে রয়েছে?

অধিক প্রশ্ন নিরর্থক। সিঁড়ি ধরে নেমেই যাচ্ছিল মালু। কিন্তু সিঁড়ির মাথায় ফুটফুটে একটি মেয়ে ওর ছোট্ট হাতের ইশারায় থামতে বলল মালুকে। কাছে এসে ফিসফিসিয়ে বলল, দাদী তোমাকে ডাকছে। সিঁড়ি ধরেই আবার উঠে আসছিল মালু। মেয়েটি বলল, উঁহু পেছন দিয়ে এস।

বাড়ির দক্ষিণ পাশে খিড়কি দরজা পুরোনো আমলের মত। সেই দরজা দিয়ে মেয়েটা মালুকে নিয়ে গেল ভেতরে। মালু দেখল বারান্দায় বসে সৈয়দ গিন্নী সাড়ির আঁচলে চোখ মুছছেন। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল মালু। মালুকে দেখেই অঝোর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন সৈয়দ গিন্নী। কাঁদতে কাঁদতে সৈয়দ গিন্নী যা বললেন তার সারার্থ—মাস দুই আগের কথা। হঠাৎ রাতের বেলায় এসেছিল জাহেদ। তিরিশটা টাকা চেয়ে নিয়েছিল। রুই মাছ দিয়ে প্রচুর ভাত খেয়েছিল, মনে হচ্ছিল অনেক দিন খায় নি। রাত বাড়তেই চলে গেছিল। তারপর কিছু লোক ওর খোঁজ খবর করে গেছে। সৈয়দ গিন্নীর সন্দেহ সরকারের যে দফতরের অন্যতম মাথা সৈয়দ সাহেব স্বয়ং, লোকগুলো সেই স্বরাষ্ট্র বিভাগেরই। অর্থাৎ সাদা পোষাক পুলিশ। ছেলের কোন খোঁজ পাননা সৈয়দ গিন্নী। ছেলেকে একবারটি দেখেছেন সেই দুমাস আগে। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে চলেছেন সৈয়দ গিন্নী। মালু যেন অবশ্যই তাকে খুঁজে বের করে, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেয় মায়ের কাছে।

এই প্রসঙ্গে সৈয়দ সাহেব সম্পর্কে ও নিজের অভিমতটা তিনি খোলাখুলি ব্যক্ত করলেন। বললেন, বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। উঠতে বসতে ছেলের মুণ্ডপাত

করে চলেছেন। সকাল বিকাল মুখে শুধু এক কথা প্রমোশন, প্রমোশন। প্রমোশন প্রমোশন করেই বুড়ো পাগল হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই সৈয়দ গিন্নীর।

সৈয়দ গিন্নীকে সালাম করে বিদায় নিল মালু। বারান্দাটা পার হয়েই আবার মুখোমুখি পড়ল সৈয়দ সাহেবের। আপন মনেই আপসোস করে চলেছেন সৈয়দ সাহেব, ওই কমবখ্‌ত্‌ কমজাতটার জন্যই তো! নইলে আমার দুবছরের জুনিয়ার সে উঠে যায় আমার উপরে?

বুঝি হঠাৎ চোখে পড়ে মালুকে। খেঁকিয়ে ওঠেন, এই ছোকরা! তুমি এখনো এ বাড়িতে? বের হও,।

বেরিয়ে এল মালু। চলতে চলতে ভাবল, মানুষের লোভের কি শেষ নেই? পাকিস্তানের বদৌলতে সৈয়দ সাহেব ধাঁই ধাঁই করে উপরে উঠছেন, আড়াই বছরে তিনটি পদোন্নতি পেয়েছেন। চতুর্থ পঞ্চম বা তার পরেও যদি উপরে উঠবার যায়গা থাকে সেখানে পৌছুবার সুযোগ তিনি হয়ত পাবেন একটু ধৈর্য ধরলেই। তবু কেন এত অতৃপ্তি, এত অধৈর্য সৈয়দ সাহেবের?

আরিফার ইঞ্জিনিয়র স্বামীর বাসাটা নীলক্ষেত। সেখানেও ঢুঁ মারল মালু। কিন্তু আরিফা বা তার স্বামী কাউকে পাওয়া গেলনা। আরিফার ছেলেটা বলল, সিদ্ধেশ্বরীতে আমাদের নতুন বাড়ি উঠছে, আব্বা আম্মা দেখতে গেছেন।

মালুর মনে খটকা লাগল। এই নতুন বাড়িটা গত বছরই শেষ হয়েছিল এবং ভাড়াটে বসেছিল বলে শুনেছিল মালু। তাই শুধাল ও, এ বাড়িনা শেষ হয়েছিল গেল বছর?

ধ্যাৎ আপনি কিচ্ছু জানেন না। গেল বছরেতো ধানমণ্ডির বাড়ি উঠেছিল। এ বছর উঠছে সিদ্ধেশ্বরিতে, পাশাপাশি দুটো বাড়ি।

মালুর অজ্ঞতায় ছেলেটার বুঝি কৃপা হল। কৃপা মিশিয়ে হাসল ও। বলল, জানেন? ঢাকা শহরে এই নিয়ে আমাদের চারটে বাড়ি হল। একটা আমার। একটা নস্তুর। বাকী দুটো দুবোনের। বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে লিখে দেয়া হবে ওদের নামে। আব্বা বলেছেন, এরপর যত বাড়ী হবে সব আমার নামে। আমি বড় ছেলে কিনা, তাই।

একটা আস্ত বাড়ির মালিক সে, ভবিষ্যতে আরও অনেক বাড়ির মালিক হবে, এ খবরটা মালুকে জানাতে পেরে সত্যিই খুসি ছেলেটা। ডগমগিয়ে হাসছে ও। মালুও হাসল।

মালুর হাসিতে বুঝি উৎসাহ পেল ছেলেটা। বলে চলল, কিন্তু বাবাটা একেবারেই বোকা। তিনি তো ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছেন সে-ই ক-বে। জানেন না, আর্কিটেকচার একটা আলাদা বিদ্যা। তেজগাঁর বাড়িটা বাবা নিজেই ডিজাইন করেছেন। ছিঃ। কী যে চেহারা বাড়ির! আমিও বলেছি ও বাড়ি আমি ছোঁবনা। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি?

এক্সেলেন্ট। হবে না কেন? চীফ আর্কিটেক্ট মিঃ গ্যারি···

আমি আসি। উঠে দাঁড়াল মালু। আরও অনেক বাড়িতে ঢুঁ মারতে হবে ওকে।

না না সে কী। বসুন। লাঞ্চের সময় হল। আব্বা-আম্মা তো এখুনি এসে পড়বেন। আপনি একটা কোল্ড ড্রিংক খাবেন?

মালুর সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ছেলেটা। নিজেই তশতরির উপর চড়িয়ে নিয়ে এল এক গ্লাস লেমন স্কোয়াশ।

ছেলেটা ঠিকই বলেছে। মালুর হাতের গ্লাশটা শেষ হবার আগেই এসে পড়ল আরিফা আর ওর স্বামী।

মালুর প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আরিফা। তারপর শুধাল, তুইও কি এসব করিস নাকি?

না।

খবরদার। এ সবের ধারে কাছেও যাবি না। জীবনটাই মাটি হয়ে যাবে। মালু উপদেশ শুনতে আসেনি। এসেছে কাজে। কাজের কথাটাই আবার তুলল ও, আপনি কি জানেন কোথায় পাওয়া যাবে মেজো ভাইকে? দু-চার দশদিনের ভেতর এদিকে কি এসেছিল মেজো ভাই?

কি করে আসবে! যা ডরু তোর দুলা ভাই। কেবলই বলে, আমার চাকরী যাবে, সবাই উপোস মরবে। শেষে আমিই বারণ করে দিয়েছি মেজো ভাইকে। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল আরিফা, থেমে গেল। স্যুট বদলিয়ে লুঙ্গি পরে স্বামীটি এসে বসেছে পাশে।

বাবুর্চি এসে খবর দিল খাবার দেয়া হয়েছে টেবিলে।

মালু উঠে দাঁড়াল।

আরিফা বসেই রইল। গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে ও। হঠাৎ শুধাল, রাবু কেমন আছে রে?

আশ্চর্য! আবাল্য এক সাথে যারা মানুষ হল তারা আজ পরস্পরের কোন খোঁজ রাখেনা।

জানিনা, ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল মালু।

দেখা হলে মেজো ভাইকে বলিস এ সব যেন ছেড়ে দেয়। আমি জানতাম হিন্দুরাই স্বদেশী করে। মুসলমানরা কেন স্বদেশী করবে? মুসলমানদের এসব পোষায়না। শেষ উপদেশটা দিয়ে আরিফা চলে গেল খাবার ঘরের দিকে।

আরও অনেকগুলো বাড়ি এবং আপিসে হানা দিল মালু। সর্বত্র এক জবাব, জাহেদের খবর জানেনা তারা। দুএকজন, যাদের জাহেদের সাথে একসঙ্গে ঘুরতে দেখেছে মালু, তারা জাহেদ নামের কাউকে চিনতেই অস্বীকার করল।

আশ্চর্য! একটা জ্যান্ত মানুষ এমন করে হারিয়ে যেতে পারে? তাও এই ছোট্ট শহরে? তবে কি বাইরে কোথাও আছে জাহেদ? কি করছে? কোথায় থাকছে?

হঠাৎ থানার কথা মনে পড়ল জাহেদের। পৃথিবীর যাবতীয় হারানো আর প্রাপ্তির খবর তাদের কাছে নাকি থাকে। সোজা পুলিস সাহেবের কামরায় গিয়ে হাজির হল মালু।

মালুকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল পুলিশ সাহেব। মালুর নাম এবং গানের সাথে পরিচয় আছে তার।

সব শুনে কি এক রহস্য মিশিয়ে পুলিস সাহেব হাসলেন, বললেন আমরাও হন্যে হয়ে খুঁজছি জাহেদ সাহেবকে। কিন্তু তিনি আলেয়া, এই আছেন তো এই নেই।

রহস্য অথবা হেঁয়ালী। মালু কিছুই বুঝলনা। বোকার মত চেয়ে রইল পুলিস সাহেবের মুখের দিকে।

আচ্ছা আসুন, একটা জরুরী কনফারেন্স রয়েছে আমার। আপনিও তো খুঁজছেন তাকে, যদি কোন খোঁজ পান তবে অনুগ্রহ করে জানাবেন আমাদের। পুলিশ সাহেব চলে গেলেন কনফারেন্স-কামরায়।

তবু হাল ছাড়লনা মালু। পত্রিকা অফিসগুলোতে যাতায়াত ছিল জাহেদের। সেখানে গেল মালু। কিন্তু সেখানেও এক জবাব। জাহেদের কোন খবর জানেনা তারা।

শুধু একটি আপিসে একটা লোক মালুকে টেনে নিয়ে গেল এক পাশে। কেমন ধমকের স্বরে বলল, আপনি কি ক্ষেপেছেন? এখানে খুঁজতে এসেছেন জাহেদ সাহেবকে? এই আপিসে তো গিস গিস করছে স্পাই। শীগগির চলে যান।

মালুকে এক রকম ঠেলে বের করে দিল লোকটা।

মালুর ইচ্ছে হল এই শহরের, এই দেশের সব কটি বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজবে ও। কোথায় যাবে জাহেদ? নিশ্চয় মরে যায়নি?

মালুর বিয়ের দিন। আচমকা যেন পাতাল ফুঁড়েই উঠে এসেছিল জাহেদ। বগলে ছিল রিহানার জন্য একখানা শাড়ি আর মালুর জন্য গুটিকয় বই। আজাদী তো হল, মেজো ভাই এবার একটু বিশ্রাম নাও। এক ফাঁকে বলেছিল মালু।

বিশ্রাম কিরে? এখনই তো কাজের ধুম। মালুর কথায় কি এক মজা পেয়ে খুব করে হেসেছিল জাহেদ।

নূতন বৌ নিয়ে ব্যস্ত ছিল রাবু। বুঝি শুনে ফেলেছিল জাহেদের কথাটা। দূর থেকেই বলেছিল, কাকে কি বলছিসরে মালু? তোকে, আমাকে সবাইকে স্বর্গরাজ্যে না নিয়ে তো ছাড়বে না মেজো ভাই। বিশ্রাম নেয়ার সময় কোথায় তার? রাবুর মুখে আনন্দিত কৌতুক, খুসির ছটা। কিন্তু ওর কথার মাঝে লুকানো থাকেনা প্রচ্ছন্ন কোন অভিমান, চাপা এক অনুযোগ। এই অভিমান, এই অনুযোগের যে কোন প্রতিকার নেই রাবুর চেয়ে ভাল করে এ কথাটা আর কে জানবে। তবু ওর অজ্ঞাতেই কতদিন এই অভিমান অনুযোগের আকারে ঝরে পড়েছে, মালু তার সাক্ষী। আজ চেপে ধরল মালু। এইতো মুশকিল তোমাকে নিয়ে রাবু আপা। নিটোল খুসির মাঝেও একটা প্রশ্ন ঢুকিয়ে বসে থাকবে।

এই চুপ। নওসা কথা বলে না।

মালু চুপ করে গেছিল। কিন্তু ততক্ষণে চেঁচিয়ে উঠেছিল জাহেদ, ঠিক বলেছিস মালু। ঠিক বলেছিস। আর একটু বলতো?

তারপর জাহেদের সাথে আর দেখা হয়নি মালুর।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হল মালু। কোথাও জাহেদের কোন খবর না পেয়ে হতাশ হল। দুপুরটা পার করে দিয়ে জোহরের শেষ সময় ফিরে এল বাসায়। অপেক্ষা করে করে বোধ হয় চোখের পাতায় ক্লান্তি নেমেছে রিহানার। ঘুমিয়ে পড়েছে ও।

রিহানা ওঠ। খাবেনা? জামা ছাড়তে ছাড়তে ডাকল মালু।

ঘুম জড়ান কণ্ঠে চাকরটাকে ডাকল রিহানা। মালুকে উদ্দেশ্য করে বলল, যাও খেয়ে নাও গিয়ে।

তুমি খাবেনা? অসুখ করেনিতো? উদ্বেগ ঝরল মালুর কণ্ঠে। হাত রেখে দেখল রিহানার কপালটা। না, কিছু হয়নি।

বিবি সাহেব খেয়ে নিয়েছেন। আপনার খাবার দিয়েছি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলে গেল চাকরটা।

আমি বাইরে খেয়ে এসেছিরে। তুই খেয়ে নে। ওকে জানান দিয়ে গুম হয়ে বসে রইল মালু। তার পর শুয়ে পড়ল রিহানার পাশে বিছানার খালি যায়গাটুকুতে।

এমন তো হয়নি কোনদিন? না হয় ফিরতে একটু দেরীই হয়েছে ওর! তাই বলে এমন নির্মম উদাসীনতায় ঘুমিয়ে থাকবে রিহানা?

না খেয়ে ও অপেক্ষা করে থাকুক এমন কোন অযৌক্তিক দাবী নেই মালুর। তবু খচ করে কাঁটার মত কি যেন বিঁধে যায় মনের কোণায়।

টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করত রিহানা। মালু এলেই দুজনে মিলে খেতে বসত। অভ্যস্ত হয়ে গেছিল মালু। অদ্ভুত এক মমতা লুকিয়ে থাকত ওই অপেক্ষাটুকুর মাঝে। আজ অপেক্ষা করে নেই রিহানা।

ঘুরে ঘুরে ক্ষিধে পেয়েছিল মালুর। পেটটা চনচন করছিল। সেই খালি পেটটার মাঝে কি এক অসহ্য ভার যায়গা করে নিয়েছে এখন। কোথায় উবে গেছে ক্ষিধেটা। চোখ বুঁজে পড়ে রইল ও।

রিহানার সুরভিটা নাকে এসে লাগছে। আজ গন্ধরাজ জড়িয়ে নেই ওর চুলের গুচ্ছে। তবু গন্ধরাজের সুবাস মিশিয়ে ওর চুলে যে বিচিত্র সুরভি, তার আকর্ষণের এতটুকু কমতি নেই। যেন অজানতেই মালুর মুখটা ডুবে গেল রিহানার ছড়ানো চুলের অরণ্যে।

উঠে বসল মালু। ছোট খাট সুডোল দুটো হাত রিহানার, যেন মেলে রয়েছে মধুর কোন প্রত্যাশায়। আস্তে করে সে বাহুর কোমলতায় আপন মুখের স্পর্শ রাখল মালু।

আপন মনেই হেসে উঠল মালু। ঠুনকো একটা কারণে রিহানার উপর অমন মন ভার করার অর্থ হয় কিছু?

পাক ঘরে এসে চা করল মালু। জালের আলমিরা থেকে সকালের বানান হালুয়া, কয়েকটি ফল আর বিস্কিট এনে সুন্দর করে সাজালো টেবিলটা। গ্লাসগুলো, কাপড়গুলো চাকরকে দিয়ে পরিষ্কার করে ধুইয়ে নিল। নিজ হাতে পানি মুছল, পরিপাটি করে সাজাল টেবিলটা। তারপর রিহানার কানের কাছে মুখটা এনে ডাকলো: রি—, ঘুম ভাঙলো? এস, আমি চা করেছি তোমার জন্য।

পাশ ফিরলো রিহানা।

ওর ঠোঁটে ঠোঁট জড়িয়ে আবার ডাকল মালু।

আহ্ মর। আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে। উঠে বসল রিহানা। এক রকম হিড় হিড় করে ওকে টেনে এনে চায়ের টেবিলে বসিয়ে দিল মালু।

এখনও ঘুম লেগে রয়েছে রিহানার চোখে। চোখের পাতাগুলো ডলে কচলে বুঝি ঘুমটাকে তাড়াল রিহানা। সোজা তাকাল মালুর দিকে। শুধাল, কি হয়েছে তোমার ? ক্ষেপলে কেন ?

না তো ? ক্ষেপলাম কোথায় ?

তুমি যদি ভাব খাবার সাজিয়ে হাতে পাখা নিয়ে, বউ তোমার অপেক্ষা করে থাকবে, তবে ভুল করছ।

আমি ও রকম কিছু ভাবিনা। রিহানার কথাটা শেষ হবার আগেই বলল মালু।

তোমার ইচ্ছে মতই চলবে বউ, তেমন বউ বিয়ে করনি তুমি।

জানি।

চাটা বিস্বাদ। বিস্কুটগুলো যেন লোহার ঢেলা, গলা দিয়ে গলতে চায়না কিছুতেই। নিঃশব্দে রিহানাকেই দেখছে মালু।

রিহানার মুখে বিরক্তি। রিহানার চোখে বিতৃষ্ণা।

তোমারই বা কি হল ? অমন ক্ষেপেছ কেন ? স্বাভাবিক স্বর মালুর। উত্তর দিলনা রিহানা। শুধু বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে একটি অবহেলা ছুঁড়ে মারল মালুর দিকে, টেনে নিল বিস্কিটের তশতরিটা। দাঁতের নীচে একটা বিস্কিট গুঁড়োগুঁড়ো করে ঠেলে দিল গলার দিকে। এক নিঃশ্বাসে শেষ করল পেয়ালার চা। তাকাল মালুর দিকে, যেন, শুধাল, আরও কিছু বলার আছে তোমার ?

এক রকম মরীয়া হয়েই বিস্বাদ চাটা মুখের ভেতরে ঢেলে নিল মালু, বলল তুমি তৈরী হও। আমি সে ফাঁকে গোসলটা সেরে নিই।

আমি যাচ্ছি না।

কেন ?

ভাল লাগছেনা। মাথা ধরেছে।

কিন্তু রাবু আপা যে নিজে এসে তোমায় দাওয়াত দিয়ে গেল।

দিলইবা।

না না রিহানা। দাওয়াতের কথা না হয় বাদ দাও। রাবু আপা চলে যাচ্ছে, তার সাথে একবার দেখা করব না আমরা ? অনুনয়ের স্বর মালুর।

ভারি আমার বয়ে গেছে। অশ্রদ্ধায় ঠোঁট বাঁকায় রিহানা।

আসতে পারি? অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে আহসান।

বসুন। সৌজন্যের খাতিরে একটু ঝুঁকে পাশের চেয়ারখানি দেখিয়ে দেয় মালু।

আরে সাহেব, এক বাড়িতে থেকেও আপনার দেখা পাওয়া দায় হয়ে পড়েছে দেখছি। স্বরটাকে দরাজ করে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা পায় আহসান।

চা ঢেলে পেয়ালাটি আহসানের দিকে এগিয়ে দেয় রিহানা।

আচ্ছা, আপনারা গল্প করুন। উঠে এল মালু।

মালু স্নান সারল। জামা কাপড় পরল। বার দুই ডাকল রিহানাকে। শুনেও বুঝি সাড়া দিলনা রিহানা।

পর্দাটা ঈষৎ সরিয়ে দেখল মালু, গল্প করছে ওরা। বৃথাই রিহানার দৃষ্টিটা আকর্ষণ করার চেষ্টা পেল ও।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

মালু রাস্তায় পড়ল।

ঘোরাঘুরিটাই সার হল তোর। কি আর করবি। আমার যেমন কপাল! ব্যর্থ অন্বেষণের খবরটা শুনে বলল রাবু।

সবই গোছান সারা। শুধু সুটকেসটা বাকী।

খাটের উপর ভাঁজ করে রাখা শাড়ি ব্লাউজ তোয়ালে, নিত্যকার দরকারি জিনিস। একটা একটা করে এগিয়ে দেয় মালু।

দেখা হলে বলিস মেজো ভাইকে, ওর চোখের আলো আমার পথের সম্বল। ভরা সুটকেসের ডালাটা চাপতে চাপতে বলল রাবু।

কিছু বলেনা মালু। নীরবে চেয়ে থাকে রাবুর ব্যস্ত হাতগুলোর দিকে। অনেকক্ষণ পর বলল মালু: রাবু আপা, তোমার কথাই, ঠিক। মেজো ভাইদের জন্য কিছু লোককে সারা জীবন শুধু দুঃখই পেয়ে যেতে হয়। শুধু দুঃখটাই দেখছিস? এর পেছনে যে লুকিয়ে আছে আনন্দ আর গৌরবের ফল্গুধারা সেটা দেখছিসনা? ক্লিক করে সুটকেসের ডালাটা টিপে দিল রাবু।

রাবু আপা। আমার বিয়ের সময় মেজো ভাইয়ের সাথে দেখা হয়েছিল তোমার। সেই কি শেষ দেখা?

না। তারপর সে-ই দেখা করেছিল একদিন দশ মিনিটের জন্য। কথা হয়নি।

এর মাঝে কোন চিঠিপত্র পাওনি মেজো ভাইয়ের ?

দুটো চিঠি পেয়েছি তিন ছত্রের। ভাল থেকো, আমি ভাল। ব্যস।

চাবির গোছাটা হাতব্যাগে পুরে নিল রাবু। তারপর বইয়ের ট্রাঙ্কটার উপর স্যুটকেশ রেখে তার উপর বসল রাবু।

আচ্ছা, রাবু আপা। তুমি কি শুধু দরবেশ চাচার সেবার উদ্দেশ্যেই দেশে চললে ? হঠাৎ শুধাল মালু।

তা কেন, মানুষের মাঝে মেজো ভাইয়ের কাজ। সে কাজটা যদি আমারও হয়, আপত্তি আছে তোর ?

একটুওনা। রাবুর বলার ঢঙটা দেখে ফিক করে হেসে দিল মালু।

তালতলির মেয়েদের স্কুলটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই স্কুলটাকে আবার আমি চালু করব, আমাদের বাইর বাড়ির খালি দালানটায়। আগের কথাটাকেই বুঝি আরো খোলসা করে বলল রাবু।

মালুকে বিব্রত করলনা রাবু। জিজ্ঞেস করলনা, কেন আসেনি রিহানা। হয়ত আঁচ করতে পেরেছে ও।

নিমন্ত্রণের খাবারগুলো ঢাকা রয়েছে টেবিলে।

সেদিকে তাকিয়ে বলল মালু, একটুও খেতে ইচ্ছে করছেনা, রাবু আপা। খাবিনা ? তা হলে উঠিয়ে নিক খাবারগুলো ? আমারও ক্ষিধে নেই।

ঝি এসে উঠিয়ে নিল খাবারগুলো।

গার্ডের হুইসেলটা বেজে উঠল। সবুজ নিশানটা ঘন ঘন আন্দোলিত হল।

রাবু আপা। ক্ষমা করে দিও মেজো ভাইকে। ওর হয়ে আমিই মাফ চেয়ে নিলাম তোমার কাছে। কেমন ধরে এল মালুর গলাটা।

ছিঃ! ও কথা বলিসনে মালু। মানদণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে আছে মেজো ভাই, তোর সামনে আমার সামনে সবার সামনে। সে তো বিশুদ্ধতার প্রতীক।

কেঁপে গেল ট্রেনের ইস্পাত দেহটা।

যেন চমকে চাইল মালু। বিজলীর শিখারা বুঝি চাক বেঁধেছে রাবুর চোখের তারায়। চিক চিক জোনাকীর মতো জ্বলে উঠছে ওর চোখজোড়া। কী এক জ্যোতির্ময়ীর ভাষায় কথা বলে যায় সে চোখ।

দীর্ঘ দেহী অজগরের মতো ধীর মন্থর গতিতে এঁকে বেঁকে বেরিয়ে গেল ট্রেনটা।

দিনের মতো ফুট ফুটে আলো চারিদিকে। অথচ কি এক তমিস্রার গহ্বরে যেন তলিয়ে যাচ্ছে মালু। কানে এসে বাজছে দ্রুত বিলীয়মান প্রতিধ্বনি, রেলের ইস্পাত পিঠে পিঠে ছড়িয়ে পড়া কি এক আর্তনাদ। মাথার উপরে তারা ভরা আকাশের অনন্ত বিস্তৃতির মাঝে কি যেন খুঁজল মালু।

বড় গরম প্লাটফরমে। রাস্তায় এসে বুকের বোতামগুলো খুলে দিল মালু। ভাল লাগল মালুর। নিঃশ্বাসের সাথে টেনে টেনে হাওয়া খেল। ফুসফুসটাকে ধুয়ে নিল। আর একটু চাঙ্গা হবার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাটির গেলাসে চা খেল।

বাসায় ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল মালুর। মনে মনে লজ্জিত হল। গাড়ি ছেড়ে গেছে সেই দশটায় তারপর বারটা অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কোন স্ত্রীর কাছেই এটা সন্তোষজনক কৈফিয়ত নয়। কিন্তু, কৈফিয়ত তৈরীর কষ্টটা করতে হলনা ওকে, ঘরগুলো সব অন্ধকার রিহানা নেই বাসায়।

কোন সন্ধ্যায় তো একলা বাইরে যায়নি রিহানা? তা ছাড়া এত রাত অবধি কোথায়ই বা থাকবে ও।

উপরের সাহেবের সাথে বেরিয়েছেন বিবি সাহেব। মালুর প্রশ্নের জবাবে বলল ছেলেটা।

কখন রে?

আপনি বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পর। বলে, হাই তুলল ছেলেটা। কাঁচা ঘুমেই জেগে উঠেছেও।

যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মালু, ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে ওর মুখ। কি এক অবসাদ এসে টেনে নিচ্ছে স্নায়ুর শক্তিটা। আর কত কি উঁকি দিয়ে যাচ্ছে মনের পর্দা সরিয়ে। ছিঃ একী ভাবছে ও। নিজেকে শাসায় মালু। দুটো মন ওর। শিল্পী মন, দরদী উদার। স্বামী মন, রক্ষণশীল, অধিকার কাতর। সব মনই বুঝি এমনি। এমনি দ্বিখণ্ডিত। আর দুয়ের মাঝে সংঘাত চলেছে অবিরাম।

কি বিশ্রী ইঞ্জিন, এই ভক্স ওয়াগন। সারা গায়ে ঝাঁকুনি তোলা বিকট শব্দ। হিটলার বুঝি মরে গিয়েও তার মাথাটা রেখে গেছে ওই ইঞ্জিনের ভেতর।

ভক ভক করে হঠাৎ থেমে গেল ইঞ্জিনটা। তারপর টুক করে আল্গা হল ঘরের ভেজান দরজাটা।

রিহানা এল। মালুকে দেখল কি দেখলনা। বাথরুমে গিয়ে হাতে মুখে

পানি ছিঁটিয়ে এল। দরজার ছিটকিনিটা এঁটে দিল। চুল ছাড়াল। রাতের প্রসাধন সারল। বসল খাটে। অকারণেই পা জোড়া ছুঁড়ে দিল সুমুখের দিকে। এক পাটি স্যাণ্ডেল বাথরুমের দরজায় ঠক করে শব্দ তুলে ছিঁটকে পড়ল অদূরে। তারপর শাড়ি আর ব্লাউজটা সিথানে রেখে শুয়ে পড়ল রিহানা।

শুয়েও চোখ বোজেনা রিহানা। তেরছা চোখে চেয়ে থাকে মালুর দিকে। ড্রেসিং টেবিলটার পাশে মোড়ার উপর বসে আছে মালু। সেও যেন প্রাণপণে অস্বীকার করতে চাইছে রিহানার উপস্থিতিটা।

মালুর দৃষ্টিটা উদ্দেশ্যহীন ভাবেই ঘুরে বেড়ায় এদিক ওদিক। ঘুরতে ঘুরতে আচমকা যেন ঠোক্কর খেল ওই তেরছা চোখের সাথে। তক্ষুনি সরে গেল অন্য দিকে।

শেষ শো সিনেমা দেখে এলাম। যেন দেয়ালকে উদ্দেশ্য করেই বলল রিহানা।

মাথা ধরার বাহানাটার প্রয়োজন ছিল কি?

আবার চুপচাপ।

এ এক অসহ্য নীরবতা। ঠাণ্ডা ছুরির মতো বসে যায় গায়ের মাংসে। ট্রেনে উঠে আফসোস করল রাবু আপা, যাবার আগে দেখা হলনা তোমার সাথে।

আহ্ রাখতো তোমার রাবু আপার কথা! ছিলে যার চাকর তার বাড়িতে যাও দাওয়াত খেতে, লজ্জা করেনা তোমার? আবার বউকেও সাথে নিয়ে যেতে চাও?

কী হল রিহানার? একী বলছে ও? ঘৃণা ছিঁটনো মুখের দিকে নিরুত্তরে চেয়ে রইল মালু।

বাপ নেই। মা নেই, ঘর নেই, বাড়ি নেই। পরের বাড়িতে ফায়ফরমাশ খেটে মানুষ। যাকে বিয়ে করেছ তার কাছে এই পরিচয়টা গোপন রেখেছিলে কেন, বলতে পার? রিহানার কণ্ঠ যেন বিষ ঢেলে চলেছে। চোখ ফিরিয়ে নিল মালু। ওই ঘৃণার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না ও।

সে সব তো জানতে চাওনি তুমি! স্বরটাকে শান্ত আর সংযত রাখল মালু।

ও, সেটাও আমারই অপরাধ! না? চীট কোথাকার!

প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে গোটা ঘরটাই বুঝি কেঁপে গেল। সবই অস্পষ্ট সবই ঝাপসা মালুর চোখের সুমুখে। সংযমের সেই মহাশক্তিটার দিকে হাত বাড়াল মালু। সোজা হয়ে বসল।

কোত্থেকে, কি শুনেছে রিহানা। আর তারই ভিত্তিতে স্পষ্ট একটা অভিযোগ তৈরী করে নিয়েছে মালুর বিরুদ্ধে। বুঝি মোহ ভেঙ্গেছে ওর। অনুতাপের জ্বালায় পুড়ছে ওর অন্তরটা। তাই মুক্তি খুঁজছে ও। সে কথাটা খোলসা করে কি বলতে পারেনা ও? তা না করে এ কোন্ নর্দমার কাদা ঘাঁটছে রিহানা?

বাইরে মাঝ রাতটা গড়িয়ে গেছে। শিশিরের ভার নিয়ে চুপিসাড়ে নেমে এসেছে শেষ রাত। ভেতরে অসহ্য গরম, গুমোট নীরবতা।

পাখার গতিটা বাড়িয়ে দিল মালু।

বাতিটা ওভাবে জ্বালিয়ে রাখলে আর একজনের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। দেয়ালের দিকে মুখ করে বলল রিহানা।

উঠে এসে সুইচটা টিপে দিল মালু।

এক রাশ অন্ধকার দৌড়ে এসে ঢেকে দিল ওদের নগ্নতা। সেই ভাল। আলোর চোখের নীচে জিবের পর্দা ছিঁড়ে বেআব্রু হতে রুচিতে বাধছে মালুর।

বিছানায় এসে বসল মালু। তারপর যে সন্দেহটা একমাত্র অন্ধকারেই উচ্চারণ করা যায় তাই ব্যক্ত করল ও: রিহানা, ভালবাসাটা তা হলে মোহই ছিল? সে মোহ ভেঙ্গে গেছে তোমার? মুক্তি যদি চাও সে পথে তো অন্তরায় নেই কোন?

আহ্, বকবকানী রেখে শুয়ে পড়তো! ঘুম পাচ্ছে আমার। ঝাঁঝ উড়িয়ে পাশ ফিরল রিহানা।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল রিহানা। নিঃশ্বাসের শব্দটা ভারি হয়ে আসছে ওর। একটু নাকও ডাকছে যেন।

পা তুলে খাটের মাথায় হেলান দিয়ে বসল মালু।

বাইরে শিশির ভারি বাতাসের দোল খেয়ে দুলছে পাম গাছের মাথাটা। পাম পাতার মায়া ছেড়ে টপ টপ শিশির ফোঁটা ঝরে পড়ছে মাটিতে, সে শব্দে ক্ষণে ক্ষণে যেন চমকে উঠছে মালু।

শেষ রাতের বিশীর্ণ চাঁদটা চুপি দিয়ে যায় জানালার ফাঁকে। এক চিলতে ম্লান জ্যোৎস্না নিথর অবসতায় শুয়ে রয়েছে রিহানার খোলা বুকে। প্রকৃতির মতোই নিরাবরণ শুভ্রতায় উদ্ধত রিহানার উদলা বুক।

আশ্চর্য! হঠাৎ বিস্ফোরণের তোলপাড় তুলে এখন কেমন অঘোরে ঘুমুচ্ছে রিহানা। আর কী ঠাণ্ডা ওর গাটা। ওর দিকে আর একটু সরে এল মালু।

আর একটু নিবিড়তায়, আর একটু ঘন হয়ে স্পর্শ করা যায়না রিহানাকে? রক্তে আদিমতার স্বাদ তুলে, দেহে আত্মায় লীন হয়ে, ঠিক আগের কোন রাত্রির মতো, চমৎকার একটি অনুভূতিকে রাঙিয়ে তোলা যায় না?

না।

কঠিন একটা ধাক্কা খেয়েই যেন ফিরে এল মালুর হাতখানি। গানের রাজ্যে সুরের পাখায় ভর করে উড়ে এসেছিল যে মেয়ে রিহানা, বুঝি এক রাতেই সরে গেছে অনেক দূরে। সেখানে গান নেই। প্রেম নেই।

আর একবার, আর একবার ওকে স্পর্শ করতে চাইল মালু। চাইল বুকের উষ্ণ তাপে, ভুবাহুর নির্মম পেষণে ওকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে। আশ্চর্য! মালু পারলনা। মালুর হাত সরল না। আকর্ষণের বুঝি মৃত্যু হয়েছে।

ম্লান জ্যোৎস্নাটা, রিহানার খোলা বুকের আশ্রয় ছেড়ে, আস্তে আস্তে চলে গেল ঘরের বাইরে। ফর্শা হয়ে উঠেছে পূবের আকাশটা। দূরে কোথায় কিচির মিচির করে গেল ভোরের পাখী।

হাত বাড়িয়ে তেপয় থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল মালু। একটা সিগারেট ধরিয়ে সুমুখের ভাবনাগুলোকে যেন ছাই করে দিতে চাইল ও।

স্বচ্ছ নীলিমার নীচে আদিগন্ত সবুজের বিস্তার। চোখ জুড়ায়, মন ভোলায়। দোয়েল কোয়েলের কূজনে মায়া মুখর জীবন। এ দেশের গ্রাম বলতে এমন একটি ছবিইতো আমরা ভাসিয়ে তুলি চোখের সুমুখে। পুস্তকের পাতায় এখনও আঁকা রয়েছে এমনি এক বিকৃত চিত্র।

যাকে বলি পল্লী সুর, লোক গীতিকার মিষ্টি ডাক, সেখানেও এমনি শান্ত স্নিগ্ধ কল্পনা। সে সুর কখনো বিবাগী, কখনো ললিত মুর্চ্ছনায় নিবিড়, কখনো বা একতারার একঘেয়েমিতে মন্দ মধুর, মিষ্টি। সে সুর, সে ছন্দ থেকেই তো মালুর জন্ম। তারই প্রকাশ মালুর কণ্ঠে।

তবু কি এক জিজ্ঞাসা অস্থির করে তুলেছে ওকে। বার বার মনে হয়েছে ওর, এ শুধু চর্বিত চবন—আপনার শিল্পীদীনতাকে ঢেকে রাখবার এক করুণ প্রয়াস। এ যেন সেই ফেলু মিঞার মতো শুধু অতীতকে, লুপ্ত গৌরবকে সম্বল করে বাঁচার চেষ্টা। দুনিয়ার সুমুখে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলা।

ছোট বেলার বাকুলিয়া তালতলি। নৌকো করে গাঁয়ের পর গাঁ ঘুরে বেড়ান, গনি বয়াতির দল নিয়ে। তার পর বিচিত্র সেই মহানগরের আজব জীবন।

তর তর করে বয়ে যাওয়া কোন শান্ত ধারা নয়, এ এক বিচিত্র সংঘাত ক্ষুব্ধ জীবন। এ জীবনটাই যেন আজ তার সমস্ত দাবী নিয়ে উঠে এসেছে মালুর সুমুখে। মালুর কণ্ঠে সে চায় প্রকাশ।

বুঝি তাই ললিত রাগিণীতে রুদ্র ভৈরবীর ঝংকার চালল মালু। মিষ্টি এক তারায় তুলল ঝড়ের বোল। শীর্ণ স্রোতার মন্দ ছন্দে হেলে দুলে চলেনা এ সুর। এ যেন পাহাড়ি ঝর্ণা, অজস্র ধারার উদ্দাম বেগে দুকুল ভাসিয়ে তার তৃপ্তি।

আর কি আশ্চর্য! মালুর হাত গেছে খুলে। ছোট বেলায় মুখে মুখে ছড়া কেটেছে, গান বানিয়েছে মালু। কিন্তু সে ছড়া বা গান গুলোকেই লিখে ফেলা যায় কালির অক্ষরে এ কথা ভাবেনি মালু। এমন কোন ইচ্ছেও কোন দিন জাগেনি ওর মনে। কিন্তু আজ যখন ঝড়ো হাওয়ার মাতন জেগেছে মনে তখন সব কিছু যেমন সুর হয়ে বাজতে চায় তেমনি কথা হয়ে ফুটতে চায়।

মালু গান লেখে। কাটে। আবার লেখে। আবার কাটে!

মালু জানেনা ওর মনের ঝড় ফুটে উঠবে কোন অক্ষরের অবয়বে।

মালু জানেনা ওর ভক্ত শ্রোতারা কেমন ভাবে গ্রহণ করবে ওর নতুন সুর। দ্বিধা সন্দেহ মালুর নিজের মনেও।

কিছুদিন আগে এক জলসায় ওর এই নতুন গান নতুন সুরে গেয়েছিল মালু। রিহানা তখন রিহানা ছিলনা, ছিল কথা-না-কওয়া নীরব দৃষ্টির মেয়ে। সেদিন রিহানার বিস্ফারিত চোখে মালু দেখেছিল অজানার আতঙ্ক। শ্রোতারা ছিল স্তব্ধ নির্বাক।

হয়ত ওরা বোঝেনি। হয়ত ভালই লাগেনি ওদের। শুধু উদ্যোক্তাদের ভেতর একজন বলছিল পেছন থেকে, না, এটা জমলনা।

বিরোধীতার পরোয়া করেনা মালু, করবেও না। শুধু···শুধু, ও যদি বুঝত, স্পষ্ট করে বুঝত, কোন্ তারে, কোন্ যন্ত্রে ও প্রকাশ করবে এই নতুন সুর। নেকাব চিকের আড়ালে রূপসীর হাতছানি, পূর্ণরূপ যে তার এখনো অনুদ্‌ঘাটিত মালুর দৃষ্টির সুমুখে।

অবসর ছিনিয়ে গলা সাধতে বসে মালু। নিজের কথাটা ব্যক্ত হবে নিজেরই সুরে সেও যে এত বড় দুর্ঘট, তা কি জানত মালু? পরীক্ষা নিরীক্ষায় শ্রান্তি নেই ওর।

সুর তান লয়, সবই মিলল। কিন্তু কথায় রয়ে গেল কি এক জড়িমা, কি এক

বেসুর। তারপর হয়ত কথার ব্যঞ্জনায় সুর গেল বদলে। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সবটাই আবার নতুন করে ধরতে হয় মালুকে। মনের কথাটাকে সাজাতে হয় নতুন কোন ছন্দে। যে ছন্দে সুর তাল মিশ খেলে সৃষ্টি হয় ঐক্য, ঐক্যের ঝংকার। কথায় আর সুরে, অনুভূতি আর ধ্বনিতে এই সাম্য, এই ঐক্যই বুঝি সকল সঙ্গীতের উৎস।

মালু খোঁজে সংঘাত-ক্ষুব্ধ জীবনে সেই ঐক্যের সুরকে। নিঃশব্দে সুমুখে এসে বসে রিহানা। ওর মখমল চোখের নরম আলোতে কত আশ্বাস, কত ভরসা। গা আর চুল থেকে ও ছড়িয়ে দেয় সেই গন্ধরাজ মিশেল সুরভি। সুরলোকে হারিয়ে গিয়েও যেন জেগে থাকে মালু শুধু ওই অনন্যা চোখের আলোকটুকুর জন্য, সুধার মতো ওই সুরভিটুকুর জন্য।

রিহানার উপস্থিতি আরাধনার সামান্য ফাঁকিটুকুও যেন ভরাট করে দেয়। সুরের অমিল আর অনৈক্যের মাঝে এনে দেয় সুন্দর এক ঐক্যের সংগতি। অবাক হয়ে মালু ভেবেছে কেমন করে এক হয়ে গেছে ওর গান আর ওর প্রেম।

আজ এলনা রিহানা।

কয়েকদিন ধরেই গানের সময় কাছে এসে বসেনা ও। গান বুঝি আর ভাল লাগেনা ওর। বিরক্তি ধরে গেছে গানে।

তাই বলে শূন্য থাকেনা সুরের পৃথিবীটা। চারিদিকে সুরের বৃত্ত রচনা করে তারই মাঝে ডুবে যায় মালু। যতক্ষণ ঘরে থাকে এমনি এক নিরাপত্তার ব্যূহ তৈরী করে আপনাকে রক্ষা করে চলে মালু।

কিন্তু রিহানা বুঝি ধরে ফেলেছে মালুর ফাঁকিটা। ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয় ওর নাজুক ব্যূহের দুর্বল প্রতিরোধটা।

প্রথম ঢিল: ধোপার হিসেবটা একটু মিলিয়ে দেখতো। ব্যাটা এন্তার ঠকিয়ে চলেছে। সাথে সাথে হিসেবের খাতাটাও মালুর দিকে ছুঁড়ে দেয় রিহানা।

খাতাটা এক পাশে সরিয়ে রেখে বেহালার তারে ছড় টানে মালু।

রিহানা চলে যায় পাক ঘরের দিকে। নাশতার তদারকটা সেরে এসে ছুঁড়ে দেয় দ্বিতীয় ঢিল: আর পারি না। কত দিন ধরে বলছি ভাল একটা বাবুর্চি দেখ, এই ছোকরাকে বিদায় দাও। না শোনে কথা। না করে কাম, আলসের হাঁড়ি।

বেহালাটা ফেলে হারমোনিয়ামটা টেনে নেয় মালু।

তৃতীয় ঢিল : 'এশিয়া ফার্নিচার' স্রেফ জুচ্চোরী করেছে। সদ্য কেনা চেয়ার, এখনি বেঁকে গেছে হাতল। ব্যাটাদের আজই একটা খবর দিও মনে করে।

চুলটাকে পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বিহানা চলে যায় স্নান করতে। আজ যেন যেতে না যেতেই সারা হয়ে যায় স্নানটা।

চতুর্থ ঢিল : এ মাসে বাজারের টাকা কম দিয়েছিলে, খেয়াল আছে? আজ টাকা লাগবে।

ইশারায় আলনায় ঝোলান পাঞ্জাবীটা দেখিয়ে দিয়ে নিস্তার পেতে চায় মালু। কিন্তু, তারটা যে ছিঁড়ে গেল। কেটে গেল তাল। সুর উঠবে কেমন করে? টাকার কথায় আরো কথা মনে পড়ে গেল মালুর। ছেড়ে দিল হারমোনিয়ামের হাওয়াটা। রিডের ওপর তুলে দিল ঢাকনাটা। তারপর শুধাল : আচ্ছা, রাবু আপার টাকাগুলো কি তোমার কাছে রেখেছিলাম?

সে তো খরচ হয়ে গেছে। তুমিই তো খরচ করলে।

আমি খরচ করেছি? চকিতে যেন অবিশ্বাস দৌড়ে গেল মালুর চোখে। নিশ্চয় আমি চুরি করিনি? অথবা গোপনে পাচার করিনি বাপের বাড়ি? গানের গলা না থাক বাপের আমার টাকার অভাব নেই।

আহা, তাই কি বললাম আমি! মনে পড়ছিল না কি না··

তাই বৌর উপর একটু সন্দেহ হল মাত্র। বেশী কিছু না! জিবটা যেন বিদ্রূপে নেচে যায় বিহানার।

যেন স্থূল কথার ভোঁতা দা'। সামান্য একটু তীক্ষ্ণতাও নেই। সেই ভোঁতা দা'র নির্দয় আঘাতে সুমুখের মানুষটাকে বুঝি কেটে ছিঁড়ে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চায় বিহানা।

ভাবনায় পড়ে যায় মালু :

দুটিশ নয়, চারশিও নয়। পাঁচশো টাকা।

টাকাগুলো রাবুর। বিয়ের পর সেই খরচার মওসুম। টাকাগুলো মালুর হাতে দিয়ে বলেছিল রাবু : আমার পাশ বইটা জমা পড়ে আছে ব্যাঙ্কে। এত টাকা সঙ্গে রাখতে চাই না। তোর কাছেই রাখ। দরকার পড়লে খরচ করিস।

এত কথার প্রয়োজন ছিল না। ওকে সাহায্য করতে চায় রাবু; নিঃশব্দ কৃতজ্ঞতায় গ্রহণ করেছিল মালু। ফিরিয়ে দেবার কথাটা এতদিনে মনে হয়নি মালুর। কিন্তু দেশে গেরামে কত বিপদ আপদ! দরকারের সময় কোথায় হাত পাতবে রাবু!

মালুর মনে পড়ল, বিয়ের দুদিন পরেই খরচা টরচা গিয়েও যে হাজার দুই টাকা ছিল হাতে সেটা দিয়ে রিহানার নামে একটা সেভিংস একাউন্ট খুলেছিল।

রিহানা, তোমার সেভিংস একাউন্টে কত টাকা আছে? নরম করেই শুধাল মালু।

সেভিংস একাউন্ট? যেন শব্দ দুটো জীবনে এই প্রথম শুনছে রিহানা। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেছে তেমনি এক ঢংয়ে ভ্রু কুঁচকে বলল: ও, হ্যাঁ। গোটা পনের মানে একাউন্টটা খোলা রাখার মতো টাকা রয়েছে বোধ হয়।

তা হলে? রাবু আপার টাকাটা শুধবো কোত্থেকে? কি এক অসহায়তায় যেন নিজকেই শুধাল মালু।

তা হলে আমি একটা চাকরি নিই? নতুবা বাপের বাড়ি থেকে চেয়ে আনি? মালুর গালে ঠাস করে যেন দুটো চড় বসিয়ে দিল রিহানা।

ওহ্ রিহানা। তুমি অসহ্য। কেন বারবার তোমার বাপের খোঁটা দিচ্ছ। টাকা আছে তার অঢেল, সে আমি জানি। আর আবগারী কর্তারা কেমন করে টাকা বানায় সেওতো কারো অজানা নয়?

ও, আমি অসহ্য? প্রথম উক্তিটাকেই তুলে নেয় রিহানা। কি এক হিংস্রতার তলোয়ার হয়ে চেয়ে থাকে মালুর দিকে।

মখমলের মতো নরম যে চোখ, যে চোখ ছড়িয়ে দিত স্নিগ্ধ আলোর দ্যুতি, এমন ভয়ংকর আর বীভৎস হতে পারে সে চোখের দৃষ্টিটা?

কোথাও যেন একটু আশ্রয় চাইল মালু। হাত বাড়াল আপন অন্তরের স্থৈর্য আর আত্মসংবরণের সেই শক্তিটির দিকে। নির্বাক হল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল সদর রাস্তায়।

ইয়াসিন, কিছু টাকা ধার দিতে পার? এ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে অবলীলায় হাত পাতল মালু।

মালেক সাহেবকে বরাবর টাকা ধার দিতেই দেখেছে ইয়াসিন, চাইতে দেখেনি। তাই বিস্ময়ের সুঁচ হয়ে যেন বাতাসের সাথেই গেঁথে রইল ও। তারপর গলা নামিয়ে শুধাল, কত লাগবে?

এই ধর, পাচ শো।

পাঁ—চ—শো?

এক আধ শো কম হলেও চলে যাবে। আশার আলো দেখে চাহিদাটা একটু নিল মালু!

তিন শো দিতে পারব। এখুনি চাই?

না। কাল পেলেও অসুবিধে হবে না।

ঠিক মাথার উপরকার এই সায়েবটির কাছে থেকে প্রশ্রয় আর স্নেহ পেতেই অভ্যস্ত ইয়াসিন। কিন্তু সেও যে দিতে পারে, খুসি করতে পারে সেই মানুষটিকে যে কখনো হাত পাতে না কারু কাছে, এটা বুঝি ইয়াসিনের জীবনে একটা অভাবনীয় আনন্দ অভিজ্ঞতা। খুসি হয়ে ওঠে ইয়াসিন। কিন্তু, তুমি যে দিচ্ছ, সামনে তো তোমার খরচার সময়। হঠাৎ শুধাল মালু।

আরো ভাল হল। জমা রইল আপনার কাছে। ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে চেয়ে নেব?

আর একজনও এমনি ধরণের কথা বলেই সাহায্য করেছিল মালুকে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তার কখনো আসবে না, কখনো ফেরত চাইবে না ও। এটা ভাল করেই জানে মালু। তাই বলে মালুর কর্তব্যে বিচ্যুতি ঘটবে কেন।

সকাল থেকে যে ভারটা চেপেছিল বুকের উপর ইয়াসিন যেন সে ভারটা নামিয়ে অনেক হাল্কা করে দিল মালুকে।

তারিখ ঠিক করলাম। বলেই যেন টেবিলটার সাথে মিশে গেল ইয়াসিন।

তাই নাকি? কবে? চেয়ার ছেড়ে ওর দিকে এগিয়ে এল মালু।

পয়লা আশ্বিন। টেবিল থেকে মুখ না তুলেই বলল ইয়াসিন।

আশ্বিনের সোনাঝরা লগ্ন? বাহ্, চমৎকার দিন তো? বুঝি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে মালু।

কিন্তু? ইতস্ততঃ ইয়াসিন।

কিন্তু কি, ইয়াসিন?

ঘর যে এখনো পেলাম না* বৌকে তো আর মেসে রাখা যায় না!

সত্যি তো, বৌ কি আর মেসে থাকতে পারে? অনেকদিন পর গলা ছেড়ে হাসল মালু। হাসি থামিয়ে যেন কৈফিয়ত চেয়ে বসল, বাসা পাচ্ছ না, এ্যাদ্দিন বলনি কেন।

এ আর বলবার মতো কথা কি! পকেটে টাকা নিয়ে ঢাকার যত অলিগলি চষে বেড়াচ্ছি। কিন্তু ঘর কোথায়? ঘর থাকলে তো লোকে ভাড়া দেবে? ঘর না পাওয়ার পক্ষেই যেন একটা যুক্তি খাড়া করতে চাইছে ইয়াসিন।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা চাবি বের করল মালু। চাবিটা পকেটে ছেড়ে দিয়ে বলল, হয়েছে, ওঠ এবার।

রিক্সায় চড়ে বসল ওরা।

ওর একটা চাকরিও হয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলে। শিক্ষিকা, বলল ইয়াসিন।

তবে তো সোনায় সোহাগা। পরীক্ষার ফল না বেরুতেই চাকরি?

ইয়াসিনের পিঠে একটা খুসির থাপ্পড় বসিয়ে দিল মালু।

ফল বেরুতে এখনো হপ্তা দুই দেরি। তবে প্রাইভেটলি জেনে নিয়েছি আমি। ও পাশ করেছে, সেকেণ্ড ডিভিসনে।

এ্যাঁ, তুমি কি রকম লোক হে। এতগুলো ভাল খবর পেটের ভেতর লুকিয়ে রেখেছ? এখন বুঝছি কেমন করে পয়লা আশ্বিন এত জলদি এসে গেল।

সত্যি যেন অন্যায় হয়েছে তেমনি করে মুখ নামিয়ে হাসে ইয়াসিন। বাসাটা পেয়ে মহা খুসি ইয়াসিন। এটা ওর কল্পনার অতীত ছিল। দোতলার খোলা মেলা ঘর। বিজলী বাতি। কলের পানি, পাক ঘর। তার উপর রীতিমত সস্তা ভাড়া। আজকের এই স্বার্থপর ঢাকায় কে কার জন্য এতটা করে!

ঝেড়ে মুছে সাফ করে রাখ। বলল মালু। চাবিটা গুঁজে দিল ইয়াসিনের হাতে। আপনি বাসাটা রেখে দিয়েছিলেন কেন? সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুধাল ইয়াসিন।

যদি কখনো কাজে লাগে। এই তো কেমন চমৎকার কাজে লেগে গেল? মালু হাসল।

ইয়াসিনও হাসল। ওর কাছে বাসাটা না চাইতে পাওয়া আকাশের চাঁদ। জান ইয়াসিন? তোমাদের এই প্রতীক্ষাটি ভারি সুন্দর। আমার খুব ভাল লাগে তোমাদের কথা ভাবতে। হঠাৎ গলাটাকে কি এক আবেগে কোমল করে বলল মালু।

প্রসঙ্গটা এলেই লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে ইয়াসিন। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে দোকানের সাইনবোর্ড গুলোর উপর মন দিল ও।

সত্যি বুঝি ভাল লাগে মালুর। নির্বাচিতাকে, স্বপ্নের রাণীকে স্বচ্ছলতার প্রশস্ত অঙ্গনে বরণ করে নেবে বলে মাসের পর মাস টাকা জমিয়ে চলেছে ইয়াসিন— সেই কবে থেকে। আর যে স্বয়ম্বর মালা হাতে। বন্ধনের সাথে সাথে আশ্বাসও দিতে চায়। দিতে চায় অর্ধেক রাজত্ব। তাই পরম সহিষ্ণুতায় তৈরী করেছে নিজেকে, নিজের আয়ের পথটা নিশ্চিত করেছে। শুধু সুধাটুকু বুঝি

নিতে চায় না সে মেয়ে। যা ভার, যা দায় তাও ভাগ করে নেবে আধাআধি বিঘ্নমুক্ত হোক, সার্থক হোক ওদের আশ্বিনের লগ্ন। মনে মনে কামনা করল মালু।

আজ তুমি আমার সাথে খাবে।

একটা রেষ্টুরেন্টের সামনে রিক্সা থেকে নেমে পড়ল ওরা।

পদে পদে আজ অপ্রস্তুত ইয়াসিন। ওর ঠিক মাথার উপরের কর্তাটি, ফাইলের ভেতর আর গানের চিন্তায় যে ডুবে থাকে অষ্টপ্রহর, সে মানুষটি আজ কেমন গা ছেড়ে দিয়েছে।

দুপুরটা আর এই অপরাহ্নটা আজ এত ভাল লাগছে কেন মালুর? যা পাওয়া গেলনা নিজের জীবনে সেটাই স্নেহাস্পদ কারো জীবনে সার্থক হতে দেখলে এমনি ভাল লাগে বুঝি! অথবা এ এক ধরণের ঈর্ষা, যে ঈর্ষাটাকে ভাল লাগায় রূপান্তরিত করেছে মালু।

খেতে খেতেই মনে পড়ল মালুর, খাবার সাজিয়ে রিহানা আর অপেক্ষা করেনা ওর জন্য।

অকারণেই ইয়াসিনকে নিয়ে এ রাস্তা সে রাস্তা এ দোকান সে দোকান ঘুরে বেড়াল মালু। ঘর-সংসারির কত উপদেশ দিল, যেন সংসার করে করে বুড়ো হয়ে গেছে ও। তারপর বিকেল নাগাদ ফিরে এল বাসায়। পরিপাটি করে সাজছে রিহানা। চোখটা চট করে ফিরিয়ে নিতে পারে না মালু। ইচ্ছে হয় চেয়ে থাকুক।

খাবেনা, বেরুবার আগে বলে গেলেই পার। চাকরটাকে আর কষ্ট করে রাঁধতে হয় না। ওকে দেখেই ঝাঁঝিয়ে উঠল রিহানা।

নিরুত্তরে পাখাটার নীচে এসে বসল মালু। একটু ঠাণ্ডা হল। মুখ হাত ধুয়ে এল। তারপর পোশাকটা বদলে বেরিয়ে গেল ছাত্রীদের গান শেখাতে। গেটের কাছে এসে পেছনে শুনতে পেল রিহানার গলা—আমার ফিরতে দেরী হলে তুমি খেয়ে নিও।

গান শিখিয়ে রোজ রাতে যে সময়টিতে ফেরে মালু ঠিক সে সময়ই ফিরল ও। রিহানা তখনো ফেরেনি। উপরে নীচে গোটা বাড়িটাই অন্ধকার। ঘরে পা রেখেই মাথাটা ঝিম করে ধরে গেল মালুর। ওর মনে হল কি এক ষড়যন্ত্রের কূটজালে এ বাড়ির সমস্ত বায়ু সরে গেছে অন্য কোন পৃথিবীতে। এখানে বায়ুহীন নিঃসীম শূন্যতা। এখানে নিঃশ্বাস নেয়া যায় না। ভীত পশুর মতো ত্রস্ত পায়ে বাইরে ছুটে এল সে।

পল্টন তখন খোলা মাঠ। তখনো দেয়ালের অবরোধ ওঠেনি, উদ্যত হয়নি বেপারী হাতের আক্রমণ। লাট ভবনের কোণা থেকে সেই ফকিরাপুল, ফকিরাপুল থেকে পল্টনের সেই পরিত্যক্ত চাঁদমারি—উদলা মাঠ সবুজ মখমল গায়ে জড়িয়ে নিঝঝুম পড়ে থাকত।

এ কোণ্ থেকে সে কোণ্ গোটা মাঠটায় চক্কোর দিয়ে বেড়াল মালু। ঘাসের নরম পিঠে পিঠ এলিয়ে দিয়ে ধুলোয় বেড়ালের মতো গড়াগড়ি খেল। জামা খুলে বাতাস মাখল গায়ে। তারপর বুঝি বন্ধু রাতের ঠাণ্ডা পরশে স্নিগ্ধ হল। ঘরের পথ ধরল।

বাতি জ্বলছে দোতলার ঢাকা বারান্দায়। বাতির নীচে মানুষ। মেয়ে আর পুরুষ, কয়েক জোড়া। মিহি কথার কাঁচ ভাঙছে ওরা। ছোট ছোট হাসির লহর তুলছে। ওদের হাসি, ওদের কণ্ঠ, গুনগুনিয়ে উঠছে অর্গানের নীচু খাদের মিঠে সুরের মতো।

কখনো বা মধ্য রাতের স্তব্ধতা চোখে মেখে থমকে থাকছে ওরা। হাই তুলছে আলস্যের। তন্দ্রালু চোখের ঠিকানাহীন দৃষ্টি ঘুরে ধুরে হঠাৎ হয়ত লক্ষ্য করছে পাম গাছটির মাথায় এক ঝাঁপি নিকষ আঁধার।

ঠিক এমন সময় এক ঝলক বাতাস এসে সুড়সুড়ি তুলে ভেঙ্গে দেয় ওঁদের ঝিমুনিটা। পাকা রাঁধুনীর মতো কে যেন উস্কিয়ে দিল নিভু নিভু কথা-উনুনের আধপোড়া কাঠের চেলাটা।

অড্রি হ্যাপবার্ণের ছবিটা দেখে এলাম কলকাতায়। চমৎকার অভিনয়। শুনেছি, দুটো একাডেমী এওয়ার্ড পেয়েছে।

বাবা। ঢাকায় বসে থাকলে পাঁচ বছরেও নো হোপ। আমি ভাবছি কালই একটা ট্রিপ দেব কলকাতায়। ছবিটাও দেখা হবে, দুচারটি কেনাকাটাও সেরে আসব।

হুঁ, যাকে বলে রথ দেখা কলাবেচা।

তা, যা বলেছিস। আমার তো ভাই প্রতি মাসেই একবার কলকাতায় না গেলে চলে না। মানুষ থাকে ঢাকায়? না আছে সোসাইটি, না পাওয়া যায় দুটো সখের জিনিস।

ঠিক বলেছিস। একটা ম্যাক্স ফ্যাক্টর লিপষ্টিক তামাম ঢাকা শহর খুঁজেও পেলাম না। আমি তো ওনাকে বলে বলে হয়রান হয়ে গেলাম—চল বদলি হয়ে করাচি। এ ছাই শহর আর ভাল লাগেনা।

এমনি করে টুন টুন ঠুন ঠুন বোল ঝরে ওদের কথায়। গড়িয়ে চলে ডিনার

শেষের বিশ্রম্ভালাপ। বিষয়টা মুখ্য নয়। বক্তটাও না। একটু বা রোমন্থন। পেটের ভেতর গুরু আহার্যগুলোকে নরম করা।

উগ্র আলো ছড়ান দোতলার নীচে এক তলার অন্ধকারটা কেমন ছমছমে। গা ভার ভার ভয় জাগান। হাত রাখতেই দু ফাঁক হয়ে গেল ভেজান কপাট।

সারাদিন ইয়াসিনের আনন্দে শরিক হয়ে জোর করে যে শূন্যতাটাকে সরিয়ে রেখেছিল দূরে দূরে, এই অন্ধকারে সোয়ার হয়ে দুঃসহ সেই শূন্যতাটাই যেন গ্রাস করে নিল মালুকে। হাতড়ে হাতড়ে দু একটা ঠোক্কর খেয়ে বিছানাটা খুঁজে পেল মালু। লম্বা হল।

অন্ধকারেই বুঝি জেগেছিল চাকরটা। মালুকে ঢুকতে দেখে উঠে আসে। জ্বালিয়ে দেয় বাতিটা। শুধায়, ভাত দেব সায়েব?

বিবি সায়েব খাবে না?

উনি তো উপরে খেয়েছেন।

আমি খাব না। তুই ঘুমো গিয়ে। বাতিটা নিবিয়ে দে।

দোতলার জোড়া জোড়া মানুষগুলোর কথাই ভাবছে মালু। কিন্তু, ওরা সবাই কি জোড়া? রিহানার জুটি কে? নামটা মনে মনেও বুঝি উচ্চারণ করতে পারলনা মালু।

তারপর প্রায়ই যেমন হয়, মাঝ রাতের ঢলে পড়া প্রহরে ঢুলু ঢুলু ঘুম নামবে ওদের চোখে। ছোট হয়ে আসবে ওদের চোখের তারা। ডিনার শেষের চটকি আলপনাটা কিছুতেই আর জমবে না। উড়তে চাইবেনা ঠুনকো কথার টুনটুনিরা। শিথিল পা, বোজা বোজা চোখে নেমে আসবে রিহানা। এক তাল ঠাণ্ডা গোশতের মতো দলা পাকিয়ে পড়ে থাকবে বিছানার এক পাশে।

কিন্তু কোথায় চলেছে রিহানা? এতে কি সত্যিই আনন্দ পাচ্ছে ও? রিহানা কি চেয়েছিল? কি চায়?

বার বার ঠেলে দিলেও প্রশ্নগুলো ছেঁকে ধরে মালুকে।

ও শালার হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে কিরে! বল ডুবে গেছে। যেমন তেমন ডোবা নয়। একেবারে মধুর চাকে হাবুডুবু, গানটান সব ঝেড়ে পালিয়েছে।

শুনছি নাকি কোন্ বড় লোকের মেয়েকে ভাগিয়ে···

শালা বেইমান। নেমকহারাম। ফষ্টিনষ্টি করবি তো অন্য জায়গায় কর। তা না ভদ্রলোক বিশ্বাস করে তোকে বাড়িতে ঢুকতে দিলেন। আর তারই মেয়েকে নিয়ে ইলোপ?

মানে গান গাইতে গাইতে একেবারে সপ্ত আকাশে উধাও?

সাধে অমন টসটসে হয়েছে চেহারাখানা। দেখনা একবার, কেমন বাহারের সুরত? একেবারে তুলা মিঞা আর কি!

ছিঃ ছিঃ, এ কী কেলেঙ্কারী! শালা একটা আস্ত বদমাস।

ভোঁতা বিদ্রূপ। আড়ালে আবডালে নয়। ওর চোখের সুমুখেই। অট্টহাসি ছড়ায়। ভেংচি কাটে। মালু দেখে এবং শোনে, উপহাসের জিহ্বাগুলো কেমন লিক লিক করে যায়। এককালে হয়ত এরাই ছিল ওর অন্ধ স্তাবক।

ব্যাটা কিন্তু রোজগার করছে মেলা।

তা আর করবে না; যাকে বলে আদার বনে খাটাস বাঘ। পাকিস্তানের অর্থ ওদের মনোপলি, মানে নো কম্পিটিশন। কিন্তু এখন আর ওটি হচ্ছে না সায়েব।

কেন বলুন তো?

মশায় ঢাকার রাস্তায় এখন গায়কের ছড়াছড়ি। মেয়েকে গান শেখাবেন? দিন না একটা বিজ্ঞাপন, দেখবেন গণ্ডায় গণ্ডায় গায়ক আপনার দরজায় হাজির। এ বলে আমারে দেখ, ও বলে আমারে দেখ।

থামুন তো মশায়, গানটা একটু শুনতে দিন। পেছনের সারির কোন রসপিপাসুর ধৈর্যে বুঝি আর কুলায় না।

ব্যাটা উজবুক নাকি রে? হো হো হাসির রব উঠে। কার সাধ্য প্রতিবাদ জানায়।

মশায় ওকি গান? ভাটিয়ালিতে বেহাগ রাগ! সুট কোট পরে গলায় চাদর ঝোলান।

যত সব কালোয়াতি।

উপায় কি? পুঁজি তো মোটে দেড়খানা বাউল, আড়াইখানা মারফতি, তিনখানা ভাটিয়ালি। সেই মান্ধাতার আমলে শিখে রেখেছে। ওতে কি আর এখন কল্কে মেলে? তাই খিঁচুড়ি পাকান শুরু হয়েছে।

লে বাবা, থাম এবার। তার চেয়ে ধরনা একটা বোম্বাই কা গানা।

উত্যক্ত করতে চায় ওরা মালুকে। থামিয়ে দিতে চায় ওর গান। ওর এই বিচিত্র পরীক্ষায় ওদের বিদ্রোহ। প্রতিবাদ।
বিদ্রূপের আঙুলগুলো নেচে নেচে যায় মালুর চোখের সুমুখ দিয়ে।
কতক্ষণ ও না দেখে পারবে। কতক্ষণ উপেক্ষা করবে। বুঝি এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে যায় ওর সাহসভরা বুকটা।
উঠতে গিয়েও ভেঙে যায় মীড়। স্বর যায় ফেটে। সুর যায় কেটে। গলা যায় শুকিয়ে। যা গাইতে চায় তাও আর গাওয়া হয় না।
কি সব ছাইপাশ গাও বলতো? আমার যে মুখ দেখানো দায়। তিক্ততার হুল ফোটায় রিহানা।
গান কি আর বোঝ তুমি রিহানা? যে হৃদয় দিয়ে বুঝতে সে তো হারিয়ে ফেলেছ।
ইস কথার আবার ছিরি দেখ! গা জ্বলে যায়।
জ্বালা কি আমারই কম রিহানা? ঘরে বাইরে উপহাস, মনের ভেতর অশান্তির জ্বালা, তুমি কি দেখছ না?
তার আর কি করা যাবে।
কিছুই কি করা যায় না রিহানা? তুমি কি দিতে পারনা এক ফোঁটা সান্ত্বনা, একটু মমতার পরশ? পার না পাখির ডানার মতো তোমার ছোট্ট দুখানি বাহুর শান্ত আশ্রয়ে আমার সব জ্বালা জুড়িয়ে দিতে?
ন্যাকামী রাখতো। ও সব ভাল লাগেনা আমার। তোমার ফাংশান-টাংশনেও আর যাচ্ছিনা আমি। বিশ্রী সব রিমার্ক। তুমি সইতে পার। আমার চামড়া অত মোটা নয়। বিতৃষ্ণা বিরক্তি তাচ্ছিল্য রিহানার কণ্ঠে।
ও, এই বুঝি তুমি? আমার গানের টানে, সুরের আরাধনায় যে উঠে এসেছিল পাতাল ফুঁড়ে। যাকে মনে করতাম আমার পরম পুরস্কার? এত স্থূল, এত নির্মম তুমি?
হ্যাঁ, তাই তাই, হল তো? কর্কশ গলায় কয়েক দলা বিষ উগরে দিয়ে বেরিয়ে যায় রিহানা।
যেমন বলেছে রিহানা কাজেও তার ব্যতিক্রম হয় না। গানের জলসাগুলোতে মালুর সাথে ওকে আর দেখা যায়না। কিন্তু মালুকে যেতেই হয়। ওটা ওর যশ। এখন বুঝি অপযশ। তার চেয়েও বড় কথা, ওটা তার রোজগার। তাই ও যায়। বিদ্রূপের কণ্ঠ ছাপিয়ে সুর তোলে। অদৃশ্য কোন নিয়তির বিরুদ্ধে আকাশের দিকে চেয়ে বুঝি ছুঁড়ে মারে হাতের মুঠো। না বুঝুক,

না শুনুক ওরা। তবু মালু গেয়েই যাবে, ওদের শুনতেই হবে, বুঝতেই হবে।

কিন্তু ছাত্রীদের বাড়িতে কি সে জিদ খাটে ?

মাষ্টার সায়েব, মেয়েটিকে খান কয় রবীন্দ্র সঙ্গীত শিখিয়ে দিন, ওটা বেশ চালু হয়েছে আজকাল।

কি বললেন ? রবীন্দ্র সঙ্গীত ? আমাকে দিয়ে হবে না। অন্য মাষ্টার দেখুন।

তা······আপনি বলছেন যখন তাই হবে।

এক ঝাঁকের পাখি ওরা। লিলির গার্ডিয়ান কম মাইনের রবীন্দ্র সঙ্গীতের নতুন মাষ্টার রাখে। রিণার বাবাও। হয়ত ওদেরই দেখাদেখি অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের গার্ডিয়ান রুকুর বাবা আর লীনার চাচা, ওরা দুজনে মিলেই নতুন মাষ্টার বহাল করে। দু মেয়ে এক সাথেই গান শিখবে।

কিন্তু তর্ক তোলেন অধ্যাপক হোসেন, রেখার বড় ভাই। রিণা লীনা রুকু আর লিলির গার্ডিয়ানদের মতো বুঝি এক কথায় মালুকে জবাব দিতে পারেন না তিনি। বলেন : এমন সুন্দর আপনার গলা। এত আপনার সুনাম। কেন শিখে নেননা রবীন্দ্র সঙ্গীতটা ? সেই সাথে কিছু চলতি আধুনিক ?

ভাল লাগেনা।

আকাশ থেকে পড়েন সাহিত্যের অধ্যাপক। এমন কথা কখনো শোনেন নি তিনি। সকল বাঙালী মধ্যবিত্তের মতোই রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ তার গভীর।

কেন, মানে যুক্তি ? কেমন তীক্ষ্ণ শোনাল অধ্যাপকের স্বরটা।

যুক্তি যে আমার কি সেটা তো তলিয়ে দেখিনি কখনো ? মনের ভেতর থেকে সাড়া পাইনি। তাই ওটা শিখিনি।

বলেন কি ? ভাবে ব্যঞ্জনায় রূপে এমন নিটোলতা, এমন মধুর আনন্দের স্বাদ অন্য কোন্ সুরে আছে বলুন তো ? হৃদয়ের রস, প্রকৃতির লাবণ্য আর ফুলের কোমলতা মিশিয়ে যে সুরের সৃষ্টি, সেই রবীন্দ্র সঙ্গীত সাড়া জাগায় না আপনার মনে ? আপনার মত নামজাদা গুণীর মুখে কথাটা শুনে বড় অবাক লাগছে মিঃ মালেক।

রবীন্দ্র সুরের বিপুল অবদানকে তো আমি অস্বীকার করছিনা হোসেন সাহেব। আমার মনের প্রতিক্রিয়াটাই শুধু জানালাম আপনাকে। কেবলই মনে হয় কি এক কান্না এসে কেড়ে নিয়ে যায় মধুরের আনন্দটি। যেন এক

বেদনার বিলাস, দুঃখের গায়েও একটু মাধুরিমা, একটু মহত্ত্বের প্রলেপ লাগিয়ে কি এক অবশ তৃপ্তিতে নিজের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে আনি। বুকটা যেন ভরে যায় অক্ষম কোন ব্যথায়, সে ব্যথার রাজ্যে ডুবে গিয়ে এক ধরণের তৃপ্তিও পাই। এখানেই বিদ্রোহ করে আমার মনটা।

বিদ্রোহটা কেন বলুন তো? উন্মুখ এক আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে আসেন অধ্যাপক হোসেন।

দুঃখ আমার আবাল্য সাথী। সে দুঃখ ক্ষুধার, বঞ্চনার, অপমানের, অকারণ আঘাতের। কদর্য তার রূপ, হিংস্র তার ভাষা। কিন্তু সঙ্গীতের রাজ্যে তাকে প্রকাশের ভাষা বা স্বর এখনো খুঁজে পাইনি আমি।

এতো আপনার নিজের কথা বলছেন। ক্ষুন্ন স্বর অধ্যাপক হোসেনের। আমি খুঁজছি। তাই মনের ভেতরে সুখের কান্নার মতো পুষে রাখতে চাইনা দুঃখটাকে। জ্বালিয়ে রাখতে চাই অগ্নি শিখার মতো। রবীন্দ্র সুরের কান্নার সুখ আমার অসহ্য। আমি···

একটু থামুন। হাত উঁচিয়ে ওকে থামবার ইশারা জানিয়ে কি এক উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েন অধ্যাপক হোসেন। তার পর বসে ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রেখে যেন অনুধাবন করলেন মালুর কথাগুলো। অবশেষে বললেন: যাকে আপনি বলছেন কান্নার সুখ, ব্যথার রাজ্যে ডুবে যাওয়ার তৃপ্তি, এ কথাগুলোকেই কি একটু ঘুরিয়ে বলা যায় না? বলা যায় না, দুঃখদীর্ণ জীবনে যে সত্যের আরাধনা তারই নাম সৌন্দর্য, আর এই সৌন্দর্যই রবীন্দ্র স্বর? এ ভাবে বললেই কি সত্য কথাটা বলা হয় না?

কিন্তু, এ সৌন্দর্য যে আচ্ছন্ন করে চেতনাকে। আচ্ছন্ন হৃদয় চেতনায় চিন চিন করে বাজে ব্যথার রাগিণী। কি এক অতৃপ্তি কি এক শূন্যতাবোধ ঘিরে ধরে, বিষণ্ণতার অবসাদে চোখ বুজি। কিন্তু আমি তো চাই সেই রূপকথার সোনার কাঠি রূপোর কাঠি যার মন্ত্র ছোঁয়ায় প্রাণ জাগে। সেই সঞ্জীবনী সুর······

উহুঁ দাঁড়ান দাড়ান। হাত তুলে মালুকে আবার থামিয়ে দেয় অধ্যাপক হোসেন। ওই যে বললেন চিন চিন করে বাজে ব্যথার রাগিণী, সেই সূক্ষ্ম বেদনাটুকু যে অনেক কিছুর প্রকাশ, মালেক সাহেব। সার্থক শিল্প-কর্ম, সার্থক সুর সর্বত্রই তো এ বেদনার ধারা। রবীন্দ্র গীতিকায় এ বেদনাই তো তার উৎকৃষ্টতম আবেদন।

বুঝি দম নেবার জন্য একটু থামলেন হোসেন সাহেব। দম নিয়ে বলে

চললেন: আচ্ছা বলুন তো, সৌন্দর্য কি নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ? না, আমি তা মনে করি না। যে বেদনার গর্ভ থেকে তার সৃষ্টি সে বেদনাটা সব সৌন্দর্যের মাঝেই তো মিশে থাকে। তাই ওই বেদনাকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্যের অনুভব বা উপলব্ধি শাঁসটাকে বাদ দিয়ে শুধু খোসা নিয়ে তৃপ্ত থাকার মতো। রবীন্দ্র সুরের এ বেদনার আবেদন অনুপম সৃষ্টি সুন্দরের আবেদন……

মালুর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন অধ্যাপক। মনে হল তাঁর মালু যেন শুনছেনা।

তাই তো রবীন্দ্র গীতির বৃত্তটা ফিনফিনে বাবু সাহেবদের গোছাল ড্রয়িং রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারলনা, পারবেওনা। যেন আপন মনেই বলল মালু।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক সাহেব। সময় হয়ে গেছে কলেজের। তত্ত্বের তর্ক আপাততঃ স্থগিত রেখে কাজের কথায় এলেন: আসল কথাটা কি জানেন? হাল জামানায় বানের পানির মতো অফিসার কূলে ছেয়ে গেছে দেশটা। এই ছোকরা অফিসারগুলো সঙ্গীত না বুঝুক, গাইতে না জানুক, কিন্তু দুটি রবীন্দ্র সঙ্গীত জানেনা এমন বৌ রোচেনা ওদের। তাই ভাবছিলাম রেখাকে…

নিশ্চয় নিশ্চয়। আপনাদের পাড়াতেই তো গীতিকা নামের একটা নতুন গানের স্কুল খুলেছে দেখলাম। রেখার যেমন সুরবোধ দুমাসেই ও রপ্ত করে নেবে। অধ্যাপকের কথাটা আঁচ করে নিয়ে বলল মালু। উদারতার একটি প্রশস্ত হাসি ছড়িয়ে বেরিয়ে এল ও। কিন্তু রাস্তায় পড়তে না পড়তেই হৃপ করে নেমে এল এক উদ্বেগের ছায়া।

উদারতার হাসিটি ডুবে গেল ওর।

এদেশে আধুনিকতার জোয়ার এসেছে।

চুলের ফ্যাশনে ঠোঁটের রঙে শাড়ির নক্সা আঁকা আঁচলে মুখের বোলে চলার ঢংয়ে, সর্বত্র আধুনিকতার প্রতিযোগিতা। গানের ক্ষেত্রটা বাদ যাবে সেই প্রতিযোগিতার আওতা থেকে, এমন কিছু ভেবে রেখেছিল নাকি মালু? দশটা আধুনিকের মাঝে একটি ভাটিয়ালি, একটি সারি, জারি, ক্লাসিকাল একটিও না। এই তো চলছে। অস্তিত্বের কঠিন সংগ্রামে এটুকু স্বীকৃতিও কি থাকবেনা?

একটার পর একটা টুশনি যাচ্ছে। এর অর্থ আয়ের ঘাটতি। রিহানার গঞ্জনা। মালুর হার, রিহানার সুমুখে।

তার চেয়েও বড় কথা মালুর সঙ্গীতের ব্যর্থতা। ওর সাধনার মৃত্যু। একটা মালু বয়াতি, আজ বড় জোর রেডিও গায়ক। এর বেশী কিছু নয়। সঙ্গীতের স্রষ্টা নয়, শিল্পীর সৃজনে, কর্মে আর ধর্মে পথিকৃৎ নয়।

আগা গোড়া ভাবতে গিয়ে কেমন যেন থেই হারায় মালু। কিছুদিন আগেও কত শ্রদ্ধা সম্মান এসে লুটিয়ে পড়েছে ওর পায়ে। একটানা প্রশস্তি শুনে শুনে নিজেই কানে আঙুল দিত মালু। সেই মালুকেই আজ চতুর্দিক থেকে বর্জনের হিড়িক পড়ে গেছে।

বর্জন? শব্দটার মাঝে যেন অনেক অর্থ। ওর প্রিয় ছাত্রছাত্রী আর শ্রোতা, ওর সাধনার সাথে যারা ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে, তারা, এমন কি রিহানা, সবাই আজ বর্জন করে চলেছে ওকে।

মালু ভেবে পায় না, সত্যি কি অবাক হবে ও? মুষড়ে পড়ার মতোই বা কি কারণ থাকতে পারে! কেননা চারিদিকেই তো আজ বর্জনের পালা। অতীতকে, ঐতিহ্যকে, কথামালায় শেখা সত্যবোধ, নীতিবোধকে, মহৎকে, ভালকে, সুরুচিকে—ঝাড়ে মূল বর্জন করার উৎকট প্রতিযোগিতা আজ এই শহরে। সেখানে বর্জিত মালুর সুর, কেন না, নতুন সুরের অভিনবত্বের মাঝেও প্রাচীনের গন্ধ, ঐতিহ্যের ছোঁয়া। এ আর তেমন কথা কি! তাই হোক। উপেক্ষিত অনাদৃত হয়েই থাকুক মালু। আবার যখন আসবে গ্রহণের পালা তখন আপনার ঐশ্বর্য ভাণ্ডার নিয়ে ওদের সুমুখেই এসে দাঁড়াবে মালু। তদ্দিন? তদ্দিন আপন পথে একলাই চলবে, সেখানেই ওর জিত।

কিন্তু, রিহানা? সে যে মালুর সবচেয়ে বড় পরাজয়। এ পরাজয়ের সত্যটাকে এখনো যেন স্বীকার করতে চায়না মন। বুকের হাঁড়গুলোও যেন কি এক কান্নায় গুমরে ওঠে।

তবু নিজের চেয়ে রিহানার কথাটাই বুঝি বেশি করে ভাবে মালু। রিহানা ঠকে গেছে। ও ভুল করেছে। তাই অনুতাপে তুষের আগুনের মতো ও জ্বলছে সারাক্ষণ। কি এক সহানুভূতিতে ভিজে যায় মালুর মনটা। ওর মনে হয় ওর চেয়েও রিহানার দুঃখটা অনেক গভীর, আশাভঙ্গের গ্লানিটা অনেক বেশি।

এ কী করছ রিহানা? অন্ধরাগে এ কোন্ নর্দমায় ডুব দিচ্ছ তুমি?

মাথার দিকে বালিশ দুটোকে উঁচিয়ে ত্রি-ভঙ্গিমায় শুয়ে আছে রিহানা। মুখটা ঘুরিয়ে শুধাল, কী বলছ? বুঝতে পারছিনা।

বুঝি বোঝাবার জন্যই উঠে এল মালু। কিন্তু, বসতে পারলনা রিহানার পাশটিতে। কি এক দ্বিধা, কি এক সংকোচ। তার সাথে যেন ভয়ের মিশেল। ফিরে গিয়ে মোড়াতেই বসল মালু। বলল: যা ছেড়ে এসেছ সে দিকে আবার চোখ ফেরাচ্ছ কেন, রিহানা? যা হারালে তার ক্ষতি-পূরণ আমাকে দিয়ে হল কিনা সে তর্ক তুলব না আজ। কিন্তু যে গর্বিনীর দীপ্তি নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলে তুমি অনিশ্চয়তার গর্ভে সে তো জীবনের এক মহা মানিক। তাকে অমন করে ম্লান হতে দিচ্ছ কেন?

তোমাকে না নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করতে যাই কেন, এই তো? কিন্তু, আমাদের ফ্যামিলিতে তুমি যে গ্রহণযোগ্য নও সে তো বলেই দিয়েছি তোমাকে। করাতের মতো কাটা কাটা কথা রিহানার।

তা নয়। আমি বলছিলাম দোতলার ওই বেপারিটার সাথে তোমার অন্তরঙ্গতাটা বড় দৃষ্টিকটু, পাড়ার লোকেরা মুখ আড়াল করে হাসছে, দেখছ না?

দৃষ্টিকটু? এক ফুলকি আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠল রিহানা। কমজাতে জন্ম নিলে মনটাও এত ছোট হয়, তাতো জানতাম না? বলি, নামমাত্র ভাড়ায় এতগুলো ঘর যে ছেড়ে দিল তাকে কোনদিন দিয়েছ একটি ধন্যবাদ? দাওয়াত দিয়ে দুটো খাওয়ানোর কথা ভেবেছ কখনো? ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ এসব না হয় শেখনি। তাই বলে কৃতজ্ঞতা বোধটুকুও থাকবেনা।

আহ্, রিহানা!

মুরোদ তো তোমার খুব দেখলাম। নতুন বৌকে নিয়ে তুললে পচাঁ রাস্তার ঘিঞ্জী ঘরে। আবার বড় বড় কথা!

সেই ঘিঞ্জী ঘরের দুর্গন্ধটা এখনো ভুলতে পারেনি রিহানা। বুঝি সেই দুর্গন্ধটা এখুনি এসে আবার লেগেছে ওর নাকে। তাই নাক আর ঠোঁটের কুঞ্চনে চেহারাটাকে বিশ্রী করল রিহানা।

শিউরে উঠল মালু। যাকে মনে হয়েছিল রূপসী আজও যে সুরূপা সে মুখ এতো কুশ্রীও হতে পারে?

রোজ রোজ এই একই কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ আছে রিহানা? মোহ ভেঙ্গেছে তোমার। অনুতপ্ত তুমি। তাই তো বলছি, মুক্তির পথ তোমার খোলা, সে পথে না গিয়ে কাদা ঘাঁটছ কেন? পৃথিবীর যে অটল সহিষ্ণুতা আর নিঃসীম আকাশের যে উদারতা তাই যেন কথা বলে গেল মালুর কণ্ঠে।

সাপের জিবের মতো লকলকিয়ে উঠল রিহানা। মুক্তি? মুক্তি কে চায় তোমার কাছে? আমার সব কিছু কেড়ে নিয়ে আমার সর্বনাশ করে উদারতার অহংকার নিয়ে তুমি কেটে পড়বে ভাবছ? ভাবছ, গানের বেহেশতে ফিরে গিয়ে নতুন নীড় বাঁধবে তুমি? সে আমি হতে দিচ্ছিনা। তিল তিল যন্ত্রণার দাহ নিচ্ছি আমি, তার আঁচ থেকে বাঁচতে চাও তুমি? দুরাশা।

এ কী প্রতিহিংসা রিহানার?

হতভম্ব স্তব্ধ মালু।

এক চিলতে বিকেলের রোদ মেঝের উপর পিঠ এলিয়ে খেলা করছে আপন মনে। শার্শির কোন কাচে গিয়ে পড়েছে তার প্রতিবিম্ব, সেই প্রতিবিম্বের কোন চুম্বক আকর্ষণে কেঁপে কেঁপে চলেছে রোদের ফালিটুকু। স্থির দৃষ্টিতে সে রোদের খেলার দিকে চেয়ে চেয়ে মালু যেন ধ্যান করল আদিম কোন পৌরুষ সত্তার।

ধীরে ধীরে উঠে এল মালুর দৃষ্টিটা। স্থির হল রিহানার মুখের উপর। বলল মালু: আচ্ছা রিহানা। সত্যি করে বলনা, তুমি কী? আমার সুরের মিতা? অথবা শুধুই গঞ্জনা। এক পুঁটলি স্থূল কামনা?

রিহানার কানে বোধ হয় গেলনা কথাগুলো। অথবা কানে তুললনা ও। ও ফুঁসছে। ফুলছে। কাঁপছে। আচমকা এক ভাঙ্গ স্প্রিংয়ের মতো আন্দোলিত হয়ে উঠে বসল ও। কি এক ধিক্কারে নিজের প্রতিই যেন ছিটিয়ে দিল ঘৃণার ঝুরি—ইস্, যদি জানতাম।

কি জানতেনা? শুধাল মালু।

জানতামনা যে তুমি একটা আকাট মূর্খ। বলনি সে কথা।

আর কি বলিনি?

বলনি, জন্ম পরিচয়হীন ভৃত্যের জীবিকায় মানুষ।

আর?

অক্ষম অপদার্থ। সাধ, আকাশের চাঁদ ধরবার।

সাধ হয়ত ছিল রিহানা। কিন্তু, আকাশের চাঁদটা যে নিজে এসেই ধরা দিল আমার হাতে।

সেটা ভুল।

সবটাই কি ভুল? যে গান যে সুর সমুদ্র মন্থন করে তুলে এনেছিল তোমাকে, সেটাও কি ভুল? রিহানা, সে গান সে সুর তো আমার এখনো স্তব্ধ

হয়নি। এমনা সুরের রাজ্যে আমরা নতুন বাসর গড়ি? এমনা নতুন প্রাণে বাঁচি? আসবে? যেন মুমূর্ষুর অন্তিম আকুতি কেঁপে উঠল মালুর কণ্ঠে। লিকলিকে বেতের মতো একটুখানি বেঁকেই সোজা হল রিহানা।
সুর সুর সুর। গান গান গান। যেন সুর আর গান খেয়েই বাঁচতে পারে মানুষ। গান বেচে কিনতে পেরেছ এক আধলা সামাজিক মর্যাদা। পাত পেয়েছ কোন ভদ্র ঘরে?
স্থৈর্যের ধৈর্যের অটলতার সেই যে মহা শক্তি মালুর সত্তার গভীরে, সে বুঝি এগিয়ে এলনা মালুর সহায়তায়। আঘাতে অপমানে বুঝি ধুলোয় গুঁড়িয়ে যাবে মালু।
কি ভাবছে মালু? পৌরুষ আক্রোশে পরাভূত করবে, ঝলসিয়ে দেবে ওই স্থূল রুচির মেয়েটাকে? শক্তির আলিঙ্গনে খান খান করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে ওর মিথ্যা গৌরব? স্বামীত্বের অধিকারে কেড়ে নেবে ওর এই মিথ্যা তেজ?
এত কথা কি ভাবল মালু, না অবকাশ পেল ভাববার? তার আগেই ও লুফে নিল সাপের জিবের মতো লকলকিয়ে যাওয়া সেই দেহখানি।
প্রচণ্ড আঁচে বলক খেয়ে টগবগিয়ে উঠল রিহানা। হাত পা ছুঁড়ল। চীৎকারে কান্নায় ছটফটিয়ে গেল। কামড় বসিয়ে দিল মালুর কাঁধে। আঁচড় কেটে, ঠেলা মেরে আলগা হতে চাইল মালুর নিষ্ঠুর আলিঙ্গন থেকে। কিন্তু আদিম বন্যতার আক্রমণের মুখে কতক্ষণ টিকে থাকবে ওর প্রতিরোধ। স্তব্ধ হল প্রতিবাদের কণ্ঠ।
নেতিয়ে পড়ল প্রতিরোধের দুটো বাহু।
অবশ হয়ে সিধা হল পা জোড়া।
নিস্তেজ হল রিহানা।
পৌরুষ এসে বিদ্ধ করল ওকে।
বিধ্বস্ত হল আজকের মুখরা রিহানা। পৌরুষ উত্তাপে সিদ্ধ হল রিহানা। সিদ্ধ হয়ে হয়ে নরম হল। নরম হয়ে রোঁয়া রোঁয়া ছিটকে পড়ল। ছিটেভিটে একাকার হবার আগে ওর আহত নারীত্বটা বুঝি শেষ বারের মতো একটুখানি শক্তি সংগ্রহ করল। দুর্বল বুজে আসা কণ্ঠের চাপা গর্জনে উচ্চারিত হল একটি ভয়ংকর শব্দ—বর্বর।

এ কী করল মালু ?

লাঞ্ছিত করল নিজের পৌরুষকে ? অপমানিত করল রিহানার নারীত্বকে ? কেমন করে ওকে মুখ দেখাবে মালু। পৌরুষ অহংকারের এতবড় পরাজয় নিয়ে ও কি কোনদিন যেতে পারবে রিহানার সমুখে ?

আশ্চর্য মানুষের মন। আত্মার শাসনের বিদ্রোহ করার জন্যই যেন তার সৃষ্টি। তাই যদি না হবে, তবে কেমন করে বর্বরতার আচরণে আপনাকে কলঙ্কিত করল মালু।

মনটা যদি হত ইস্পাতের কাঠি অথবা একতাল কাদা। তা হলেই যেন তাকে বিশ্বাস করা যায়, নির্ভর করা যায়। আর এমনি মনকে নিয়ে হয়ত যা খুশি তাই করা যায়।

কিন্তু, মালু যেন আর পারছে না ওর মনটাকে নিয়ে যা খুসি তাই করতে। পারছেনা মন নামের শক্তিটার উপর নির্ভর করতে। অল্প কয়েকটি দিনের ভেতর কখন এতটা অধঃপতন হল মালুর ?

রিহানা উঠে গেছে দোতলায়। সেখানেই থাকে ও।

হঠাৎ কোনদিন নেমে আসে। দুদণ্ড বসে যায়। দেখা হয় না মালুর সাথে। কখনো বা দেখা হয়ে যায়। কথা হয় না।

রিহানার আর এক খালু করাচী থেকে বদলি হয়ে এসেছে ঢাকায়।

ছয় মেয়েকে নিয়ে খালা-খালু আপাততঃ উঠেছে দোতলায়।

ব্যবসার কাজে আহসান গেছে কন্টিনেন্টে। হামবুর্গ, ডুসেলডর্ফ, মিলান, কোপেনহেগেন ইয়োরোপের এমনি সব শহরের ছাপ নিয়ে চিঠি আসে ওর। ছয় বোনের সাথে রিহানা, সাত বোনে মিলে গোগ্রাসে গেলে চিঠিগুলো। সে চিঠি নিয়ে গল্প করে সাত বোন, হয়ত মালুকে শোনাবার জন্যই মালুর কানে আসে।

সাতটি নানা রঙীন ফুলের তোড়ার মত ওরা সাজে। বেড়াতে যায়। বাইরে খেতে যায়। সিনেমায় যায়। গেটে অথবা একতলার দোর গোড়ায় হয়ত দেখা হয়ে যায় মালুর সাথে। আর তখন বারটি চোখের নিগ্রহে মাটির সাথে থেঁতলে যায় মালু। রিহানা চেয়ে থাকে অন্য দিকে।

ছয় বোনের ছোট দুজন, সবে মাত্র ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরেছে। ওদের চোখে কৌতূহল মেশান অনুকম্পা। সিড়ির গোড়ায় ওদেরই মুখোমুখি মালু। দাঁতে জিব কেটে চোখ কপালে তুলে শুধায় ওরা, এ্য মা! ছিঃ আপনি নাকি ম্যাট্রিকও পাশ করেন নি ? গানের ট্যুশানী করে পেট চালান ?

ওরা অপেক্ষা করেনা উত্তরের জন্য। দৌড়ে উঠে যায় দোতলায়। সেখান থেকে চেয়ে থাকে অসহায় মালুর দিকে।

ছয় বোনের সব চেয়ে বড়জন, সে মুখ খোলে না। যদি কখনও চোখাচোখি হয় মালুর সাথে নিঃশব্দ অবজ্ঞায় চোখ ফিরিয়ে নেয় ও, যেন বলে, কী স্পর্দ্ধা।

দিনগুলো বেশির ভাগ বাইরেই কাটছে মালুর।

কিন্তু, বাইরের জগৎটাও তো বিষিয়ে উঠেছে। বিষিয়ে উঠেছে সেই হলদে বাড়িটার হাওয়া। সেখানেও উপেক্ষা, সন্দেহ, কিছুবা অনুকম্পা। শেষ পর্যন্ত হয়ত লাঞ্ছনাও।

মালু প্রস্তুত। জীবনে কোন কিছুই আর অসম্ভব, অভাবিত বলে ধরে নেয় না ও। সবই সম্ভব এই মানুষের পৃথিবীতে। যে পৃথিবীর বিচিত্র বৈপরিত্যে একই মাটিতে বাস করছে রিহানা, রাবু অথবা ইয়াসীনের বাগদত্তা হোসনার মতো মেয়ে, জাহেদ আর আহসানের মতো পুরুষ।

তাই লাঞ্ছনার মুহূর্তটি যখন এসে গেল নিজেকে একটুও অপ্রস্তুত দেখল না মালু।

মালেক, তোমার ওই উদ্ভট এক্সপেরিমেণ্টটা ছাড়তো।

স্যার, সব এ্যাক্সপেরিমেণ্টই প্রথম প্রথম উদ্ভট বলে মনে হয়।

বেশি কাজ অল্প কথার মানুষ বড সাহেব। মালুর জবাবটা শুনে কেমন থ মেরে চেয়ে থাকেন ওর দিকে। তার পর যা তিনি কখনো করেন না তাই করে বসলেন। অর্থাৎ পয়লা বাক্যে সোজা হুকুমটা জানিয়ে দিয়েও তর্কে অবতীর্ণ হলেন মালুর সাথে।

দেখ, কলা পাতায় কি ডিনার খাওয়া চলে ?

ডিনার মানে, আমরা যা বুঝি, বিলেতী পদ্ধতিতে বিলেতী খাবার। এই তো ?

হ্যা তাই।

টেবিল চেয়ার কাঁটা চামচ আমাদের নেই বলে সে খাদ্যটা তো আর হারাম হয়ে গেল না ? কলা পাতা রয়েছে আমাদের। সেই কলাপাতাই সই।

কিন্তু, বেমানান, দৃষ্টিকটু।

হোক বেমানান। স্বাদ নিয়ে কথা। স্বাদটা নেব। নেব আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে, প্রয়োজন মতো সংমিশ্রিত করে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এ সংমিশ্রণ অনিবার্য। নইলে আমাদের গান, কতগুলো মিষ্টি কথা হয়েই থাকবে, সঙ্গীতে উত্তীর্ণ হতে পারবে না। বড় সাহেব নয়, যেন সমানে সমানে তর্ক করছে মালু, তেমনি জোর ওর কথায়।

লোকে বলছে এ নাকি খিঁচুড়ি এবং জগা খিঁচুড়ি।

বলুক। লোকে তো অনেক কথাই বলে। উদ্ধত, এমন কি দাম্ভিক জবাব মালুর।

বড় বড় চোখ করেন বড় সাহেব। স্নেহ করেন মালুকে, ওর শ্রোতা বিজয়ী কণ্ঠ আর প্রতিভার জন্য। একটুখানি আশকারাও দিয়ে এসেছেন সব সময়। কিন্তু এমন বেয়াড়া কথাটা বুঝি আর হজম করা যায় না।

কিন্তু মালেক, পল্লী গানে পশ্চিমী বাজনা, দেহাতীদের জন্য ক্লাসিক্যাল রাগ, এতো স্রেফ পাগলামী। এই ক্ষ্যাপামী তোমার বাড়িতে চলতে পারে, কিন্তু, রেডিও হল সরকারী প্রতিষ্ঠান, এখানে চলবেনা। তর্কের ইতি টেনে আখেরী ফরমানটা আবার শুনিয়ে দিলেন বড় সাহেব। এর কোন জবাব নেই। উচ্চতর আদালতে আপিল নেই।

শির ঝুঁকিয়ে সালাম ঠুকে চলেই আসছিল মালু। আবার ডাক এল, শোন, আর একটা কথা।

ফিরে দাঁড়াল মালু।

খানিক আগের বড সাহেবী চেহারা আর মেজাজ দুটোই যেন একটু নরম হয়ে এসেছে, নরম গলায় বললেন বড় সাহেব : কানাঘুসো উঠেছে অফিসে, অফিসের বাইরেও। অমন দায়িত্বপূর্ণ পদে নন ম্যাট্রিক কেন? যেখানে অনুরূপ পদে সর্বত্র গ্র্যাজুয়েট! ইদানীং তোমার নামটা অফিসে আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে পড়েছে। তাই .....

এতে এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন, স্যার? এই অস্বস্তির মাঝে আমারও চাকরি করার ইচ্ছে নেই। ইস্তেফা পত্রটা লিখে এখুনি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।

ধাঁ করে বলে গেল মালু। দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরল। বলল : আপনার স্নেহ এবং অনুগ্রহ আমি কখনো ভুলবনা।

নিজের কামরায় এসে তক্ষুনি ইস্তেফা পত্রখানা লিখে ফেলল মালু। বড় সাহেবের হাতে পৌঁছিয়ে দিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। চেয়ার খানিতে হেলান দিয়ে হাত পা ছাড়িয়ে আরাম করার অবকাশ পেল মালু।

কিন্তু, একী বিদ্রূপ ওকে ঘিরে! বড় সাহেবের খাস কামরার কথাবার্তাগুলো বুঝি দেয়াল ফুঁড়েই বেরিয়ে এসেছে, তাই সহকর্মিদের মুখে বিদ্রূপের অবজ্ঞার কি এক চাপা হাসি, খানিকটা তিরস্কার। যারা একটুবা সহানুভূতিশীল তাদের চোখে অনুকম্পা!

আরও অসহ্য, মালু ঘৃণা করে অনুকম্পাকে।

আরও আশ্চর্য হয় মালু। কী অদ্ভুত সাদৃশ্য ওদের সাথে রিহানার। ওদের চোখ আর রিহানার চোখ, সব চোখেই যেন একই ভাষা। একই বিদ্রূপ : মূর্খ হয়ে কতদিন আর ফোঁপর দালালী করবে? সব জারিজুরি তো ধরা পড়ে গেল তোমার।

গুণের কদর নেই, রিহানার কাছেও না। এখানেও না।

করিম মিঞা। আর ইয়াসীন। মাথা হেট ওদের। যেন ওরাই অপরাধী ; ওরা বুঝছেনা ওরা কি করবে, কি বলবে।

দূর. ছাই, তার চেয়ে একটু ঘুরেই আসা যাক। বিদ্রূপ ভরা চোখ গুলোর উপর একরকম তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে বেরিয়ে এল মালু।

রাস্তায় নেমে নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয় মালুর, নিজেকেই যেন আজ অদ্ভুত ভাবে ভাল লেগে যায় ওর।

অনেক শৃঙ্খল বুঝি আপনা থেকে খসে পড়ল। মুক্তি দিল মালুকে। রিহানা গেছে, ছাত্রীরা গেছে। ভক্তজনের বাঁহবা, আনুকুল্য, শ্রোতার হাততালি সবই গেছে। আজ চাকরিটাও গেল।

দায় দায়িত্বের বালাই নেই, বিবেকের তাড়নায় অসমাপ্ত কাজের হিসেব নিয়ে সারাক্ষণ ছটফটিয়ে মরা, কোন কিছুর বালাই নেই। তালতলি বাকুলিয়া ছাড়ার পর নিজেকে কখনো এত মুক্ত, এত স্বাধীন মনে হয়নি মালুর।

নির্দ্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে ঢাকার বেতারে রেকর্ড বাজল। পর পর দুহপ্তা।

সব শুনলেন রাকীব সাহেব। গম্ভীর হলেন, কি এক অকল্যাণের চিন্তায় তার ছোট মুখখানি কুঁচকে আরো ছোট হয়ে এল, শুকনো আঙুরের মতো। বললেন, ভুল করছ।

কিন্তু, আত্মসম্মান যে থাকেনা রাকীব ভাই।

দায়িত্বের চেয়ে তোমার আত্মসম্মানটাই বড় হল? অকস্মাৎ কি এক উষ্মায় ফেটে পড়লেন রাকীব সাহেব।

নত মুখে নীরব হল মালু।

তারুণ্যটিকে যেমন দীর্ঘদিন ধরে রেখেছিলেন রাকীব সাহেব তেমনি হঠাৎই বুড়িয়ে গেছেন তিনি। সেই কচি কচি মুখখানিতে বয়সের রেখাগুলো আজ

প্রকট। মরে গেছে মুখের সেই শ্যামলাপানা রঙটি। তার যায়গায় এসেছে বার্দ্ধক্যের পাণ্ডুরতা, রোদ বৃষ্টির ধকল সয়ে সয়ে আঁস ওঠা ফাটা কাঠের মতো বিবর্ণতা।

হয়ত এই বার্দ্ধক্যের কারণেই জীবনটাকে গুটিয়ে এনেছেন রাকীব সাহেব। বাড়ি করেছেন শহরতলির নিভৃতে। সেরা জলসাগুলোতে ডাক পড়লে গাইতে আসেন। সেও কদাচিৎ। বেশির ভাগ সময়টা তার নিরালা অবসরেই কেটে যায়।

ঢাকায় যেদিন প্রথম এলাম সবাই মিলে দল বেঁধে সে দিনটির কথা একবার ভেবে দেখতো? মনের এক অদম্য প্রেরণা ছাড়া কিছুই তো ছিলনা আমাদের। তিল তিল করে দানা বাঁধল, গড়ে উঠল আজকের শিল্পী আর গায়ক গোষ্টি। নিজের শ্রমে, নিজের হাতে গড়া জিনিসটা ছেড়ে [illegible] বাজবেনা বুকে? গানের মতোই কথাগুলো বলে গেলেন রাকীব সাহেব। তেমনি দরদ। তেমনি হৃদয়ের আবেদন।

ছাড়ছি কোথায়? ছাড়িয়ে দিচ্ছে যে? প্রতিবাদ করল মালু। তারপর নিজেকে বুঝি আর একটু স্পষ্ট করার জন্য বলল, আমার গান আমার মতো করে গাইতে পারব না। গাইতে হবে মান্ধাতার আমলের রীতি অনুযায়ী, ফরমাশ মোতাবেক। একি জবরদস্তি নয়?

সেদিন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর ব্যাপারটা দেখলে তো? ফস করে অন্য প্রসঙ্গে এসে গেলেন রাকীব সাহেব।

দেখলাম তো, বিড়াল ডাক, কুকুর ডাক, ইঁদুর ডাকের সোর মুচিয়ে বাজনা তার থামিয়ে দিল।

ফল হয়েছে পাট গুটিয়ে দেশান্তরী হয়েছেন তিনি।

খবরটা জানা ছিল না মালুর। তাই একটু আশ্চর্য হল। কি এক ব্যথায় মোচড় খেয়ে গেল ওর শিল্পী মন।

বেদনার ছায়া নেমে এল ওদের মুখে। ওরা নীরব হল।

এক চাক জমাট স্তব্ধতা সুমুখে নিয়ে বসে রইল ওরা, মুখোমুখি। অনেকক্ষণ। খ্যাতির শিখরে তৃপ্ত সুখী বৃদ্ধ শিল্পী। আর আপনার বেগে অস্থির চঞ্চল তরুণ ভক্ত।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভাঙলেন রাকীব সাহেব, হয়ত আপনার সঙ্গীত আপনার সাধনাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই ভারতে চলে গেছেন তিনি। কেননা সেখানে তার সমজদার, কিন্তু তুমি তো আর তা পারবেনা।

এ মাটির সাথে যে তোমার নাড়ীর বন্ধন। "উপেক্ষা অনাদর অপমান নির্যাতন এ সব তো পথের ধূলো মালু। পথ চলতে গেলে ধূলো যে গায়ে লাগবেই।

জানি রাকীব ভাই, জানি। জানি বলেই তো ছুটে এসেছি আপনার কাছে। আসুন, আমরা একটা কিছু করি যা হবে আমাদের কীর্তি, আমাদের গৌরব, আপনি হবেন তার পুরোধা।

আমি? বুঝি আকাশ থেকে পড়ে শুধালেন রাকীব সাহেব।

হ্যাঁ রাকীব ভাই আপনিই, আপনাকে কেন্দ্র করে সমাবেশ হবে যত গুণী আর জ্ঞানীর। আপনাকে কেন্দ্র করেই আমরা গড়ব নতুন এক সঙ্গীত নিকেতন। যেখানে থাকবেনা চিত্ত বিনোদনের সস্তা চটক, থাকবে না গানের নামে প্রহসন, ফিন ফিনে গলায় চিঁ চিঁ কান্না। যেখানে স্থান নেই মামুলিয়ানার, যেখানে অনুশীল হবে কঠিন, ব্রত হবে সৃজনের।

কি এক আবেগে গড় গড় করে বলে যায় মালু। বলছে বলতে বুঝি ক্লান্ত হয়। শ্বাস টেনে দম নেয়। ফের বলে: আমরা শুধু গাইবনা, নিজেকে আনন্দ দেবনা। আমরা সৃষ্টি করব সুর। পুরাতনে দেব জীবন, নতুনে দেব অর্থ, ভাব। রাকীব ভাই, বলুন আপনি রাজি।

গভীর প্রত্যাশায় চেয়ে থাকে মালু।

কিন্তু, আঁশ ওটা ফাটা কাঠের মতো বিবর্ণ সেই মুখখানিতে খেলে গেলনা অভয় জ্যোতি, একটুখানি উৎসাহের দীপ্তি।

একি আর চাট্টিখানি কথা? বলা যত সহজ, করা ঢের কঠিন। সংশয়ে মাথা দোলান রাকীব সাহেব।

দশটি হাত মিললে কোন কিছুই কঠিন নয় রাকীব ভাই।

বুড়ো বয়সে এ সব কি আর আমার পোষায়? পোষায় না।

আপনি। আপনি একথা বলতে পারলেন রাকীব ভাই? মাত্র একশো খানি গানের রেকর্ড, এই কি আপনার আজীবনের সৃষ্টি? এতেই আপনি তৃপ্ত? আর কিছু, আরও বৃহৎ কোন স্মারক আমাদের জন্যে রেখে যাবেনা আপনি? না না রাকীব ভাই আরও বড় কিছু আপনি করতে পারেন, সে বিশ্বাস আমার আছে। আপনার ডাকে জড়ো হবে দেশের যত শিল্পী, গড়ে তুলবে একটি সার্থক প্রতিষ্ঠান। নইলে দেখছেন না, কেমন গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছি আমরা? এ আপনাকে করতেই হবে রাকীব ভাই। চাকরী ছাড়ার পর থেকে গত কয়েকটি দিন শুধু এ কথাটাই যে ভাবছি আমি।

যেন হোঁচট খেয়েই থেমে গেল মালু।

চোখ পড়ল রাকীব সাহেবের মুখের উপর। এ যেন মৃত্যুরই মুখ। মৃত্যুর মতোই অসহায় নির্জীব হিম ছড়ান।

শুধু বাইরে নয় ভেতরেও বুঝি বুড়িয়ে গেছেন রাকীব সাহেব। মরে গেছে শিল্পীর সেই অজেয় সত্তা। একটু ক্ষণ আগে যে মানুষটি বলছিল উপেক্ষা অনাদর অপমান নির্যাতন, এ সব তো পথের ধুলো, পথ চলতে গেলে ধুলো যে গায়ে লাগবেই, এ কি সেই মানুষ? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় মালুর। রাকীব সাহেবই বুঝি শেষ নির্ভর ছিল মালুর। শক্ত একটা খুঁটি পাবে। পাবে আশ্বাসে প্রেরণায় দ্বিধাহীন নির্দেশ। সার্থকতর সৃষ্টির মাঝে, নতুন খাতে নিয়ে আসবে জীবনটাকে, সুরের সাধনাকে।

শেষ আশাটাও বুঝি গুঁড়িয়ে গেল মালুর।

কিন্তু একি দেখছে মালু, পল্লীগীতির সম্রাটের চোখে? চমকে কেঁপে কেমন সিরসিরিয়ে গেল ওর গাটা।

এই যে দেখছ সব কিছু পাওয়ার নিটোল সুখের ছবিটি, এ যে মিথ্যা। মিথ্যা এই নিরালা তুষ্টি, এই প্রশান্তির সমাহিতি। সবটাই যে খোলস—এই নাম ধাম যশ আড়ম্বর। জীবন তো মোটে একশখানি গানের রেকর্ড। আর কিছু কি? একশখানি কীর্তি গাথা, আর কত ভ্রান্তির আমলনামা, কে জানে···এ তো খ্যাতির শিখর নয়. আশার ভগ্ন দেউল। অঙ্গার স্তূপ। রাশি রাশি ছাই। অতৃপ্তির। ব্যর্থতার।

এক লহমায় দৃষ্টির অতল থেকে এত ইতিহাস কথা কয়ে উঠতে পারে অদ্ভুত অকপট এক স্বীকৃতি রাকীব সাহেবের ঝাপসা চোখে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল মালু।

চলতে চায়না পা। তবু ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতেই পা দুটোকে ও নিয়ে এল হলদে বাড়ির সেই সাদা দেয়ালের কামরায়।

না আসার মতেই অফিসে আসে মালু। একান্ত জরুরী কাজগুলো সেরেই বেরিয়ে যায়। অকারণেই বুঝি ঘুরে বেড়ায়।

পদত্যাগপত্র ওর.গৃহীত হয়েছে নতুন লোক আসা সাপেক্ষ।

চা আনব ভাই?

মুখ তুলে তাকায় মালু। করিম মিঞার কণ্ঠে আত্মীয় বিয়োগ বেদনা।

তোমার.জন্যও। বলে, একটু বুঝি হাসল মালু:

শোন ইয়াসিন। কাল পরশুই এসে যাবে নতুন লোক। বকেয়া কাগজ পত্র সব ঠিক করে রাখছো তো?

ইয়াসিন বুঝি কানেই তুললনা কথাটা। ওর অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা চোখের দৃষ্টিটা পানির ভারে ঝাপ্সা।

শুধু শুধু কি যে ঝামেলা ডাকলেন ভাই সাহেব! শুভাকাঙ্খীর মোলায়েম স্বরে বলল ইয়াসিন।

ঝামেলা? ঝামেলা কোথায় নেই বলতো? এবারও যেন ম্লান মুখে আধখানি হাসি ফোটাতে চায় মালু। বলল আবার: সেই যে হোসনা, সুন্দরের আকর, সেও কি কম ঝামেলা ইয়াসিন? বল, ঝামেলা নয়?

ফাইলের আড়ালে তক্ষুনি বুঝি অদৃশ্য হয়ে যায় ইয়াসিনের মুখখানি। হোসনার নামে যত রাজ্যের লজ্জা এসে ঘিরে ধরে ওকে।

কত আশ্বিনের শেফালী ঝরে গেল। কত সুন্দর লগ্ন মাথা কুটে মরে গেল। তবু কি তুমি মোহাম্মদ ইয়াসিন, ঝামেলা মুক্ত হয়েছ? নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বলতে পার, ব্যর্থ যাবেনা আগামী আশ্বিনের সোনালী ভোর? এ বুঝি মালুর নিজেরই ভাবনার প্রক্ষেপ, অপূর্ণ কোন আকাঙ্খার খেদোক্তি? আপন মনে নিজেকে শোনাবার জন্যই বলে চলেছে।

মুখ সমেত মাথাটাকে টেবিলের তলায় চালান দিতে পারলেই বুঝি বেঁচে যেতো ইসাসিন। ফাইলের আড়াল থেকেই জবাব দেয়: হলাম গিয়ে ছাপোষা মানুষ। ঝামেলা ঝক্কিইতো নিত্যকার জীবন।

এবার হো হো করে হেসে উঠল মালু। বলল, এতক্ষণে খাঁটি কথাটি বলেছ ভাই। আরে ঝামেলা ঝক্কি, হাঙ্গাম হুজুতই থাকলনা, তবে আর বাঁচা কেন। ওই এক স্বাদ, টক মিষ্টি অম্বলের মতো।

কথাটার আগামাথা কিছুই বুঝলনা ইয়াসিন। হঠাৎ এমন বেদম হাসিরই বা কি কারণ ঘটল তাও ভেবে পায়না ও।

কিন্তু, গান গাইছেন না কেন? এটা অন্যায়। সংকোচ ভরে বলল ইয়াসিন।

হ্যাঁ অন্যায়। রাকীব ভাইও তাই বলেন। গম্ভীর আর ম্লান হয়ে গেল মালু।

চা এল।

যন্ত্রের ঠোঁট দিয়েই যেন চা টানে মালু, নিঃশব্দে। দৃষ্টিটা ওর ঘুরে বেড়ায় ঘরময়। ক্যালেণ্ডারে গত মাসের একটি তারিখের তলায় লাল পেন্সিলের দাগ। ঘড়ির কাঁটাটা কবে যে পাঁচের ঘরে পৌঁছে থমকে গেছে কেউ তার খবর রাখে না। সেকেণ্ডের কাঁটাটা পা পিছলে নিজের ঘর ছেড়ে অনেক দূরে এসে আশ্রয় পেয়েছে। আর একটি ক্যালেণ্ডারে বিদেশী মহিলার ছবি কেন যে মুখ ঢেকে ওদের দিকে পিঠ করে রয়েছে, বোঝেনা মালু।

উল্টো দিকে খোলা কপাট আর দেয়ালটুকুর ফাঁকে একটা মরা মাকড়সা চিৎ হয়ে ঝুলে রয়েছে। নিজের-জালে জড়িয়েই মরেছে বেচারী। ওপাশের জানালার শিকে ঝুলছে কালির ঝুল।

খেয়াল রাখছেনা মালু, তাই এমনি দুরবস্থা ঘরটির। ইচ্ছে হল করিম মিঞাকে ডেকে একটু ধমকে দিক। কিন্তু ডাকতে গিয়ে ওর গলার স্বরটা যেন নীচের দিকেই নেমে গেল। এ ঘরের সাথে সম্পর্ক তো তার চুকেই গেছে। কি হবে অযথা করিম মিঞাকে হয়রান করে।

গান তো আমি ছেড়ে দিয়েছি ইয়াসিন! অনেকক্ষণ পর ইয়াসিনের কথাটার জবাব দিল মালু।

গান ছেড়ে দিয়েছেন? না না না, এ আমি বিশ্বাস করি না। কি এক আকুলতায় যেন চেঁচিয়ে ওঠে ইয়াসিন।

ওরা বলে আমার স্বর নাকি বিধি নিয়মের বাইরে। তাই অপাংক্তেয়।

কিন্তু যা গাইছিলেন?

একটু যেন ভাবল মালু। বলল: যা আছে শুধুমাত্র সেটুকু দিয়ে কেউ তুষ্ট থাকতে পারে ইয়াসিন? তুমি পার?

তা আর পারি কই। চাকরী যখন ছিলনা তখন ষাট টাকাই মনে হয়েছে স্বর্গ। এখন আশি টাকায়ও অসন্তোষ। কেননা আজ আছি একলা, তাই কোনরকম চলছে। কিন্তু কাল?

হ্যাঁ হ্যাঁ। কাল তো তোমরা দুজন।

পরশু? তখন হব তিনজন, কি আরো বেশী। তোড়ের মুখে বলে ফেলেই বুঝি লজ্জা পায় ইয়াসিন। মুখটাকে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ঘুরিয়ে লজ্জা ঢাকে। ভবিষ্যতের নিশ্চিয়তা অনিশ্চিয়তা সব কিছু মিলিয়ে কেমন স্পষ্ট করে ভাবে ইয়াসিন। বর্তমানটা যেমন গণ্ডীবদ্ধ; কল্পনাটাও বুঝি তেমনি বলা ধরা, কখনো যায়না আয়ত্বের বাইরে। এরি মাঝে ছোট ছোট ইচ্ছার সুন্দর রূপায়ণ। আর সেটাই বুঝি জীবনের পরমতম আনন্দ। সব মিলিয়ে যেন বাহুল্য বর্জিত সাদাসিধে একতারা। একতারার সহজ স্বচ্ছন্দ সুর।

ইয়াসিন আর হোসনা, যাকে এখনো দেখেনি মালু, একটি সহজ জীবনের জন্য ওদের নিঃশব্দ আরাধনার কাথাটা ভাবতে গিয়ে আজ কেন যেন বিশেষ করে ভাল লাগল মালুর।

আর একদিন এমনিভাবে বিশেষ করে ভাল লেগেছিল ইয়াসিনকে। যেদিন শরমে লাল হয়ে ও জানিয়েছিল পয়লা আশ্বিনের কথাটা।

এই বুঝি ভাল। ওই একতারার মতো অনাড়ম্বর সহজ সুর। অনেক তারে টংকার তুলে অনেক ঝংকারের অনেক অমিলের তুরন্ত সমুদ্রে দিশে হারাবার বিড়ম্বনার চাইতে এই তো ভাল। যেমন ভাল উঁচু নীচু পাথর ছড়ান পথে টক্কর খেয়ে খেয়ে ক্ষত বিক্ষত হওয়ার চেয়ে ছোট্ট কোন নীড়ের মোলায়েম শয্যা।

হঠাৎ যেন আলপিনের খোঁচা খেয়ে চমকে উঠল মালু, কী সব ভাবছে ও। টাল হয়ে আছে চিঠি। বিরক্তি ভরে মালু ঠেলে দিল চিঠির টালটা। এ সব চিঠিতে আর কোন আকর্ষণ নেই ওর।

ফাইলের ভেতর মুখটা ডুবিয়ে আছে ইয়াসিন। সেদিকে তাকিয়ে বুঝি আগের কথাটারই জের টানল মালু: আমি বলছিলাম ভালর চেয়ে ভাল, উত্তমের চেয়ে উত্তম, সুন্দরের চেয়ে সুন্দরতর। অনাদি কাল থেকে মানুষের যে মন, তেমনি তার আকাঙ্খা, তার চাহিদা। এই স্বাভাবিক কথাটাকেই আমল দেয়না কিছু লোক।

ঘাড় গোঁজা কলম ঠেলা লোকটি বুঝি ঘাড়টাকে একটু সিধে করল। বিড় বিড় করে বলল: ভাগ্যিস গরীবের ওসব ঘোড়া রোগ নেই।

মালুর কান পর্যন্ত পৌঁছলনা কথাটা, ও জিজ্ঞেস করল, কিছু বলছ?

বলছিলাম হোসনার পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পয়লা আশ্বিন কিন্তু আপনাকে আসতেই হবে। উঠে এসে দাওয়াতের চিঠিটা মালুর হাতে তুলে দিল ইয়াসিন।

বাহ্। কার্ড ফার্ড সব ছাপান সারা? চমৎকার। খাম খুলে কার্ডটার উপর একবার চোখ বুলাল মালু। তারপর পিঠ চাপড়ে উচ্ছাসের বন্যা ঢেলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল ইয়াসিনকে। আনন্দটা যেন তারই, ইয়াসিনের নয়।

তা হলে ইয়াসিন, আশ্বিনের লগ্নটি সত্যি এল? এল পয়লা আশ্বিনেই? শিশির ছোঁয়ায় নরম হয়ে। শিউলির মতো পবিত্র হয়ে। মিষ্টি রোদে ঝলমলিয়ে। তাই না?

সলজ্জ হেসে সরে যায় ইয়াসিন। কাব্যিক হতে পারেনা ও অথবা জানেনা।

ইয়াসিনকে ছেড়ে বেরিয়ে এল মালু।

অকস্মাৎ মনের সমস্ত গ্লানি আর তিক্ততা কোথায় যেন উড়ে গেছে। মনটা ওর ভরে গেছে নির্মল এক আনন্দে। আহা, তবু তো এক জোড়া মানুষ সুখী হল পৃথিবীতে। এ পৃথিবীতে কোন মানুষকে সুখী দেখবার চেয়ে আর কোন বড় আনন্দ নেই।

একটি মেয়ে। সে যে এত যন্ত্রণা জানতনা মালু।

দুপুর বেলায় খেতে এসেছে মালু। কিন্তু, টেবিলের কাছটিতে এসেই সমস্ত ক্ষিধে ওর উবে গেল। ঘন কালির পোঁচ পড়ল ওর মুখে।

বিচ্ছে তো তোমার ডিম ভাজা আলু সেদ্ধ। মোরগ-পলাও আর কোর্মা এল কোত্থেকে? ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল মালু।

মুখ লুকিয়ে মিটমিট করে হাসে ছেলেটা।

এই প্রথম নয়। এর আগেও কয়েকদিন এ রকম হয়েছে। রিহানা এসে রান্না করে গেছে।

একটা একটা করে ডিসগুলো তুলে মেঝেতে ছুঁড়ে মারল মালু। ঝন-ঝনিয়ে টুকরো টুকরো হল চীনে মাটির বাসন খোরা।

দরন্ত ইচ্ছা জাগল মালুর—কয়টিই বা সিঁড়ি, টপ্‌টপ ডিঙ্গিয়ে উঠে যাক উপরে। কথার তীরে বিদ্ধ করবে রিহানাকে। ফুঁড়ে ফুঁড়ে রক্ত ঝরাবে। নোংরা হবে মালু। ইতর হবে, কুৎসিত হবে। স্বামীত্বের অধিকারে পরাভূত করবে ওকে। তারপর পাঁজা কোলা করে ওকে নিয়ে আসবে এক তলায়, সেই ঘরে যেখানে ওর বিকাশ, যেখানে ওর মর্যাদা।

ইচ্ছাটা ইচ্ছাই রইল।

ভীষণ হতে পারলনা মালু, ইতরও হতে পারলনা। পারলনা ছেলেটাকে উপরে পাঠিয়ে রিহানাকে একবার ডেকে আনাতে। এ সবে নিজেকেই ছোট করা হবে আর অপমান করা হবে রিহানাকে।

আশ্চর্য হয় মালু। ওর ভেতরের সেই শক্তিটা যার নাম পৌরুষ, যার নাম সংযম, সেই শক্তিটা বার বার ওর স্বামীত্বের অধিকার বোধটাকে খর্ব করে দিয়ে যায়। ও পারেনা নৃশংসতার উল্লরে নিষ্ঠুর হতে, ভয়ংকর হতে। ভেবে পায়না মালু, এ কি ওর পৌরুষ, না কি দুর্বলতা?

মালুকে খতিয়ে দেখতে হয় নিজের মনটা।

আচমকা কি এক আঘাত খেয়ে সারা দেহটা ওর টন টন করে উঠল। অবাক হল মালু। কখন নীড় বেঁধেছে একটি ভালবাসা। হৃদয়ের সহস্র পথে শিকড় চালিয়ে বেড়ে উঠেছে। টের পায়নি মালু। অথবা টের পেয়েও অস্বীকার করেছে। ও ভালবেসেছে রিহানাকে।

অথচ এই দুর্বল অর্থহীন অনভূতিটাকেই আপন পৌরুষের শক্তি বলে ভুল

করে এসেছে মালু? এখানেই বুঝি ওর সবচেয়ে বড় পরাজয় রিহানার কাছে।

রিহানা জানে, ভালবাসার দুর্বলতা নেই ওর। ভালবাসা ছিল না কোন-দিন। ছিল মোহ। সেই মোহ ওর ভেঙ্গে গেছে। তাই নিজকে সরিয়ে নিয়েছে ও, সরিয়ে নিতে পেরেছে এত সহজে। ও বুদ্ধিমতী। আপনার শক্তির উপর ওর অবিচল আস্থা। তাই তো পারছে ও অমন নৃশংস হতে। আর ও জানে মালুর রয়েছে ভালবাসার দুর্বলতা।

ডিশ ভাঙ্গার তিন কি চারদিন পর।

খুট করে একটা শব্দ হল। যেন বাতাসের গর্ত থেকেই উঠে এল রিহানা। বসল খাটের পাশে রাখা চেয়ারটিতে। বলল: কোথায় কোথায় থাক, সারাদিন তোমার যে দেখা পাওয়াই ভার। উল্টো অভিযোগ রিহানার।

ঘুরে বেড়াই। সংক্ষেপে বলল মালু।

সেই ভাল। মনের জ্বালা, সুরের জ্বালা সবই ভুলে থাকা যায়।

ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে আনল রিহানা। যেন দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা। তারপর প্রসঙ্গটা পাল্টিয়ে দিল: বেচারা চাকরটার উপর ঝাল ঝেড়ে লাভ কি? থালা বাসনগুলোরও কোন দোষ ছিল না। আমি তো ভাবলাম কি দক্ষযজ্ঞই না বাধিয়ে তুলেছো। নীচে নেমে দেখলাম তুমি বেরিয়ে গেছ।

কে বলে তোমায় আসতে? কেন আস? কেন এমন করে দিনগুলো আমার দুর্বিসহ করে তুলেছ?

ওরে বাবা! এ যে দেখছি রাগ! তাহলে রাগও হয় তোমার? রিহানার চোখে বিদ্রূপের ঝিলিক।

খুসি হয়েছ বুঝি? সীমার মাঝে নিজেকে বেঁধে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টায় ঠোঁটগুলো কেঁপে কেঁপে যায় মালুর। স্বরে আসে বিকৃতি।

খুসি হবনা? ভালবাসলেই ঈর্ষা আসে মানুষের। ঈর্ষা থেকে রাগ। এত উন্নতি হয়েছে তোমার। খুসি হব না?

মালুর দুর্বল জায়গাটুকুতেও হাসতে হাসতেই বুঝি বল্লমের তীক্ষ্ণ আগাটা বসিয়ে দেয় রিহানা।

এতো উন্নতি নয়। আমার অধঃপতন। কেমন ব্যথাতুর অসহায় মালুর গলাটা। যাক বাঁচলাম। অহংকারটা এখনো অটুট আছে তোমার। বিদ্রূপের ঝিলিকটা এবার তেরছা একটা হাসি ছুটে যায়।

বাঁচলে কি রকম? ওর কথায় বুঝি খেই পায়না মালু।

বাঁচলাম না? আমার তো ভয় ছিল দেখা হলেই পায়ের উপর লুটিয়ে পড়বে তুমি। যেমন পড়ে সব পুরুষ। ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না জুড়বে, উত্যক্ত করবে আমায়।

মালুর মনে হল ঠাণ্ডা মাথায় বুঝি খুনও করতে পারে রিহানা।

তা না করে যদি এখন বেঁধে রাখি তোমায়?

ও, স্বামীত্বের অধিকার ফলাবে? সেও পারবে না। তোমার অহংকারে বাধবে।

আমাকে ক্ষমা কর রিহানা। সেদিন অন্যায় করেছিলাম···

মালুর কথাটা শেষ হবার আগেই বলে গেল রিহানা: সেদিনের বর্বরতার জন্য তুমি অনুতপ্ত। সে তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি। কিন্তু, ওইটুকুও আর পারবে না। কেননা শক্তি তোমার ফুরিয়েছে।

ফুরিয়েছে বলছ তুমি? আমি বলছি স্বামীত্বের নৈতিক অধিকার, ভালো-বাসার নৈতিক জোর যে আমার পক্ষে। সেই তো আমার শক্তি। যে শক্তি আমি এই মুহূর্তে প্রয়োগ করতে পারি তোমার উপর।

আর আমার শক্তি ঘৃণা। ঘৃণা দিয়েই আমি রুখব তোমার বর্বরতা। তোমার জবরদস্তি।

ঘৃণা? যেন দূরাগত কোন আর্তনাদের মতোই রিহানার কথাটার প্রতিধ্বনি করল মালু।

আর ওই কালো বাজারের পাণ্ডাটি? ওখানে বুঝি শুধু ভালবাসার মিষ্টি সুধা? এতক্ষণে একটুখানি ইতরামির ঝাঁঝ ঢালতে পেরে যেন খুশি হল মালু।

অদ্ভুত। রাগলনা রিহানা।

আকর্ষণের, বন্ধনের শেষ সুতোটাও বুঝি ছিঁড়ে ফেলেছে ও। হয়ত তাই প্রতি আঘাতে উদ্যত হবার প্রয়োজনটাও ফুরিয়েছে।

গম্ভীর হল রিহানা। বলল: জানি ওসব নোংরা চিন্তাই গিস গিস করছে তোমার মাথায়।

কাজটাও নোংরা, অতি নোংরা, জঘন্য। ব্যভিচারণ। কথার চাবুক মেরে ছিঁড়ে খুঁড়ে ওকে বুঝি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে চায় মালু।

চেঁচিয়ো না। চাপা গলায় ধমক দিল রিহানা। দৃষ্টিটাকে তীরের ফলার মতো তীক্ষ্ণ করে ধরে রাখল মালুর মুখের উপর। বলল: অভিযোগটার জবাব দিতেও ঘৃণা বোধ করছি। কিন্তু, একটা কথা শুধাই, কালো বাজারের

পাণ্ডার কাছেই যদি আমি সুখ পাই তাতে তোমার অত জ্বালা কেন? একি গায়ক মহলে তোমার মান গেল বলে, না অন্য কিছু?

রিহানাও বুঝি ঠিক করে এসেছে আজ, স্থূল হবে, ভোঁতা হবে; এতটুকু আব্রু রাখবেনা শালীনতার অথবা রুচির।

ঠিক। আবগারি কর্তার কন্যার যোগ্য কথা বটে। মালুও ভোঁতা আঘাতটা ফিরিয়ে দিয়ে বিকৃত এক আনন্দের তৃপ্তি পেল।

অবশেষে রিহানাও বুঝি রাগল। মালু দেখল লাল রাগটা ওর ফর্সা মুখের ত্বক বয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গলার শিরায়।

এটা তো গালি হল। আমার কথাব জবাব হলনা।

জবাব যা সে তো তোমার কাছে, রিহানা। দেখছনা? রোয়াঁয় রোয়ায় জলছি আমি? অনুক্ষণ দগ্ধ হয়ে চলেছি? আমি যে আর সইতে পারছিনা রিহানা। নোংরা হতে গিয়ে ইতর হতে গিয়ে এ কি কাঙ্গালের কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল মালু?

কোন্ ছুমন্তরে উড়ে গেল রিহানার মুখের টকটকে রাগটা। তীক্ষ্ণ এক বিদ্রূপ ঝিলিক খেলে নেচে গেল ওর চোখের তারায়। তারপর গোটা শরীরটাকে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়ে দুলিয়ে দমকা হাসিতে যেন লুটিয়ে পড়ল রিহানা। থামতে চায়না ওর হাসি।

মালুর সারা গায়ে বুঝি ফোস্‌কা তুলে যায় ওর হাসিটা।

ইস্! শেষমেষ অহংকারটাকেও বিসর্জন দিলে? রইল কি তোমার? এর পরই হয়ত পায়ে ধরবে।

যেন সেরকম একটা পরিস্থিতিতে বিব্রত হতে চায়না রিহানা। তাই পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে যায় ও। চটর চটর চটির বোল তুলে উঠে যায় দোতলার সিঁড়িতে। কিন্তু কি মনে করে তখুনি ফিরে আসে। বলে, একটা সৎপরামর্শ দিতে পারি?

কি? ক্লান্ত স্বর মালুর।

গান ফানে যে কিছু হবেনা সে তো দেখতেই পাচ্ছ। রোজগারের অন্য পথ দেখ, তাতে রোজগারও হবে ভাল, মেজাজটাও থাকবে শান্ত। অপেক্ষা করেনা রিহানা। কথাটা শেষ করেই যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

অথচ, কী আশ্চর্য!

এই রিহানাকে কাঁদতে দেখল মালু। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছে রিহানা।

সারা সকাল আর দুপুর ইয়াসীনের সাথে ঘুরতে হয়েছে মালুকে। ইয়াসীন বিয়ের বাজার করছে।

দুপুরটা যখন বিকেলের দিকে গড়িয়ে পড়েছে সেই সময় বাসায় ফিরল মালু। দেখল বসবার ঘরের কপাটটা খোলা।

পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে বসবার ঘর। প্রথম দিন যেমন সাজিয়েছিল রিহানা মনে হয় ঠিক তেমনি। গতকালও এঘরে এসেছিল মালু একটা আলপিনের খোঁজে। ঘরে ঢুকেই দমটা আটকে এসেছিল। রিহানা উপরে উঠে যাওয়ার পর থেকেই ঘরটা বন্ধ। আলোহীন ঘরে ধুলো বালি জমে বিশ্রী গন্ধ আর গুমোটের রাজত্বটা জেঁকে বসেছে। তাড়াতাড়ি জানালাটা খুলে কোন রকমে নিঃশ্বাস নিয়েছিল মালু।

কাচঢাকা বইয়ের তাক, তারই এক কোনে আলপিনের বাক্সটা গুঁজে রেখেছিল মালু। শোবার ঘরে এসে ভেবেছিল এত সখ করে, এত যত্ন দিয়ে যে ঘরটা সাজিয়েছিল রিহানা সে ঘরটার কথা কি একবারও মনে পড়েনা ওর ?

অনেকদিন এঘরে বসেনা মালু। আজ বসল। পাখাটা ছেড়ে দিল। জামাটা খুলে ফেলল। হাওয়া খেয়ে গাটা ঠাণ্ডা করল।

অনুরাগ সুরুচি আর যত্নের হাত দিয়ে যে ঘরটা সাজিয়েছিল রিহানা হয়ত সে ঘরটার কথা মনে পড়েছিল ওর। হয়ত তাই আজ নিচে এসেছিল ও। পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে আবার উঠে গেছে ওপরে। হয়ত তক্ষুনি তক্ষুনি উঠে যায়নি রিহানা। পরিশ্রম করে হাঁপিয়েছিল। দু দণ্ড বিশ্রাম নিয়েছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে নিশ্চয় ওর মনে পড়েছিল অনেক কথা, প্রথম প্রেমের আশ্চর্য মধুর অনুভূতিগুলোর কথা, ঘুম ঘুম আবেশে মুগ্ধ প্রহরগুলোর কথা।

সত্যি কি তাই ? সে সব কথা কি আজ মনে পড়ে রিহানার ? ওর ভাবনার পৃথিবীতে কি জেগে ওঠে সে সব মুগ্ধ প্রহর ?

আসলে এটা মালুরই মনের মাধুরী। এক দণ্ড বসেনি রিহানা। কোন কিছু ভাবেনি। তীব্রভাবে তীক্ষ্ণভাবে কোন কিছু অনুভব করার ক্ষমতা ওর নেই, ছিলনা কখনও। ওর আছে প্রত্যাঘাতের হৃদয়হীন নিষ্ঠুর স্থূল ইচ্ছা। সেই ইচ্ছাটাই ওকে টেনে এনেছিল।

ঘরময় ঘুরে বেড়ায় মালুর চোখজোড়া।

একটা জাপানী পুতুল কিনেছিল রিহানা। দাম নিয়েছিল সাড়ে তিন শো টাকা। দামের অঙ্কটা শুনে মালু প্রায় হার্টফেল করছিল। কিন্তু রিহানা ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আসলে পুতুলটা বেশ সস্তাই হয়েছে। দোকান থেকে এনে যেখানে রেখেছিল রিহানা ঠিক সেখানেই রয়েছে পুতুলটা।

ফুলদানির সখ ছিল রিহানার। দেশী, বিলেতী, জাপানী—নানা দেশের, নানা সাইজের, নানা রঙের ফুলদানি। কোনটা চীনে মাটির, কোনটা বাঁশের, কোনটা কাঠের, কোনটা শেলাকের, কোনটা খাঁটি দেশী মাটির, মসৃণ পলিশ করা, কোনটা পেতলের, নিরলঙ্কার অথবা মোরাদাবাদী কাজ করা।

ঢাকার দোকানে যত দেশের যত কিসিমের ফুলদানী পাওয়া যায় সবই এনে জড়ো করেছিল রিহানা। আতঙ্কিত মালু চেঁচিয়ে উঠেছিল, এ কী করছ রিহানা? ঘরটাকে কি ফুলদানির দোকান বানাবে?

মালুর শঙ্কিত চীৎকারটা গায়ে না মেখে বলেছিল রিহানা, দেখই না কেমন করে সাজাই।

মালু দেখেছিল এবং চুপ করে গেছিল। ওকে চুপ হতে হয়েছিল কেননা ঘরের কোণে, সো কেসের মাথায়, দরজার পাশে, বইয়ের তাকের ফাঁকে, কোথাও ফুলের গুচ্ছে, কোথাও বিনা ফুলে ফুলদানিগুলোর অবস্থান ওকে খুসি করেছিল। বিজয়িনীর হাসি হেসেছিল রিহানা।

ঘরময় ঘুরে বেড়ায় মালুর চোখ। সেই পুতুল, ফুলদানী, সেটির পেছনে রিহানার নিজের হাতের বুটি-কাজ, যেটি যেখানে ছিল তেমনি রয়েছে। নেই শুধু রিহানা।

খচ করে কি যেন বিঁধে গেল বুকের ভেতর। বুকের ভেতর সেই চিন চিন ব্যথাটা। রিহানা নেই ওর জীবনে, এই নিষ্ঠুর সত্যটাকে আজও মেনে নিতে পারছেনা মালু। মেনে নিতে কষ্ট হয়।

বুঝি এই কষ্টটাকে অস্বীকার করার জন্যই গাঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল মালু। হাতে তুলে নিল পাঞ্জাবিটা, এল শোবার ঘরে।

বিছানার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল সে। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রিহানা। রিহানা কাঁদছে।

হতভম্ব মালু। কি করবে, কি করা উচিত জানেনা ও। এই মুহূর্তে গোটা দোতলা বাড়িটাই যদি ভেঙ্গে পড়ত ওর মাথায় তাহলেও বুঝি এমন বেদিশ হতনা মালু।

বিছানায় রিহানার পাশে বসে ওর মাথায় সান্ত্বনার হাতটা বুলিয়ে দিতে চাইল মালু। পারল না।

রি—, প্রিয় সম্বোধনে রিহানাকে ডাকতে চাইল মালু। পারল না। আওয়াজ নেই গলায়।

বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রিহানা। কান্নাটা যেন আসছে দুর্বার কোন স্রোতের মত। ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। বুঝি তাই বালিশটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে রয়েছে রিহানা।

দুহাতে টেনে নিক কান্না-চোচির দেহটাকে। অনুরাগে চুম্বনে মুছে দিক ওর সমস্ত কান্না। দুরন্ত ইচ্ছেটা মালুকে টেনে আনল বিছানার মাথায়, রিহানার খোলা বাহুর পাশে।

তৎক্ষণে মুখ তুলেছে রিহানা। চোখ মেলেছে। আধ-ভেজা বালিশটাকে সরিয়ে রেখেছে একপাশে। ভেজা এলোমেলো চুলে ঢাকা পড়েছে রিহানার আর্ধেকখানি মুখ, একটা চোখ। কানের পাশের গুঁড়ো গুঁড়ো চুলগুলো মানচিত্রের চিকণ কালো রেখার মত সেঁটে রয়েছে ওর গালে। কান্নার মাঝেও এমন সুন্দর রিহানা?

মালুর বুক জুড়ে ভালবাসা। ভালবাসাটা কি এক করুণার নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল, মালুকে ভাসিয়ে নিল।

ভালবাসা দুর্মর। দুর্নীবার রিহানার আকর্ষণ। এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি মিথ্যা। মিথ্যা সঙ্গীত, মিথ্যা গানের আরাধনা, চেতনার কশাঘাত, দায়িত্বের বোঝা। সত্য শুধু রিহানা। এই মুহূর্তে সব কিছু ছেড়ে দিতে পারে মালু রিহানার একটি মধুর নির্দেশে।

পাখির পালকের মত মসৃণ রিহানার বাহু। সে বাহুটাই স্পর্শ করল মালু। রেশমের মত মিহিন পিছল চুল রিহানার। সে চুল স্পর্শ করল মালু। কানের নীচে রিহানার বাহুর পাশটা জড়িয়ে রয়েছে একগোছা চুল। একদিন বুঝি এখান থেকেই রিহানা এক গুচ্ছ চুল কেটে নিয়েছিল, সোহাগ করে গুঁজে দিয়েছিল মালুর হাতে। সে চুলগুলো এখনও লম্বা হয়নি।

ভালবাসার মতই বুঝি ভালবাসার কান্না। এর কোন শুরু নেই, এর কোন শেষ নেই। অথবা এর শুরু আছে, শেষ নেই। মালুর বুক জুড়ে সেই কান্নার ঢল।

আর একটু কাছে এল মালু। রিহানাকে টেনে নিল কোলের পাশে।

বলল, চল রি—। আমরা চলে যাই অন্য কোথাও, অনেক দূরে; যেখানে

জাতের বড়াই নেই, ধনের দম্ভ নেই। যেখানে মিথ্যার আঘাতে মৃত্যু হয় না ভালবাসার। যেখানে গুণের সমাদর। চল যাই সেখানে।
আহ্। বিরক্ত হল রিহানা। ঠেলে বিছানা থেকে সরিয়ে দিল মালুকে। এক চোখেই তাকিয়ে আছে রিহানা। চোখের পাতাগুলো এখনও ভেজা। অশ্রুর কণাগুলো এখনও শুকায়নি। চোখের কোন দিয়ে গড়িয়ে পড়া কান্নার দাগটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে মালু।
উহ্! যাও তো তুমি। আমাকে একটু একলা থাকতে দাও। দোহাই তোমার। চেঁচিয়ে উঠল রিহানা। কান্নার ঢেউ হয়ে ভেঙ্গে পড়ল আবার।
বসবার ঘরে এল মালু। তারপর বারান্দায়। বারান্দা থেকে চত্বরে পাম গাছটির তলায়।
পাম গাছের তলা থেকে ও শোনা যাচ্ছে রিহানার কান্না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রিহানা।
কেন অমন করে কাঁদছে রিহানা?
পাম গাছের তলায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নটার জবাব খোঁজে মালু।

রিহানা কি নামবেনা?
দোতলার বাসটা কি চিরস্থায়ীই করে ফেলল ও?
একটু চিকন হাওয়া। হলুদ রঙ বিকেল। এক চিলতে পড়ন্ত রোদ পাম গাছটির মাথায় চড়ে দোল খাচ্ছে ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত সুখে, সে দিকে চোখ রেখে বিদায়ের রাগিণীটি কি এক করুণ সুরে বেজে উঠল মালুর বুকের কোমলতায়।
কিন্তু আজ যদি নামত রিহানা। চটচট চটির বোল তুলে আঁচল উড়িয়ে যদি নিচে আসত একবার!
যেমন ও আসে অসতর্ক অপ্রস্তুতির মুহূর্তে। কখনও সকালে কখনও বা এমনি হলুদ রঙ বিকেলে। নিঃশব্দ যন্ত্রণার হুল ফুটিয়ে আবার চলে যায়। রেখে যায় দাগ, নরম মাংসে নৃশংসতার চাবুকের মত। হাজার চেষ্টাতেও যা মুছে ফেলা যায়না। জেগে থাকে নিষ্ঠুরতার কাল চিহ্ন হয়ে।
চিতি পড়ে বিশ্রী হয়ে আছে টেবিল ল্যাম্পের পেতলের ষ্ট্যাণ্ডটা। ব্রাসো ঘঁসে পরিষ্কার করে রিহানা। ঢাকনিটার উপর জমেছে ধুলোর আস্তর। ঝেড়ে সাফ করে যথা স্থানে বসিয়ে রাখে রিহানা।

বিকেলে ঘরে ঢুকেই চোখে পড়ে মালুর, ঝকঝকে পেতলের গায়ে ওরই মুখের প্রতিবিম্ব। যেন অদৃশ্য চাবুক পড়ে চাক চাক তুলে নেয় ওর গায়ের মাংস। ক্ষিপ্র হাতে বাতিদানিটা তুলে নেয় ও, আলমারির শেষ তাকে ছুঁড়ে দিয়ে চাবি আঁটে।

পরদিন বেরুলনা মালু। অপেক্ষা করে রইল ঘরে। কিন্তু রিহানা এলনা। তার পরদিনটাও শুয়ে কাটিয়ে দিল মালু। রিহানা যখন নামবে একবারটি শুধু শুধাবে ওকে, কি আনন্দ পাও রিহানা আমাকে অমন যন্ত্রণা দিয়ে? কিন্তু কোথায় রিহানা।

আজ ওসব কথা কিছুই বলবেনা মালু। যে মুখে অজস্র ভালবাসার চুম্বন এঁকেছিল মালু সে মুখটা আজ দুহাতে তুলে নেবে ও। মোমের মত নরম যে চোখ, মোমের মত স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলত যে চোখের তারা, যে চোখের কোমল গভীরে ও দেখেছিল ওর সুরের প্রতিবিম্ব ওর গানের ঝংকার, দুঃসাহসী হবার প্রেরণা, সে চোখের উপর চোখ রাখবে মালু শেষ বারের মত। উৎকর্ণ হলো মালু।

অনেকগুলো মেয়েলী কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে দোতালায়। ওরা ছয় বোন আর রিহানা। হয়ত সবাই মিলে ওরা বেরুবে এক্ষুনি। হয়ত একলাই বেরুবে রিহানা। বেরুবার পথে একবার উঁকি মারবে এখানে।

নাঃ। দোতলাটা আবার নিঃশব্দ। মনে হয়না কেউ রয়েছে সেখানে। পাম গাছের মাথায় সেই এক চিলতে হলুদ রোদ, এখনও দোল খাচ্ছে ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত সুখে।

কিন্তু, আজ নামছেনা কেন রিহানা? ওকে ভীষণ দরকার মালুর।

শেষ কথাটা কতবারই তো কতভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরস্পরকে বলেছে ওরা। তবু যেন বলা হয়নি। আজ শেষ বারের মত শেষ কথাটা বলতে চায় মালু। শব্দে নয়, নিঃশব্দ ক্ষমা প্রার্থনায়।

কবেনা দেখা হয়েছিল রিহানার সাথে? দিন পাঁচেক হয়ে গেল বুঝি। অফিস থেকে ফিরেছে মালু।

একতলার বারান্দাটায় পায়চারি করছে রিহানা, বোধহয় অপেক্ষা করছে মালুর জন্য। মালুকে দেখেই বলল, একটা দরকারি কথা আছে তোমার সাথে।

ওরা এল সেই ঘরটিতে একদা যেটা ছিল ওদের শোবার ঘর। বসল সেই যুগল শয্যাটায় যেখানে এখন এ পাশ ও পাশ করে কাটে মালুর নিঃসঙ্গ রাত।

চাবির গোছাটা দাও দেখি? হাত বাড়াল রিহানা।

আমি কি আর চাবির খোঁজ রাখি? দেখ, যেখানে রেখে গেছিলে সেখানেই হয়ত রয়েছে।

হ্যাঁ। ঠিক সেখানেই, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে হাত গলিয়েই চাবির গোছাটা পেয়ে গেল রিহানা।

ছড়া থেকে একটা লম্বা গোছের কুঞ্জি আলাদা করে নিল রিহানা। খুলে ফেলল আলমারির ডালাটা। তারপর আর একটি ছোট গোছের চাবি ঘুরিয়ে খুলল ভেতরের দেরাজ। দেরাজ থেকে বেরুল আরও দুটো মাঝারি ধরণের চাবি। ওদের মাথায় কাল সুতোর আঁটুনী।

চাবি দুটো হাতে নিয়ে দেরাজটা ঠেলে দিল রিহানা। আলমারির একটি কেবাড় ভেজিয়ে দিল। মোড় নিল। ভেজান কেবাড়টায় পিঠ রেখে শুধাল, কি ভাবছ?

ভাবছি পালিয়ে যাওয়া বৌ ফিরে এলে কেমন লাগে। চেষ্টা করেই সহজ হল মালু।

লাগেনা, বল, কেমন লাগবে। শুধরিয়ে দিল রিহানা। তার পর চোখের ঢল থেকে হঠাৎ এক পশলা কৌতুহল ঝরিয়ে শুধাল, গানটান ছেড়ে দিলে নাকি?

প্রায়।

সকালে তো আর গলা সাধছনা।

না।

শুনলাম চাকরিটাও নাকি ছেড়ে দিয়েছ?

হ্যাঁ।

এবার বুঝি বিবাগী হবে?

হ্যাঁ।

তা জাহান্নামেই যাও আর বুড়িগঙ্গাতেই ঝাঁপ দাও, আমি তার কি করতে পারি?

কিছুই না।

এক বা দু অক্ষরের ঠাণ্ডা উত্তর মালুর। খোঁচা খোঁচা বরফের মতো, রিহানার গায়ে গিয়ে বিঁধে থাকুক তাই বুঝি চায় ও। কিন্তু বিঁধছে কি? চোখের মনিদুটোকে ছোট্ট করে তাকাল রিহানা, ঠোঁটের সীমানায় টানল তাচ্ছিল্যের রেখা, বলল, কি ব্যাপার, আজ যে দেখি আর এক মূর্তি!

কি যেন দরকারের কথা বলছিলে? পাশ কাটিয়ে যায় মালু।

হ্যাঁ, বলছি। কাবিনের স্বাক্ষরটা এখনো মুছে যায়নি।

মানে?

মানে, এখনো আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। রাহা খরচের দাবিদার।

অমানুষিক শক্তিতে আত্মসংবরণ করল মালু। দাঁতের ফাঁকে চেপে রাখল ঠোঁট জোড়া।

অথচ একদিন খোঁজও নিলেনা, খাই কি, পরি কি! কমজাতে জন্ম নিলে মানুষ বুঝি এমনি ইতর আর দায়িত্বহীন হয়? কথাটা পুরোপুরি শেষ করল রিহানা।

তারপর ও আলগা করল আলমারির ভেজান কেবাড়টা। কাল সুতোয় বাঁধা চাবি দুটো পর পর ঘুরিয়ে বড় দেরাজের নীচে আর একটি দেরাজ খুলে ফেলল। সেখান থেকে বের করে আনল গয়নার বাক্সগুলো। খুলে বুঝি মিলিয়ে দেখল যা যা রাখা ছিল সব ঠিক আছে কিনা।

বিয়ের সময় রাকীব সাহেব সেজেছিলেন কন্যাপক্ষ। জাহেদ আর রাবু বরপক্ষ।

তাড়াহুড়ো বলে কি নতুন বৌকে বাসর ঘরে পাঠাবে একেবারে সোনা শূন্য? সে হতেই পারেনা। রাকীব সাহেব আর রাবু দৌড়ে গেছিল বাজারে। হাতের গলার কানের বাজুর কোন অঙ্গের কোন পদই কিনতে বাকী রাখেনি ওরা।

আহা। বাপ মা, আপন জন কেউ নেই এই সুখের লগ্নে। কনের মতো করে সাজাও গো। যেমন করে ওর মা সাজিয়ে দিত তেমনি করে। একটি একটি করে গয়নাগুলো পরিয়ে দিচ্ছিল রাবু আর পাশে বসে বলেছিলেন রাকীব সাহেব।

এ সব স্মৃতির বুঝি কোন দাম নেই রিহানার কাছে।

পরে সে গয়নার সাথে আরো কিছু অনুরাগের উপহার জুড়ে দিয়েছিল মালু।

এ সব তো আমারই জিনিস, নিয়ে যাচ্ছি। বিক্রী করে দেব, বলল রিহানা।

এত নির্লজ্জ ও হতে পারে কোন মেয়ে?

না। এটাকে নেহাৎ নির্লজ্জতা বলে মেনে নিতে পারল তো বেঁচেই যেত মালু। ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথায় যে মেয়ে নিত্য নতুন পীড়নের পন্থা উদ্ভাবন করে চলেছে এতো তারই আর একটি নির্যাতন। আঘাত পাবে মালু। কত সোহাগ আর অনুরাগ মেশানো স্মৃতিটাকে এখনো মনের কোণে লালন করে চলেছে মালু সেখানে পড়বে আর একটি হাতুড়ির ঘা।

তাই তো অলংকারগুলো বিক্রী করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে রিহানার। হয়ত সত্যি টাকার দরকার পড়েছে ওর। হাত খরচ ও পাবে কোথায়? মেয়েদের স্কুলের বইয়ের মতো গয়নার বাক্সগুলো বুকের কাছে দুহাতের বেড়ে গুছিয়ে নিল রিহানা। শুধাল, কিছু বলবার আছে?

না।

একটি মেয়ে সে কি এত যন্ত্রণা? কতদিন ভেবেছে মালু। আজও ভাবল। এমনি যন্ত্রণা হয়েই নেমে আসে ও।

ময়লা হয়ে গেছে বিছানার চাদরটা। পাল্টিয়ে ধোয়া চাদর বিছিয়ে দেয় রিহানা। উত্তরের জানালা দিয়ে তেরছা ভাবে রোদ পড়ে বিছানায়, এতদিন লক্ষ্য করেনি কেউ। রিহানা খাটটাকে সরিয়ে আনে আর একটু দক্ষিণে। আসে রিহানা, যাবার আগে এমনি সব নির্যাতনের উপকরণগুলো সাজিয়ে রেখে যায়। রেখে যায় তীক্ষ্ণ ধার তোলা শান দেয়া অস্ত্রের মতো। মালু যখন ঘরে ফিরবে, ক্লান্ত হাত পা-গুলো আলগা করে আরাম কেদারাটায় এলিয়ে দেবে দেহটা, পীড়নের ওই অস্ত্রগুলো তীক্ষ্ণধার ফলা উঁচিয়ে ঘিরে ধরবে মালুকে। খোঁচায় খোঁচায় জর্জর করবে ওকে। রক্ত ঝরাবে। পরাজিত ক্লান্ত মালু দুহাতে মুখ ঢেকে ঢলে পড়বে বিছানায়। অথবা অস্থির যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবে ঘরের বাইরে।

মালুর যাকে মনে হত সুরভির কন্যা, এত বিষ তার হৃদয়ে?

কিন্তু সবটাই কি নির্ভেজাল বিষ, শুধু নৃশংসতার হুল ফোটান?

তাই যদি হবে তবে কেন ওর অনুপস্থিতিতেই নেমে আসে রিহানা। হাজার তম্বি-তদারকে অস্থির করে তোলে চাকরটাকে। রেখে যায় ওর উপস্থিতির চিহ্ন?

আপন মনের গহীনে মালু নিজেও কি সম্পূর্ণ করে নিঃশংসয় হতে পেরেছে? সুরের মেয়ে, সুরভির মেয়ে, যে চায়না মুক্তি, আজ তার সবটাই কি শুধু যন্ত্রণা?

মনে পড়ল মালুর।

লজ্জা করে না এমন ভালমানষির অভিনয় করতে? কেন? কেন সেদিন আমার সাময়িক ভাবালুতার সুযোগ নিয়েছিলে তুমি? কোথায় ছিল আজকের ঔদার্য? আজ·····না পারি দুটো বন্ধুকে বাড়িতে আনতে। না পারি সমাজে মাথা উঁচু করে চলতে।·· উদাসীনতার ভণ্ডামী জানিনা আমি। আমার যন্ত্রণা হাজার গুণে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমার তৃপ্তি।

সেই দুর্ঘটনাটি তখনও ঘটেনি। রিহানা দোতলায় উঠে যায়নি। সে সময় ওরা থাকত এক তলার এই ঘরটিতেই। একই বিছানার দু প্রান্তে নির্জীব জড় পদার্থের দুটো পিণ্ডের মতো পড়ে থাকতো। মালু বলেছিল: এস বিদায় নিই, তুমি যাও তোমার সোজা সড়কের মসৃণ পথে, আমি চলি আমার দুর্গমে।

জবাবে সেদিন আরো কত কথার হুল ফুটিয়েছিল রিহানা।

আশ্চর্য! এই রিহানা কাঁদতে পারে। কেন অমন ক'রে কেঁদেছিল রিহানা?

পাম গাছের মাথার সেই হলুদ রোদটা সরে গিয়ে কখন যে সন্ধ্যা নেমেছে লক্ষ্য করেনি মালু। সেই সন্ধ্যাটা রাতের আঁধারে গাঢ় হয়ে উঠেছে। উঠে এসে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল মালু। ভেতর আর বাইরের অন্ধকারটা মিশ খেয়ে একাকার হল।

কালও তো এসেছিল রিহানা। তার আগের দিনও। দেখা হয়নি মালুর সাথে। ঘরে এসে পেয়েছিল ওর চুলের গন্ধ, গায়ের সুবাস। এখনো কি গন্ধরাজ ফুল খোঁপায় পরে ও?

দেখা হলেও ওর খোঁপাটার দিকে বুঝি তাকায় না মালু। অথবা প্রাণপণে অস্বীকার করতে চায় ওর গায়ের, ওর চুলের সেই চেতনা-অবশ-করা সুবাসটি। কিন্তু, আজ যদি দেখা হত, হাতে ধরে ওর সুন্দর খোঁপাটা স্পর্শ করত মালু।

না। রিহানা আজ নামল না।

বিদায়ের সাক্ষাৎ বুঝি এলনা ওদের জীবনে। ক্ষমার ঔদার্যে, একটু বা উপলব্ধি, কিছু বা মমতার ধারায় ভিজিয়ে দিয়ে বলা হলনা শেষ কথাটা। মালু চেয়েছিল যাবার দিন আজ একটি গান শোনাবে রিহানাকে। অনেক-দিন আগে একটি নতুন গানে সুর বেঁধে রেখেছিল ও। গাওয়া হয়নি সে গান। গাওয়া হলনা।

খুট করে শব্দ হল। বাতি জ্বলল।

ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল মালু।

রিহানা এল কি?

না। রিহানা নয়। কাজের ছেলেটা।

সায়েব ভাত দেব? শুধাল ছেলেটা।

না। আমি খাবনা, তুই খেয়ে নে।

জানালাটা বন্ধ করে দিল মালু। বিছানার উপর তা করে রাখা জামা-কাপড়গুলো ভরে নিল সুটকেসে। ঘড়িটার দিকে তাকাল। এখনও সময় আছে হাতে।

রিহানা এল না। রিহানার সাথে দেখা হল না।

সেই ভাল। মালুর জীবনের সীমানা থেকে দূরে থাকুক রিহানা। সেই ভাল। আসলে ভালবাসা নয় রিহানা। রিহানা তেমন একটি দুর্ঘটনা যা অভিজ্ঞতার সম্পদ হয়েই বেঁচে থাকে জীবনে।

বাঁ হাতটা বুক পকেটে লেগে খস খস করে উঠল। কয়েকবার পড়া চিরকুটটা পকেট থেকে বের করে আনল মালু। আবার পড়ল।

মালু,

ভীষণ বিপদ রাবুর। আমি যাচ্ছি। তুইও চলে আয়। দেরি করিসনে কিন্তু।

মেজো ভাই।

পনের দিন আগের তারিখ দেয়া চিঠি। একটি লোক এসে আজই সকালে পৌঁছে দিয়ে গেছে মালুর হাতে। ভেবে পায়না মালু, এমন কি বিপদ হতে পারে রাবুর।

খামে ভরে চিঠিটা আবার পকেটে রেখে দিল মালু, উঠে দাঁড়াল।

ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিল হাত ব্যাগ আর সুটকেসটা। টিপে দিল সুইচ। নেমে এল সুমুখের খোলা চত্বরে।

সংখ্যাহীন নিঝুম রাতের সাক্ষী আর অনেক গানের শ্রোতা পাম গাছটির তলায় এসে দাঁড়াল মালু। তাকাল দোতলার দিকে। যেন তীর খেয়ে ফিরে এল ওর চোখ। পাম গাছের ছমছমে ছায়াটা মাড়িয়ে রাস্তায় পড়ল সে।

সবুজ ঘাস। ঘাসের নীচে নরম মাটি।

আলের পথ। তেড়া বাঁকা।

হৈমন্তী ধানে ভরা মাঠ। কারা যেন গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা ছিঁটিয়ে, ছড়িয়ে বিছিয়ে এতটুকু ফাঁক রাখেনি মাঠে। সোনা রঙ মাঠের বুকে হেসে খেলে গড়িয়ে পড়ছে হেমন্তের রোদ। সোনা রোদ। মিষ্টি রোদ।

আকাশের রোদ আর পৃথিবীর রঙে এমন মিতালি কতদিন দেখেনি মালু। ওর বুক জুড়ায় মন জুড়ায়। নেচে নেচে বেড়ায় ওর চোখ। পাকা ধানের

গন্ধে, নরম মাটির স্পর্শে ও যেন সেই ছোট্ট মালু। ছুটে চলেছে আলের পথ ধরে।

মিষ্টি রোদে গা ডুবিয়ে নাইল মালু। রোদ তো নয়, কাঁচা তরল সোনা। সোনার তরঙ্গ। ছোঁয়া যায়। ধরা যায়। অনুভব করা যায়। হাতের মুঠোয় পুরে আবার ছিঁটিয়ে দেয়া যায়।

কোণাকুণি মাঠের আল ভেঙ্গে মালু উঠে এল ট্রাংক রোডে।

ইট ছাওয়া ট্রাংক রোড।

কবে না যুদ্ধ হয়েছিল? এই ট্রাংক রোডের দুপাশে ধ্বংস মৃত্যু আর কান্নার কি তাণ্ডবই না বয়ে গেছিল সেদিন!

আজ মনে হয় সে যেন দূর অতীতের কোন দুঃস্বপ্ন। বিভীষিকাটা তার মুছে গেছে মন থেকে, তেমনি ঘটনাগুলোও ঝাপসা হয়ে এসেছে। স্মৃতির পটে চকমকি ঘঁসে তাদের জাগিয়ে তুলতে হয় বুঝি। শুধু মালুর নয়, হয়ত সব মানুষেরই স্মৃতি, শক্তিটা এমনি ক্ষীণ।

তবু যুদ্ধের ক্ষত একেবারে মুছে যায়নি এ অঞ্চল থেকে।

মাটির ট্রাংক রোড, যুদ্ধের সময় মাটির বুকে পড়েছিল ইটের গাঁথুনি। কোথাও বা পীচ। কিন্তু ভারী ট্রাক ট্যাংক কামান বন্দুক বয়ে বয়ে ট্রাংক রোডের ইট গাথা বুকখানি আজ হাড়জর্জর। কোথাও ইট উপড়ে তলার মাটি হাঁ মেলেছে। কোথাও ভাঙ্গা ইট শিথিল গাঁথুনি থাবলা থাবলা ঘা তুলেছে। ফলে রাস্তার মাঝখানটি হয়ে পড়েছে অকেজো। দু পাশটিতে যেখানে নরম মাটি ভাঙ্গা ইটের গুঁড়ো খেয়ে খেয়ে বুঝিবা গোত্রান্তরের চেষ্টায় গায়ের রঙে এনেছে ঈষৎ লাল আভা, সে দিক দিয়েই এখন গাড়ি ঘোড়া মানুষের চলাচল।

দুধারের গ্রামগুলোতে এখনো চোখে পড়ে কাঁচা ঘরের পাশাপাশি নীচু দেয়ালের ব্যারাক, গুদাম। টিনগুলো বিক্রী হয়ে গেছে নীলামে, নিরাবরণ দেয়ালগুলো গায়ে শ্যাওলা মেখে দাঁড়িয়ে আছে বিগত যুদ্ধের সাক্ষী আর কৃষকদের হাজারো অসুবিধার কারণ হয়ে।

রাস্তার পাশে মাটির নীচে তৈরী হয়েছিল বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় নেবার ঘর। সেই আশ্রয় শিবিরের ছাদটা এখনও অটুট, রাস্তা থেকে হাত দুই উঁচু। এখন সেটা নামাজের যায়গা।

রাস্তার কিনার ঘেসে দূর্বার উপর দিয়ে মাটি আর দূর্বার স্পর্শ নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে মালু।

শাঁ করে বেরিয়ে গেল একটা গাড়ি। আবলুস রঙের নতুন আর আধুনিক মডেলের গাড়ি। এ রাস্তায় অমন একটা গাড়ির উপর চোখ না পড়ে পারে না। মালুরও চোখ পড়ল।

কিছু দূর গিয়েই ব্রেক কষে থেমে গেছে গাড়িটা। দরজা খুলে অতি ধীরে বেরিয়ে এসেছে এক জোড়া পা। তারপর মাঝারি গোছের একটি বপু। বপুর সাথে অত্যন্ত আয়েশী মেজাজে বেরিয়ে এল চালতের মতো গোলাকৃতি রসে টইটম্বুর একখানি মুখ। সে মুখে পাকা টমাটোর ছিলকের মতো চকচকে আভা।

মালুর দিকে চেয়েই চেয়েই যেন লোকটি দু পাটি দাঁত বিস্ফারিত করল। তাড়াতাড়ি কাছে আসার ইশারা জানাল।

ইতস্ততঃ করল মালু। তাকাল পেছন দিকে। সেই যে ছাতা বগলে হন হনিয়ে আসছিল একটি লোক, সে বুঝি অনেক কাছে এসে পড়েছে।

চালতের মতো মুখখানি ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। তুলে নিয়েছে মালুর একখানি হাত নিজের হাতে। বলছে : ভাগনে যে আমায় চিনতেই পারেনি দেখি। মাশাল্লাহ্, গায়ে গতরে তো বেশ জোয়ান হয়েছিস!

এ কণ্ঠ চিনতে ভুল হবে কেন মালুর? সেই লাল মতো কুঁত কুঁতে এক জোড়া চোখ। ফোলা গালের থলেথলে মাংসটা উপরের দিকে ঠেলে উঠে প্রায় ঢেকেই দিয়েছে চোখ দুটো। তাই তো এতক্ষণ চিনতে পারেনি মালু।

যেন সন্দেহ-মুক্ত হবার জন্যই লোকটার কানের দিকে তাকাল মালু।

বেচারা রমজান! কাটা কানটাকে ঢেকে রাখবার কোন ব্যবস্থাই এখনো করতে পারেনি ও।

আয় আয় গাড়িতে উঠে আয়। ওর হাতের সুটকেশ আর ব্যাগটা তুলে নিয়ে ড্রাইভারের পাশে রেখে দিল রমজান। ওকে জড়িয়ে ধরল।

অনেকদিন পর এলাম কিনা গ্রামে, হাঁটতে বড় ভাল লাগছে। আপনি যান। হেঁটেই আসছি আমি। ওর অস্বস্তিকর আলিঙ্গন থেকে আলা হয়ে বলল মালু।

ঠিক ঠিক। যে শক্ত মাটি শহরে। আমি হেন লোক হাঁপিয়ে উঠলাম সেই রেঙ্গুন শহরে, যাকে বলে শহরের রাণী। পারলাম কই থাকতে? সেই বাপ দাদার দেশেই তো ফিরে আসতে হয়েছে। মালুর সবিনয় প্রত্যাখ্যানে বুঝি বিব্রত রমজান। তাই নিজের কথাটা পেড়ে মালুকেই সমর্থন জোগাল

চিনলেন স্যার? আবদুল মালেক, নামজাদা গাইয়ে। আমাদের গ্রামের রত্ন। গাড়ির ভেতরে ভারি মুখ ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল রমজান। পরিচয় করিয়ে দিল মালুর সাথে, আমাদের কণ্ট্রোলার সাহেব।

হ্যাঁ হ্যাঁ রেডিওতে প্রায়ই শুনি ওনার গান। রেকর্ডও কয়েকখানা আছে আমার বাড়িতে। গাড়িতে বসেই হাত বাড়িয়ে মালুর সাথে হাত মিলাল ভারি মুখ লোকটি।

আমার ভাগনে হয় স্যার। মালুর পরিচয়টা যেন এতক্ষণে সম্পূর্ণ করে রমজান।

বেশ বেশ। ভারি মুখের ঠোঁটজোড়া ঈষৎ ফাঁক হয়েই বন্ধ হয়ে গেল আবার। মন্দ না। দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে হেসে দুলে আস্তে আস্তে হেঁটে যাওয়াই ভাল। এ রকম কত হেঁটেছি তোদের বয়সে। এখন কি আর সেরূপ ফুরসুত আছে আমার? আজ ই উনিয়ন বোর্ড, কাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, পরশু রিলিফ কমিটি, মিটিং করে করেই জানটা গেল রে মালু।

গাড়িতে উঠে গেল রমজান। মুখটা বাড়িয়ে আবার বলল: দিন ভর মিটিং চলবে। রাত্রে একটা পার্টি হচ্ছে আমার বাড়িতে। কণ্ট্রোলার সাহেব চলেছেন, এস ডি ও সাহেবও আসছেন বিকেলে। মানি মর্যাদার মেহমান সব। তুইও আসিস। আসবি কিন্তু।

চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট নেয় ড্রাইভার।

আমার সুটকেস? হাত বাড়ায় মালু।

না না। ও থাক। খামাখা এতটা পথ বয়ে বেড়াবি? উঠছিস কোথায়? সৈয়দ বাড়িতে।

ফোলা মুখটা সামান্য কুঁচকে কেমন লম্বা হয়ে গেল। কিন্তু, সেটা মুহূর্তের জন্যই। বলল রমজান: আমি পৌঁছেই পাঠিয়ে দেব তোর ব্যাগ সুটকেস। স্টার্ট নিয়ে এক কদম এগিয়ে গেল গাড়িটা। হাত ইশারায় ড্রাইভারকে থামিয়ে মুখটা আবার বের করে আনল রমজান। বলল: দাওয়াত খেতে আসবি অবশ্যই। তালতলির কাজি বাড়ি। আমার নতুন বাড়ি। ওখানেই থাকি আজকাল।

ধুলোয় ঘূর্ণী তুলে ছুটে গেল গাড়িটা।

বিস্ময়ের নিশ্চল মূর্তি হয়ে চেয়ে থাকে মালু। চেয়ে থাকে যতক্ষণ না আবলুস রঙ গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায় দৃষ্টির বাইরে।

চেহারা রঙ, সবই বদলে গেছে রমজানের। বদলেছে ওর কথা, ওর ভাবাটিও।

পেশাগত হোক আর বংশগত হোক বাকুলিয়ার অনেক মানুষেরই নামের পেছনে ছিল পদবী। কেউ সৈয়দ, মিঞা চৌধুরী, মুন্সী। কেউ বা সারেঙ মাঝি ট্যাণ্ডল। কিন্তু রমজান ছিল শুধুই রমজান। এমন কি রমজান মাঝিও না। এ নিয়ে আফসোসের অন্ত ছিলনা রমজানের। আফসোস থেকে খেদ, খেদ থেকে বিক্ষোভ, বিক্ষোভ থেকে বেপরোয়া নৃশংসতা, কূট কুটিল চক্রান্তের পথে বিচিত্র অভিযান।

সে অভিযান শেষে আজ বুঝি মানি তোয়াঙ্গর রমজান। সার্থক ওর পদবীর আকাঙ্খা। রমজান থেকে রমজান সর্দার, রেঙ্গুন বন্দরে কুলি সর্দার। তারপর ফেলু মিঞার নায়েব। মুখে যে যাই ডাকুক কাগজ-পত্রে নাম সইতে ও তখন রমজান আলি। তেমনি সময় ওই 'কমিনা বেশ্যা' হুরমতির বেদিল নাফরমানিতে রটে গেছিল আর এক নাম, কানকাটা রমজান। কানকাটা রমজান লুটে নিল যুদ্ধের নেয়ামত। সে নেয়ামতের জোরে মুছে দিল হুরমতির দেয়া পদবী। যুদ্ধের কণ্ট্রাক্টার, জঙ্গী বাহিনীর মাল মশলার যোগানদার, নাম তার শেখ রমজান। যুদ্ধের পর এল পাকিস্তান।

পাকিস্তানের মওকাও ছাড়েনি রমজান।

আজ বুঝি আরো উঁচু স্তরের মানুষ শেখ রমজান। আজ তার কোন্ পদবী, তালতলির কোন্ কাজি বাড়িতে তার নতুন মসনদ। জানেনা মালু।

ওলট পালট, লয় পরিবর্তন, এটাই নাকি পৃথিবীর নিয়ম। সে নিয়মেরও ধর্ম আছে, ধারা আছে। সে পরিবর্তনের ধর্ম, তার গতি, সময় ও কালের ফলকচিহ্নে দৃষ্টি গ্রাহ্য।

কিন্তু, রমজান? ও যেন ভোজবাজি, ছু মন্তর। পীর সাহেবের ফুঁক ফাঁক তুক তাক, কুদরতের ভেল্কিবাজি। লোকে বলে সেই ভেলকিবাজিতে একখানা নোট দশখানা হয়, দেখতে না দেখতেই এক টাকার নোটখানা হয়ে যায় একশো টাকার।

ম্যাজিকের ওই ভেল্কিবাজিকেও যেন হার মানিয়েছে রমজান। ছাড়িয়ে গেছে সময়ের গতিকেও। উল্টিয়ে দিয়েছে নিয়মের চাকা।

ট্রাংক রোডের দূর বাঁকে চোখ রেখে আবার পা বাড়াল মালু। মনে মনে হাসল। তালতলি-বাকুলিয়ায় নতুন এক মাতুল পেয়েছে ও।

হারামখোর। শুয়রখোর। নমরুদের গুষ্টি। ফেরাউনের বাচ্চা। বেইমান। বদমাশ।

অস্পষ্ট অসংবদ্ধ প্রলাপের মতোই শব্দগুলো কানে এল মালুর। পেছন ফিরে

দেখল সেই ছাতা বগলে লোকটা ধরে ফেলেছে ওকে। মাথা ভর্তি চুল। গাল ভর্তি দাড়ি। সবই সাদা, মাঝে মাঝে কালোর পোঁচ। মাথা ঝুঁকিয়ে দৃষ্টিটাকে রাস্তার উপর স্থির রেখে হন হনিয়ে চলছে লোকটা। দেখে মনে হয় মাটির নীচে অদৃশ্য ক্রিমি কীটদের উদ্দেশ্যে করেই চোখা চোখা গালিগুলো ছুঁড়ে মারছে।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই লোকটার। মালুকেও ছেড়ে এগিয়ে গেল।

খপ করে তার ছাতার মাথাটাই ধরে ফেলল মালু। চেঁচিয়ে ওঠে, মাষ্টার সায়েব ?

পথের মাঝে অকারণ বাধা পেয়ে বুঝি বিরক্ত হল লোকটা। চুল দাড়ির জঙ্গল ভেদ করে দৃষ্টি তার স্থির হল শান্তিভঙ্গকারী বেয়াদব ছেলেটির মুখের উপর।

মাষ্টার সায়েব, বাকুলিয়া তালতলির সেকান্দর মাষ্টার। বয়সের ভারে নয়, নিষ্ঠুর জীবনের চাপে কুঁজো তার পিঠ। সূর্যের খরতাপ আর মাটির দাহ চুষে নিয়েছে শরীরের তেল চর্বি। অকালেই বৃদ্ধ হয়েছে সেকান্দর মাষ্টার। তবু গা-ফাটা পোড়া মাটির মত শিরা ফোলা ঝলসান হাত আর পা জোড়া বুঝি অক্লান্ত, অস্থির। ক্লান্তির বিরুদ্ধে চরম অবজ্ঞা হেনে আর আঘাতের মুখে নির্ভীকতার প্রতীক হয়ে ওরা এখনো চলমান। হয়ত যুদ্ধমান।

আরে তুই ? এ্যাঁ, মালু—মালেক। চিনতে পেরে শুধু নামটার উপরই জোর দেয় মাষ্টার। খুসিটা প্রকাশ করতে গিয়ে বিব্রত হয়। বগলের ছাতাটা পড়ে যায় মাটিতে।

এমন ক্ষেপে গেলেন কার উপর ? গালি তো কোনটাই বাকী রাখছেন না। ছাতাটা কুড়িয়ে নিয়ে সহাস্যে শুধায় মালু।

মুহূর্তেই জ্বলে উঠল সেকান্দর মাষ্টার। রমজান রমজান, ওই বেইমান, শুয়রের পয়দাশ। হার্মাদটা কি বলছিল তোকে ?

বিকেলে খাবার দাওয়াত দিল।

দাওয়াত ? যাবি ? যাবি তুই ও বদমাশটার বাড়ি ?

সে কি আর বলার অপেক্ষা রাখে ? তবু মালুর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল মৃদু কৌতুকের হাসি। এই ব্যর্থ আক্রোশের সাথে ওর আবাল্য পরিচয়, যার বিরুদ্ধে এত ক্রোধ আর ঘৃণার উদ্গীরণ, সেই রমজান, সে তো রয়েছে খোস দিলে, বহাল তবিয়তে। সামান্য আঁচ লাগেনি তার শরীরে। এতটুকু আঁচড় পড়েনি তার গায়ে।

কি মূল্য এই অন্ধ বিক্ষোভের, ক্লীবের ধিক্কারের ! অভিশাপ যদি ধ্বংস করতে

পারত মানুষকে তবে লেকুর মৃতা স্ত্রী আর ভরমতির অভিশাপে রমজান তো এ্যাদ্দিনে সবংশ নির্মূল হত এই পৃথিবী থেকে। তা হয়নি, কখনো হয়না। ওদের ভগ্নশ্বাস ঝাড় তুলতে পারেনি। অনুকূল বাতাসে তর তর করে এগিয়ে গেছে রমজানের পাল তোলা নৌকো। শ্রীবৃদ্ধির ভরা 'বন্দরে এখন বুঝি নোঙর ফেলেছে রমজান।

আর মাষ্টার? বাকুলিয়া-তালতলির প্রিয় সেকান্দর মাষ্টার?

বারুদ-ঠাসা হৃদয়ে কবে একদিন আগুন ধরেছিল। সে আগুনে পোড়াতে পারেনি কাউকে। নিজেই শুধু দগ্ধ হয়েছে তিলে তিলে। এখনো বুঝি নিঃশেষ হয়নি। ছাই হয়ে ঝরে পড়েনি। পোড়া ঘরের পোড়া খুঁটিটির মতো এখনো দাঁড়িয়ে আছে সর্বগ্রাসী কোন ধ্বংসের একক সাক্ষী হয়ে। মাষ্টারের হাড সর্বস্ব শরীরখানির দিকে তাকিয়ে তাই মনে হল মালুর।

আপনার যেখানে যাতায়াত নেই আমি সেখানে যাব, এ প্রশ্নই ওঠে না। জিজ্ঞাসার চিহ্ন আঁকা মাষ্টারের মুখের উপর চোখ রেখে বলল মালু।

শুধু সমর্থন নয়। কি এক আশ্বাস সহানুভূতির ছোঁয়া মালুর কথায়, মালুর স্বরে। অনেকদিন বুঝি এসব পায়নি সেকান্দর মাষ্টার। খুলে গেল ওর কথার বাঁধ, অবরুদ্ধ যত ক্ষোভের উৎস।

কম জ্বালিয়েছে? কম জ্বালাচ্ছে ওই লোকটা? উৎখাত করেছে গোটা বাকুলিয়া। তাতেও কি তার তিয়াস মিটেছে? মাত্র দুদিনের মাঝে ফাঁকা হয়ে গেল অতবড তালতলি। সোনা দানা জায় জেয়র যতটুকু সম্ভব সঙ্গে নিয়ে গেছে, কিন্তু জোতজমি বাড়ি-ঘর তো আর হাঁটতে পারে না? বোঁচকা বেঁধে নিয়ে যাবার জিনিসও নয়, সে সব তো রয়েই গেল।

ধর্ম না হয় আলাদা, তাই বলে কি ওরা মানুষ নয়? ওরা এ দেশের মাটির সন্তান নয়? হাজার বছর সুখে দুঃখে এক সাথে থাকিসনি? আর সেই মানুষগুলোর দুর্দশার সুযোগ নিয়ে এমন বেইমানী করলি তুই? লাখ লাখ টাকার আমানত স্রেফ জবত করে নিলি?

শুধু কি তাই? চশমখোর বেইমানের কি জাত আছে, না ধর্ম আছে। ফেলু মিঞার তেলনুন খেয়ে তুই মানুষ! হোক হারামের রুজি, তবু রামদয়ালের কৃপাতেই তো দুটো পয়সা করলি তুই। আর তাদেরও রেহাই দিলি না? এমন নিমক হারামির কথা কেউ শুনেছে কখনো?

রাণুদির বাড়িতে কি কেউ নেই? কথার মাঝখানেই শুধাল মালু।

বাধা পেয়ে বিরক্ত হল সেকান্দর। ভেংচি কেটে বলল: আর রাণুদি, বলছি

কি এতক্ষণ। গোটা তালতলিতে ঘুঘু চরছে। দত্ত বাড়িতে দাঙ্গাদি বালাখানা খুলেছে রমজান, কাজি মোহাম্মদ রমজান। মিত্তির বাড়িতে দিব্যি গুছিয়ে বসেছেন আমার গুণধর ভ্রাতা সুলতান মিঞা। ভটচাযি বাড়িতে মিঞার পেয়াদা কালু, এখন কালু শেখ।

ও, তা হলে দত্তবাড়িটাই রমজানের কাজি বাড়ি! আমি তো এতক্ষণ ভেবে ভেবে সারা, তালতলিতে আবার কাজি বাড়ি এল কোত্থেকে।

করুণ রসেও বুঝি হাসি পায় মানুষের। আসলে সেটা কান্নারই আর এক রূপ। তেমনি একটি হাসি পেল মালুর। রমজান যেন মর্মান্তিক, আর করুণ কোন কৌতুক নাটকের নায়ক। তাকে ঘিরে যেন ইতিহাসের প্রহসন। কিন্তু, ফেলু মিঞা? চোখের কোলে প্রশ্ন আঁকল মালু।

রমজানের বাপদাদারা ছিল মিঞাদের গোলাম। সেই গোলাম জাতের রাজত্বে বাস করবে মিঞারা? তাই ফেলু মিঞা চলে গেছে শ্বশুর বাড়ি। সেখানেই থাকে এখন। ঘর জামাই। সুখেই আছে।

সত্যিই কি সুখে আছে? নিজেকেই যেন শুধাল মালু।

সেই কবে দেখা গাবতলায় দাঁড়ান পরাজিত ফেলু মিঞার উদাস দৃষ্টিটা, আজও যেন স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল মালুর চোখের সুমুখে।

বেচারা ফেলু মিঞা। পারল না লুপ্ত গৌরবের এক কণা ফিরিয়ে আনতে; না পারল নতুন জীবনে খাপ খাওয়াতে।

বুঝি এমনি অদ্ভুত আর নির্মম জীবনের ধর্ম। কাউকে ক্ষমা করেনা সে। রেহাই দেয়নি ফেলু মিঞাকে।

ফেলু মিঞার কথা থাক, অন্যদের কথা বলুন না মাষ্টার সাহেব?

হ্যাঁ, সবার কথাই বলবে সে। বলার জন্য, শুধু বলার জন্যই তো এখনো বেঁচে আছে সেকান্দর মাষ্টার।

রাবু আপা কেমন আছে?

ভাল। সংক্ষেপে বলে আবার রমজানের প্রসঙ্গেই ফিরে এল সেকান্দর। কথায় কথায় ছোট হয়ে আসে পথ। ট্রাংক রোড ছেড়ে ওরা নেমে এল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায়। যে রাস্তাটা তালতলি আর দত্তের বাজার হয়ে বড় খাল ডিঙ্গিয়ে সোজা চলে গেছে বাকুলিয়ায়।

তালতলির তালের সারি। তেমনি উন্নত শির। সজাগ প্রহরী। কাঠালী চাঁপার গন্ধে ভুর ভুর বাতাস, দৌড়ে এসে যেন জড়িয়ে ধরল চেনা মানুষ মালুকে। গাছ গাছালির ছায়া ঢাকা পথ, যেমনটি ছিল আগে।

তবু কি তেমনি আছে তালতলি ?

জন নেই, মানুষ নেই, কোথাও এতটুকু কোলাহল নেই। বড় বড় দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে বসতিহীন শ্রীহীন শোভাহীন। যেন প্রাগৈতিহাসিক কংকালের সারি। সভ্যতার কোন লুপ্ত যুগের স্মারক। কি এক শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে তালতলি। শ্মশানের দীর্ঘশ্বাসের মতো কি এক হাহাকার তালতলির মাটির বুকে।

স্কুলের জাঁদরেল পণ্ডিত ভটচার্যি মশায়। তার নাতির ছিল বাগানের সখ। সৌখিন শহুরেদের অনুকরণে বাড়ির সুমুখে সাজিয়েছিল দেশী বিদেশী ফুলের কেয়ারি। সৌন্দর্যের সেই কোমল কুঁড়িদের গ্রাস করেছে আগাছার জঙ্গল। মিত্তির বাড়ির ভাঙ্গা ছাড়িয়ে দক্ষিণে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা ঘেসে চাঁপাতলা। ছেলে মেয়েদের ফুল কুড়ানো আর খেলার যায়গা। কতদিন রাণুর জন্য মালু ফুল কুড়িয়েছে এই চাঁপাতলায়।

চাঁপাতলায় আজ কেমন গা ছম ছম ভয়। সেই কবে থেকে চাঁপার কলিরা ঝরে চলেছে। ঝরে ঝরে শুকিয়ে গেছে। গালের উপর শুকিয়ে যাওয়া কান্নার দাগের মতো কত দাগ কেটে গেছে মাটির গায়ে। কেউ তার খোঁজ রাখেনি। কেউ আর আসে না ফুল কুড়োতে। আঁচল ভরে তুলে নেয় না। মালা গাঁথেনা।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে চায়না মালু। বিশ্বাস করতে চায়না সেদিনের সেই ছবির মতো সুন্দর কোলাহল মুখর তালতলির এই ভুতুড়ে স্তব্ধতা।

হয়ত ছবির মত সুন্দর ছিলনা তালতলি। শ্রীহীন বাকুলিয়ার তুলনায় শ্রীময় মনে হত তালতলিকে।

চোখের সুমুখে উঠে আসে পরিচিত মুখগুলো। ভেসে উঠে ওদের স্বচ্ছল পরিচ্ছন্ন জীবনের ছবিটা। ওদের বিলাস, ওদের অর্থ, মর্যাদা, শক্তি। ওদের ক্ষুদ্রতা, ওদের মহত্ব। একদা যারা ছিল তালতলি নামের আকর্ষণ। সম্ভ্রম, হয়ত ভীতিও।

ছিন্নমূল সেই মানুষগুলো। কোথায় কোন্ দেশের মৃত্তিকাহীন জীবনে বেঁচে আছে তারা, কে জানে! রাণুর মতো হয়ত অনেকেই হারিয়ে গেছে নিষ্ঠুর কোন মৃত্যুর ওপারে!

ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল মালুর বুক চিরে। বেরিয়ে এসে মিলিয়ে গেল তালতলির হাহাকারে।

দেখতে দেখতে কি যেন হয়ে গেল। দরবেশ চাচা বলে, সবই মাদারির খেল—

সচকিত হল মালু। সেই যে বলতে শুরু করেছে, সেকান্দর মাষ্টার এখনো বলেই চলেছে।

দরবেশ চাচাই ঠিক। সবই ভেলকি বাজি। মাদারির খেল। আবারও বলল সেকান্দর মাষ্টার।

তাই কি? মূঢ় নির্বোধ ওই আকাশটাকেই যেন শুধাল মালু। এ কি বধির কোন বিধাতার অভিশাপ? অথবা জীবনেরই কোন নির্মম ধারা। সঠিক জবাবটা কেউ দিতে পারে কি?

ভটচার্যিদের সেই ছেলেটা মালুকে যে ম্লেচ্ছ বলে গালি দিয়েছিল। তার কথা মনে পড়ল। ছোট বেলার সেই অপমান বোধের সামান্য অবশিষ্টও জমে নেই মনে! আজ ওকে পেলে বুকে টেনে নিত মালু। জিজ্ঞেস করত, কেমন আছ ভাই?

বনমালির কথাটাও মনে পড়ল। ভটচার্যিদের বাড়ির পেছনেই ছিল বনমালিদের বাড়ি। ভটচার্যিদের ছেলেটা বাজে ছেলে, বলেছিল বনমালি। আর মালুকে বুঝিয়েছিল, ওই বাজে ছেলেটার বাজে কথায় তুমি স্কুল ছেড়ে দেবে? কখখনো না। তুমি এসো স্কুলে।

অশোকের গানের স্কুলে মালুর সাথে যারা গান শিখত তাদের কথাও মনে পড়ল। বিনোদ, কৃষ্ণপদ, হরিহর। বিভা, সুলেখা, আরতি। জাপানী-ভয়ে অনেক গেরস্ত যখন গ্রাম ছেড়েছিল, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা গেছিল কমে, তখন ছেলে আর মেয়েদের এক সাথেই ক্লাশ নিত অশোক। ছাত্রীদের মাঝে বিভাকেই ভাল লাগত মালুর। ঠিক রাসুর মত। রাসুর মতই আপন মনে হত বিভাকে। বিভার জন্য কতদিন মটর, বাতাসা আর নকুল দানা পকেটে করে নিয়ে গেছিল মালু।

কী বিশ্রী একটা অভ্যাস ছিল বিভার। নকুলদানাই হোক আর বাতাসাই হোক, কখনো ডান হাতে নিত না ও, নিত বাঁ হাতে। নিয়েই ফস করে লুকিয়ে ফেলত আঁচলের তলায়। একদিন তো অশোকের হাতে ধরাই পড়ে গেল।

আচ্ছা? তলে তলে এসব হচ্ছে? চোখ পাকিয়ে বলেছিল অশোক। কই দেখি? আমার ভাগটা কোথায়?

সেদিন অর্ধেক নকুলদানা একাই সাবাড় করেছিল অশোক। বাকী অর্ধেক বিলিয়ে দিয়েছিল সবাইকে।

লজ্জায় মাটির সাথে মিশে গেছিল মালু। কিন্তু বলিহারি মেয়ে বিভা। লজ্জা শরম তো দূরের কথা, উল্টো বলেছিল, বা-রে, আমার জিনিসে সবাই ভাগ বসাবে কেন?

এমনি আরও কত মধুর স্মৃতি তালতলিকে ঘিরে। মধুর স্মৃতিরা জড়িয়ে ধরে মালুকে।

মিত্তির বাড়ির পাশ কেটে একটা রাস্তা চলে গেছে যুগি পাড়ার দিকে। তারপর ঘুরে এসে মিশেছে তালতলির বাজারের মুখে মূল রাস্তাটার সাথে। নামটা যুগি পাড়া হলেও সেখানে থাকে তালতলির মত ইতরজন, কামার কুমোর জেলে আর মেথর। যুগি পাড়ার সেই রাস্তাটার মুখে এসে ধপ করে বসে পড়ল মালু।

কিরে, কি হল? পায়ে লেগেছে? ঝুঁকে এসে শুধাল সেকান্দর মাষ্টার। মাষ্টারের প্রশ্নটা হয়ত কানেই গেলনা মালুর। অকম্প দুটো চোখ ওর মিত্তির বাড়ীর সুপারী গাছের ফাঁকে উঁকি দেওয়া আকাশের ধূসরতায় কি যেন খুঁজছে!

হয়ত বুঝল সেকান্দর মাষ্টার। বলল, আমি যাই বাজারে, কিছু কাজ আছে সেখানে। সুলতান ভুঁইঞার দোকানের সামনে পাবি আমাকে।

মিত্তির বাড়ির পেছনে যুগিপাড়ার রাস্তার পাশে প্রকাণ্ড পুকুর। পুকুরের উত্তর পাড ধরে মস্ত বড় মাঠ। পুকুরের পাড়ে আর ওই মাঠে মেলা বসত দোলের সময়, চৈত্র সংক্রান্তিতে। ছোট বেলায় জাহেদের সাথে রাবু, আরিফা মিলে কতবার এই মেলায় এসেছে। কত কিছু কিনত ওরা। রাবু আরিফা পর্দা নেয়ার পর মালু একাই আসত ওদের ফরমাস নিয়ে। তারপর, এই মেলা থেকেই তো বিভাকে একটা মাটির নটরাজ কিনে দিয়েছিল মালু। লাজুক নয় বিভা, এটাই সবাই জানতো। কিন্তু সেদিন বিভার শ্যামলা মুখখানা কি এক লজ্জায় আনত হয়েছিল। বিভা বলেছিল, তুমি কেন এত কিছু দাও আমাকে?

কোন উত্তর যোগায়নি মালুর কণ্ঠে। হাতের অবশিষ্ট জিনিসগুলো বিভার আঁচলে তুলে দিয়ে বোকার মত দাঁড়িয়েছিল ও।

মুখ তুলে হেসেছিল বিভা। বলেছিল, নটরাজটা সুন্দর, ঠিক তোমার মত। বলেই পালিয়ে গেছিল বিভা।

বিভা নেই। আরতি সুলেখা, বিনোদ, হরিহর ওরা কেউ নেই। এখন আর মেলা বসেনা এখানে। যারা মেলা বসাত তারা নেই। পুকুরের

পাড়গুলো কে বা কারা কেটে ফেলেছে, ক্ষেত বানিয়েছে। মাঠটাও নেই। সেখানে এখন ধানের ক্ষেত। ভাবতেও কেমন লাগে মালুর। তালতলিতে বিভাকে আর দেখা যাবেনা কখনও। এ গ্রামে আর কেউ অশোকের গান শুনবেনা কোনদিন। বাণুদের বাড়িতে আর কখনও ডাক পড়বে না মালুর।

ছোট বেলার মত দুচোখ ছাপিয়ে কান্না এল মালুর। অন্ধ অভিমানে রাগে ক্ষোভে অপমানে। ছোট বেলায় যেমন করে কাঁদত মালু। মালুর মনে পড়ল, বাকুলিয়া তালতলি ছাড়ার পর এই প্রথম দুচোখ ভাসিয়ে কাঁদল ও।

চোখ মুছে উঠে পড়ল মালু। যুগি পাড়ার মুখে ক্ষিরোধের মার সাথে দেখা।

তোমরা যাও নি?

না।

যুগি পাড়ার অনেকেই যায়নি।

ওরা বলল, ওদের সামর্থ নেই রেলের টিকেট কিনবার। কেমন করে যাবে, কোথায় যাবে? এখানে তবু বাপদাদার ভিটিটাতো আছে।

আশ্বস্ত হল না মালু। তবু যেন একটু ভরসা পেল মনে।

কিন্তু জেলে পাড়াটা একেবারেই ফাঁকা। ওরা সব দল বেঁধে চলে গেছে। জেলে পাড়া থেকে বাজারের দিকে মোড় ঘুরে অবাক হল মালু। পরিত্যক্ত রামঠাকুরের দিঘির পাড়গুলো যেমন প্রশস্ত আর উঁচু ছিল তেমনি রয়েছে। এই দিঘির পাড়ে একটা গোরাদের ছাউনী পড়েছিল। অনেক বছর ছিল সেই ছাউনী। গোরারা থাকতে, ওরা উঠে যাবার পরও কেউ এ দিঘির পাড় মাড়াতনা ভয়ে। জীবনে একবারই ওই দিঘির পাড়ে চড়েছিল মালু। মালু তখন ছোট, খুবই ছোট। তখনও গাছে চড়া শেখেনি মালু, স্পষ্ট মনে আছে ওর। ঘটনাটা পুরো মনে নেই মালুর। শুধু মনে আছে সেকান্দর মাষ্টারের হাত ধরেই এসেছিল ও। কেন যেন ভীষণ উত্তেজিত হয়েছিল সেকান্দর মাষ্টার। গলা চড়িয়ে তর্ক করছিল গোরাগুলোর সাথে। সেই ফাঁকে মালু দেখে নিয়েছিল, গোরারা একটা লোককে মাথা নীচের দিকে দিয়ে পা জোড়া উপর দিকে বেঁধে রেখেছিল একটা গাছের ডালে। ভীষণ শীত পড়ছিল, বোধ হয়

মাঘমাস হবে। আর একটা লোককে গোরারা দিঘির পানিতে গলা-পানি অবধি টেনে বাঁশের সাথে বেঁধে রেখেছিল। সেই বিভীষিকার স্মৃতি মালু ভোলেনি, কোনদিনই ভুলবেনা। তালতলি গ্রামের যে দুটো তাজা ছেলেকে গোরারা পিটিয়ে মেরেছিল তাদের একজন ছিল রাণুর বন্ধু, সে কথাটাও মনে আছে মালুর। বড় হয়ে এই বিপ্লবীদের কথা সেকান্দর মাষ্টারের কাছেই শুনেছে মালু।

কিন্তু মালুকে যা অবাক করেছে সে হল দিঘির পাড়ে একটি স্মৃতিফলক। কখন, কে বা কারা তুলেছে এই স্মৃতিফলক, মালু জানেনা। কিন্তু তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করল মালু।

বাজারের দিকে ঠিক উল্টো ছবি তালতলির।

দত্তের বাজারে ঘরের সংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে গুদাম আর আড়তের পরিধি। সেই যে যুদ্ধের জামানায় দত্তের বাজার ফেঁপে উঠেছিল বন্দরে, আজকের সীমানা তার সে বন্দরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ধানের কল, গম ভাঙ্গার কল অনবরত ঘর ঘর শব্দ তুলে চলেছে। শহরের পাইকার আর বেপারীদের স্থায়ী আস্তানা পড়েছে। পণ্যের বিকিকিনি, বায়েনদার, দাদনদার, ফড়ে বেপারীর লেন-দেনে চঞ্চল দত্তের বাজার।

বাজারের শেষ মাথায় দত্ত বাড়ির পুরনো ভিতে উঠেছে কাজি বাড়ির নতুন ইমারত। তালতলির পরিত্যক্ত বাড়িগুলোর যত শূন্যতা আর হাহাকার এখানে এসে পথ হারিয়েছে, থমকে দাঁড়িয়েছে। এখানে রঙ। এখানে জৌলুষ। বাজারের কোলাহল নেই। রয়েছে একটি অভিজাত গাম্ভীর্য। রামদয়ালের প্রকাণ্ড বৈঠক ঘরটি ছিল মহাজনী গুদামের কিঞ্চিৎ সংস্কৃতরূপ। শক্ত গাঁথুনীর মোটাসোটা দেয়াল। তাতে ছিলনা সৌষ্ঠব। কিন্তু, কাজি রমজানের সখ আছে। রামদয়ালের সেই দালানটাকে বারান্দা আর ব্যালকনির অলংকার দিয়ে নতুন করে সাজিয়েছে ও। সুমুখে করেছে মাঠ। মাঠের পরে ঠিক বাজারের রাস্তায় লোহার রেলিং ঘেরা সীমানা। সেখানে শহুরে কায়দায় ফাটক।

চুম্বকের আকর্ষণের মতো মালুর চোখজোড়া গেঁথে থাকে কাজি বাড়ীর ফাটকে। পুরনো দত্তবাড়ির শক্তি আর দম্ভকে ম্লান করে দিয়ে সেই সাবেক গাঁথুনির উপর মাথা উঁচিয়েছে শক্তি আর বিলাসের নতুন ইমারত। আসমান বিস্তৃত তার অভিলাষ। আসমান উঁচু তার ঔদ্ধত্য।

ছিল বদমাশ জাঁহাবাজ, মিঞাদের লেঠেল। এখন হয়েছে শয়তান। আস্ত

শয়তান। শয়তানের বুদ্ধি তার লোমের রোঁয়ায় রোঁয়ায়, হাড্ডির গিঁটে গিঁটে। আঁতড়ির প্যাঁচে প্যাঁচে। এমনি করেই বলে সেকান্দর। বলে যেন অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা আর বিক্ষোভের দুর্ভারটাকে একটু লাঘব করে নেয়।

নিজের কথা তো কিছুই বললেন না মাষ্টার সায়েব। শুধাল মালু।

আ-র নিজের কথা। এতক্ষণে সেকান্দর মাষ্টার একটু হাসল। শীর্ণ আর ম্লান হাসি।

মা-টা মারা গেল। মা-ই তো ছিল ঘরের একমাত্র বাঁধন। রাস্তু, ভালই আছে ও। এক ছেলে দুই মেয়ের সংসার ওর। অশান্তির মরুভূমিতে ওই তো একটুখানি শান্তির উদ্যান। এতক্ষণের জ্বালাক্ষরা কর্কশ গলাটি কোমল হয়ে এসেছে সেকান্দরের।

একলা একলা এত কষ্ট করছেন মাষ্টার সায়েব, বিয়ে করলেন না কেন? আচমকাই জিজ্ঞেস করে বসল মালু।

বিয়ে? হা হা হা, তুইও যেমন। রাস্তার মাঝেই বুঝি অট্টহাসির বেগে লুটিয়ে পড়তে চায় সেকান্দর মাষ্টার।

চমকে চাইল মালু। এ কী হাসির বিকৃতি! মালুর মনে হল যুগসঞ্চিত কোন ব্যথার কান্না নীরবে জমে জমে পাথর হয়েছে, সেই জমাট কান্নার পাথরটাই যেন মাথা কুটে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে ওই হাসির আবরণে। সেই আহ্লাদী বোন রাস্তু? ভাল আছে ও। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে মাঝারি অথবা বড় গোছের একটা সংসার হয়েছে তার। এটুকু, শুধু এটুকুই কি সেকান্দর মাষ্টারের জীবনের সান্ত্বনা?

এও এক সুখ। এক হাজার একশোটি ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নিয়ে মেতে থাকা ডুবে থাকা, পিছু টানবার কেউ নেই। মালুর মনের প্রশ্নটা যেন আঁচ করেই বলল সেকান্দর মাষ্টার।

সুখনা ছাই। শুধু বঞ্চনা। প্রবঞ্চনা, মিথ্যা প্রবোধ দেয়া মনকে, কি এক প্রতিবাদে গলাটাকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে ফেলল মালু।

হোকনা বঞ্চনা। শান্ত এক স্থিরতা নেমেছে সেকান্দরের স্বরে।

কিন্তু, কেন? কিসের জন্য? কিসের পায়ে বিলিয়ে দিলেন জীবনটা? পায়ে পায়ে তো এগিয়ে আসছে মৃত্যু, রঙহীন অর্থহীন অতি সাধারণ এক মৃত্যু। মাষ্টার সাহেব, এই কি আপনার কাম্য ছিল? জীবনের কাছে কিছুই কি চাওয়ার এবং পাওয়ার ছিলনা আপনার?

বুঝি হোঁচট খায় সেকান্দর মাষ্টার। দাঁড়িয়ে পড়ে। বগল বদলির ছাতাটাকে নিয়ে আসে ডান বগলে, ডান্ হাতের ঝোলাটাকে বাঁ হাতে। তারপর বলে, চাওয়ার ছিলনা কিছুই, পাওয়ার ছিল অনেক। সবই পেয়েছি।
মিথ্যে কথা।
মিথ্যে কথা? যেন পালট খেয়ে তাকায় সেকান্দর মাষ্টার।
কোন দিন যে মাষ্টার ছাত্র ছিল ওরা সে কথাটা যেন মনে পড়েনা ওদের। এখন ওরা দুই পুরুষ, জীবনের কঠিনতম কোন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকেই যাচাই করছে। নিজেদেরই বিচার করছে, ওজন করছে তুল দণ্ডে।
মিথ্যেই তো। বুড়িয়েছেন অকারণে। চুল পেকেছে অকালে। অকালেই গায়ের মুখের চামড়া এসেছে কুঁচকে, হাঁড় পাজরা গেছে বেঁকে। সব মিলিয়ে এ যে মর্মান্তিক, মাষ্টার সায়েব, মনে হয় করুণ এক পরিহাস।
পরিহাস নয়রে! পরিহাস নয়। দুঃখজয়ী যারা তারাই তো জীবনজয়ী। জীবন দাতাও। কোন বঞ্চনাই তাদের কাছে বঞ্চনা নয়। বঞ্চনার সড়ক ধরেই ওরা এগিয়ে যায় মহাপ্রাপ্তির দিকে। দেখছিস না তোর চারপাশে? এ যেন অতীতের সেই ধীর গম্ভীর সহিষ্ণু মাষ্টার সাহেব, গভীর যত্নে আর অক্লান্ত ধৈর্যে বুঝিয়ে দিচ্ছেন পাটিগণিতের কোন দুরূহ প্রশ্ন।
মানিনা মানিনা। এ শুধু অন্তঃসার কথার লেপন। আজীবনের অতৃপ্তি আর বঞ্চনাকে, ব্যর্থ জীবনের পরিহাসকে সহনশীল এমন কি গরিমার তিলক ছিঁটিয়ে মনকে সান্ত্বনা দেয়া। তেতো ঝাঁঝ মালুর কণ্ঠে।
তাহলে তো পৃথিবীর সমস্ত মহৎ জনের ত্যাগকেই বলতে হয় ফাঁকি। ব্রত সাধনাকে বলতে হয় নিরর্থক।
মহৎজনের মহত্বের সাথে আমাদের তুলনা কেন, মাষ্টার সাহেব। তুচ্ছ আর ক্ষুদ্র জীবনে আমাদের এত যে অতৃপ্তি আর হাহাকার মহতের দৃষ্টান্ত তুলে তাকে কি এতটুকু লাঘব করতে পারছি?
কে চাইছে লাঘব করতে?
আমি চাই, আমি চাই, মাষ্টার সায়েব। আমি পারিনা এত বেদনার বোঝা বইতে। পারিনা এই হুতাশ কান্নার প্রদর্শনীর আর একজন হতে। গভীর কোন বেদনার নিঃস্বরন বুঝি চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরে পড়ে মালুর কণ্ঠ বয়ে।
রিহানা। নিঃশব্দে এল যে। সব কিছু লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে চলে গেল যে। সেই মেয়েই বুঝি এখনো আচ্ছন্ন করে রেখেছে ওর চেতনাকে। লজ্জিত

হল মালু। কী সব বলেছে ও। এতো ওর নিজের কথা নয়? মনের গভীরে যে বেদনাকে কবর দিতে চাইছে ও, ভুলে যেতে চাইছে পরাভবের যে গ্লানি এ বুঝি তারই ক্লেদাক্ত প্রকাশ। নিজের কাছেও এমন ভাবে উলঙ্গ হয় মানুষ? কিন্তু আগুনে পোড়া সেই মানুষটি, সে যেন বুঝল সব কিছু।
একটি হাতের স্পর্শ নেমে এল মালুর কাঁধে। সে স্পর্শে সহানুভূতি, দরদ। আর সেই তপ্ততীক্ষ্ণ অন্তরভেদী চোখজোড়া। সেখানে পৃথিবীর কোমলতা। সে চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মালু। লজ্জার হাসি হাসল। তারপর চলতে চলতে বলল অনেক বছর আগে রাবুর মুখে শোনা একটি কথা, নিজের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে, নিজের মত করে: জানেন মাষ্টার সাহেব। আমাদের সুখ দুঃখের গণ্ডীটাও বড় ক্ষুদ্র। সেই ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা দিয়েই বিচার করতে চাই এতবড় দুনিয়াটাকে। তাই এত বিড়ম্বনা পায়ে পায়ে। না পারি নিজেকে যাচাই করতে। না পারি অপরকে বুঝতে।
থুতু ফেলল মালু। জীবটা বড় তেতো লাগছে। কে যেন বিস্বাদ মেখে দিয়েছে সারা গালে। রিহানার সাথে সাথে নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা আর আস্থাটাকেও সে কি ফেলে এসেছে পেছনে? নইলে বজ্রের দাহনে ঝলসে গিয়েও যে প্রাণ একক শুকতারার মতো দীপ্যমান বাকুলিয়া তালতলির আকাশে, সেই মাষ্টার সাহেবের জীবনে শুধু নিঃসঙ্গতা, শুধু ব্যর্থতাটাই ওর চোখে পড়ল কেন?
ফিস্ ফিস্ করে বলল মালু: মাফ করে দিন মাষ্টার সায়েব। আমারই ভুল। আগুনের পরশমণি দিয়েই তো প্রাণের উন্মেষ। তারই নাম শাশ্বত প্রাণ যার নেই বিনাশ।
সেকান্দর মাষ্টার যেন শুনলইনা ওর কথাটা। অথবা শুনেও শুনতে চাইলনা, তাকিয়ে রইল সুমুখের ধূ ধূ মাঠটার দিকে। হয়ত অন্য কথা ভাবছে সেকান্দর মাষ্টার। ভাবছে সেদিনের সেই হাফপ্যাণ্ট পরা গান গাওয়া ছেলেটি শুধু গুণী হয়নি জ্ঞানীও হয়েছে।
টীকা নিয়েছিস? ওর দিকে চেয়ে শুধাল সেকান্দর মাষ্টার।
জী হ্যাঁ। কেন?
জানিসনা তুই? চোখ বড় বড করে তাকাল সেকান্দর মাষ্টার। আমার চিঠি পাস্‌নি? জাহেদ কিছু লেখে নি?
না তো? পেয়েছিলাম শুধু মেজো ভাইর একটা চিরকুট। সেও তো ঢাকায় বসেই লেখা। তাতে লিখেছেন ভীষণ বিপদ রাবু আপার।

বিপদ কি ওর? বিপদ তো সবার, গোটা বাকুলিয়ার।

কি বিপদ মাষ্টার সাহেব? উদ্বেগ ঝরল মালুর কণ্ঠে।

বসন্ত। কাল বসন্তে উজাড় হয়েছে বাকুলিয়া। ইঁদুরের মতো মরেছে মানুষ। এখনো মরছে। ভাগ্যিস রাবু ছিল। জাহেদও এসে পড়েছিল দরকারের সময়। নইলে একা একা কী যে করতাম! দাফন কাফনও করা যেতনা লাসগুলোর! শকুনে টেনে টেনে খেত মরা মানুষের গোশত। খাচ্ছেও তো। মোহাম্মদপুরে নাকি গোর দেবার লোকও নেই। জানাজা তো দূরের কথা।

মোহাম্মদপুরেও মড়ক লেগেছে? সে তো অনেক উত্তরে। জিজ্ঞেস করল মালু।

ওই বাকুলিয়া থেকে শুরু করে উত্তরে আট দশ গ্রাম, সব গ্রামেরই এক অবস্থা। শুধু কাঁচা কাঁচা কবর। কবর আর কবর। মুশকিল হচ্ছে যারা বেঁচে আছে তারাও পালাচ্ছে ভয়ে। পালিয়ে যে বাঁচতে পারছে তা নয়। হয়ত পথের মাঝে গুটির ব্যথায় কাতরে কাতরে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ছে। ফল হয়েছে রোগটা এ গাঁ থেকে সে গাঁ ছড়িয়ে পড়েছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেকান্দার মাষ্টার।

এককালের সেই দত্ত দীঘির তাল শ্রেণীর সারি সারি ছায়া মাড়িয়ে উত্তরের মাঠে নেমে এল ওরা।

দুপুরের সূর্যটা আস্তে আস্তে হেলে পড়ছে পশ্চিমে। রোদের তেজে গাটা চনচন করছে। হাত বাড়িয়ে সেকান্দর মাষ্টারের বগল থেকে ছাতাটা টেনে নিল মালু। ছড়িয়ে দিল মাথার উপর। বলল: এতটা পথ ছাতাটা বগলে বয়ে বেড়ানোর চেয়ে মাথার উপর ছড়িয়ে রাখলেই কি ভাল হত না? ভারটাও কম মনে হত। রোদটাও কম লাগত।

তা ঠিক। সেই শীর্ণ হাসিটাই আবার ফিরে এসেছে সেকান্দর মাষ্টারের বিশীর্ণ মুখে।

ক্যাম্বিশের জুতোটা বুঝি গরম হয়ে উঠেছে। জুতো জোড়া খুলে হাতে নিল সেকান্দর মাষ্টার। বলল: খেটে খেটে আর রাত জেগে জেগে বড় কাহিল হয়ে পড়েছে রাবু। ওর জন্যই তো গেছিলাম সহরে। একটা টনিক আর এক ডিবে ভিটামিন বড়ি নিয়ে এলাম।

বাকুলিয়ার মানুষের প্রিয় দখিন ক্ষেত। সেই কবে এক অন্ধকার রাতে মিঞা বৌকে পথ দেখিয়ে দখিন ক্ষেতটা মাড়িয়ে গেছিল মালু। আজ পায়ের নীচে দখিন ক্ষেত সেদিনের কথাটাই যেন স্মরণ করিয়ে দিল মালুকে।

সামনেই রূপোর পাতের মতো চিক চিক করছে বড় খাল। দূরে খালের ওপারে স্পষ্ট মিঞা পুকুরের উঁচু পাড়। পাড়ের দক্ষিণ কোণে সেই ঝাঁকড়া মাথা গাব গাছটাকে ঠিক আগের মত এখান থেকেই চেনা যায়। চেনা যায় মিঞা বাড়ির সেই উঁচু সিঁদুরে আম গাছটাকেও।
মিঞারা নেই, ফেলু মিঞাও নেই। কেন যেন মনে হল মালুর, ফেলু মিঞার দীর্ঘশ্বাস হয়েই দাঁড়িয়ে আছে ওই দুটো গাছ। দুটো গাছই আরো অনেক কাল এমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে বুঝি।
জোরে জোরে পা ফেলল ওরা।

এই মাত্র মারা গেল।
মুর্দার আপাদমস্তক একখানা সাদা সাড়িতে ঢেকে রেখে শিয়রের দিকে বসে আছে রাবু। সেকান্দর মাষ্টার আর মালুকে ঢুকতে দেখে অস্ফুটে সংবাদটা জানিয়ে দিল।
কে মরল? মালু যেন চাবকিয়েও স্মৃতি শক্তিটাকে জাগিয়ে তুলতে পারছেনা। রমজানের বাড়িতে রমজান, রমজানের বৌ আর ওদের দুটো ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিল কি?
হ্যাঁ ছিল। ছিল ওর মা। সতেলী মা নয়। আপন মা, যে রমজানকে পেটে ধরেছিল। মাথাটাকে ঝাঁকিয়ে স্মৃতিটাকে যেন উদ্ধার করে আনল মালু।
নামায কলমা নিয়ে পর্দার অবরোধে নির্জন জীবন কাটাত বুড়ি।, কেউ ওর খোঁজ রাখত না, রমজানের সেই মা-ই মারা গেল এই মাত্র।
ধুমধামের সাথেই রামদয়ালের বাড়িতে উঠে এসেছিল রমজান। মিলাদ পড়িয়েছিল। তিন মসজিদে সিন্নি দিয়েছিল। পাঁচ গ্রামের ষোল আনা দাওয়াত দিয়ে তিরিশ গরু আর বিশ খাশির জেয়াফত খাইয়েছিল। ধর্মীয় বা সামাজিক কোন আয়োজনেই ত্রুটি রাখেনি রমজান।
কিন্তু, গোল বাধিয়েছিল ওর বুড়ি মা। বেঁকে বসেছিল। কিছুতেই নড়েনি নামাযের চৌকি ছেড়ে, বলেছিল: ছনের ঘরই ভাল আমার। শশুরের ভিটি খসমের তোলা ঘর ছেড়ে কোথাও যাবনা আমি।
যায়নি বুড়ি। রয়ে গেছে। খসমের ভিটিতেই শেষ নিঃশ্বাস টেনেছে। লেকু ফজর আলী দুজনকে দিয়েই খবর পাঠিয়েছিলাম রমজানকে। যা হয় করতে

বলেছে। বসন্তের মরা নাকি ঘাঁটিতে পারবেনা সে। কাফনের সাদা থানটা ফাড়তে ফাড়তে বলল জাহেদ।
ঝোলাটা মালুর হাতে দিয়ে গুম হয়ে রইল সেকান্দার মাষ্টার। কয়েক সেকেণ্ড। তার পরই ফেটে পড়ল আকস্মিক এক বিস্ফোরণে : দাও। মুর্দাটাকে তুলে দাও আমার পিঠে। ওই হারামজাদার বালাখানার সুমুখেই ফেলে আসব আমি। ওরই সামনে শকুন এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাক ওর মাকে। দেখুক লোকে।
আহা উত্তেজিত হচ্ছ কেন? কাফনটাকে টুটুকরো করে রাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল জাহেদ।
উত্তেজিত হবনা মানে? দৌড়ে দৌড়ে গেছি আট মাইল। আবার এসেছি আট মাইল। জিরিয়েছি এক মিনিট? কে যাবে এখন গোর খুঁড়তে? আমি পারবোনা।
নাওনা একটু জিরিয়ে। কবর দিতে না হয় একটু দেরীই হোক। তাতে তো আর কিছু আসছে যাচ্ছেনা। কাফনের ছোট একটা টুকরোকে ফিতের মতো সরু সরু করে ছিড়ে নেয় জাহেদ।
না। কবরটবর আমি দিতে পারবনা। তার চেয়ে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। বুড়িটা পঁচুক। আমি ওই জানোয়ারটাকে খুন করে আসি। সত্যি বুঝি খুন করতে যাব বলে পা তুলল সেকান্দর মাষ্টার।
কাফনের ফিতেগুলো মৃতার চৌকির উপর ছুঁড়ে ফেলে ঝট করে দাওয়া ছেড়ে নেমে এল জাহেদ। শক্ত করে ধরে ফেলল সেকান্দর মাষ্টারের হাতের কবজিটা। চেঁচিয়ে উঠল, পাগল হলে নাকি?
রুদ্ধ রাগে গরগরিয়ে কাঁপছে সেকান্দর মাষ্টার।
গরগরিয়ে কাঁপা মানুষটার দিকে চেয়ে থাকল মালু। একটু আগেও মমতার স্পর্শ বুলিয়েছিল মালুর কাঁধে, ধীর সহিষ্ণুতায় প্রকাশ করেছিল হৃদয়ের আর উপলব্ধির গভীর সত্যকে, এ যেন সে মানুষ নয়—অন্য মানুষ।
আবেগবর্জিত ভাবালুতাহীন, এই তো ছিল সেকান্দর মাষ্টারের পরিচয়। জাহেদ বলত একটু ভীতু, বড় বেশি সাত পাঁচ ভাবে। কিন্তু দিলটা খাঁটি কোহিনুর। বলে হাসত জাহেদ। অপ্রতিভ সেকান্দর মৃদু স্বরে ধমকে উঠত : চুপ কর তো জাহেদ।
জীবনের সাথে যুজে যুজে দুঃখ আর অনাচারের জঞ্জাল ঘেঁটে ঘেঁটে নিঃশঙ্ক হয়েছে সেকান্দর মাষ্টার। স্পর্শকাতরও। হয়ত অন্ধ ও হয়েছে। অন্ধ ওর রাগ। অন্ধ ওর বিক্ষোভ। তাই মনে হল মালুর।

জানোয়ারের উপর রেগে কোন ফায়দা আছে মাষ্টারজী। মৃতার শেষ কৃত্যের দায়িত্বটাতো আমাদের উপরই বর্তেছে। নম্র গলায় বলল রাবু। ম্যাজিকের মত ফল হল রাবুর কথায়।

মুখ নীচু করে মুর্দার চৌকিটার দিকে এগিয়ে এল সেকান্দর। নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইল বুড়ির মরা মুখের দিকে। বার্দ্ধক্যজর্জর মুখের মরা রেখার কঠিন ভাঁজে কি যেন দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, গভীর মনযোগে। তার পর হাত রাখল কপালে। যেন দেখল, রমজানের মা সত্যি মরেছে কিনা।

মালু। চৌবাচ্চা থেকে দুঘড়া পানি তুলে দিবি?

সেকান্দরের সাথে সাথে মালুও বুঝি মন দিয়েছিল মরা মুখের পাঠোদ্ধারে. রাবুর গলা পেয়ে ফিরে চাইল। চেয়ে রইল।

একটা ঢিলেঢালা ইরানী বোরখা পরেছে রাবু। গলা থেকে কোমরের নীচু অবধি ঢিলে জোব্বার মতো। হাত মুখ আর মাথাটা খোলা। মাথার অংশটুকু ওড়নীর মতো আলতোভাবে ফেলে রেখেছে কাঁধের উপর। বোরখার হালকা ঘিয়ে রঙ বিলেতী লিনেন আশ্চর্য মিশ খেয়ে গেছে রাবুর ফর্শা রঙের সাথে।

মেজো ভাই। তুমি যাও। গোর খোঁড়ার ব্যবস্থা করগে। মাষ্টারজী একটু বিশ্রাম নিক। আমি মুর্দাকে গোসল করিয়ে সাজিয়ে রাখছি।

থাক, বিশ্রাম একেবারেই নেব, কবরে গিয়ে। তুমি কবরখানার দিকে যাও জাহেদ। আমি ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আনছি।

থপ থপ করে পা ফেলে চলে গেল সেকান্দর। ওকে অনুসরণ করল জাহেদ।

দুহাতে দুটো ঘড়া তুলে নিল মালু।

চল্। আমরাও একটু জিরিয়ে নিই। বলল রাবু।

উঠোন পেরিয়ে রমজানের সেই পরিচিত ডাঙ্গার কলা গাছের তলায় গিয়ে বসল ওরা।

মনে পড়ল মালুর, এখানেই একদিন হুরমতির দিকে ছেনি ছুঁড়ে মেরেছিল রমজান। কলার ডগায় আটকে গেছিল ছেনিটা। খিল খিল করে হেসেছিল হুরমতি।

ভাল আছিস তো? মুখটা অত শুকনো কেন রে? স্নেহ ঝরিয়ে শুধাল রাবু।

আমার মুখ শুকনো? নিজের চেহারা খানি আয়নায় একবার দেখ, তারপর বল।

উত্তরে ছোট্ট হাসির একটি ক্ষীণ আভা ফুটল রাবুর মুখে। আবার শুধাল: একলা ফেলে এসেছিস রিহানাকে। কেমন আছে ও?

নিরুত্তরে মুখটা ঘুরিয়ে নিল মালু। মুখ ঘুরিয়ে অল্প অল্প বাতাসে দোল খাওয়া কলা পাতার খেলায় মন দিল বুঝি।

মাটির বুকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে কলা পাতার ছায়ারা। কলা পাতার ছায়ারা কাঁপছে। সে ছায়ার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সরে সরে যাচ্ছে রোদটা। একমনে যেন তাই দেখছে মালু।

রাবু আপা, ডাকল মালু।

সপ্রশ্ন চোখ জোড়া ওর মুখের উপর তুলে ধরল রাবু।

যেদিন তোমায় টেনে চড়িয়ে দিলাম সেদিন খটকা ছিল মনে। বলেছিলাম তোমাকে। মনে পড়ে?

কি বলেছিলি রে?

বলেছিলাম কোথায় যেন হার মানছ তুমি। সে সন্দেহ আমার ঘুচে গেছে, রাবু আপা। সব মিলিয়ে আজ তোমারই জিত।

কি জানি বাপু। মেয়েমানুষ আমি। তোদের মতো করে হারজিতের কথাটা তো ভাবিনি কোনদিন। বলতে বলতে রাবুর ঠোঁটের রেখায় আবারও অস্পষ্ট একটি হাসি জাগল। পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল।

সত্যি বলছ রাবু আপা? মুখটা তোমার ফ্যাকাশে। চোখের কোলে অনিদ্রার কালি। ভীষণ শুকিয়ে গেছ তুমি। তবু এত সুন্দর তো তোমাকে দেখিনি কখনো? মনে হয় কোন দুর্লভ আনন্দ লেপে রয়েছে তোমার মুখে, তোমার……

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল রাবু। বলল: অনেকখানি সেরে উঠেছেন আব্বা। স্কুলটাও চলার মতো অবস্থায় এসেছিল। সড়কের জন্য বন্ধ এখন। রাবু থামল। একটা চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল মালুর মুখের উপর। বলল আবার—রোগে শোকে জন্মস্থানের মানুষদের সেবায় সান্ত্বনায় এগিয়ে আসতে পারছি। একি কম সৌভাগ্য?

শুধু কি তাই রাবু আপা? আর কিছুনা? অন্য কোন গৌরব, অন্য কোন প্রাপ্তি?

নীরব রাবু। মাটির গায়ে নখ দিয়ে দাগ কেটে যায় অজস্র। দাগ কেটে চলে।

তিমিররাতে যার হাতধরে পথ চলা যায় নির্ভয়ে, নৈকট্য যার পৃথিবীর আলো

আর আনন্দের পরশ, সে এক মানুষ। সে মানুষটি যেন নিবিড় একটি অনুভূতি, নিবিড় একটি অনুভূতির মতো সঞ্চারিত রাবুর চৈতন্যের নিঃশব্দ জগতে। সেই নিঃশব্দ জগতের কথাটা কথনো কি অন্যের সুমুখে ব্যক্ত করা যায়?
তবু যে প্রাপ্তির গৌরব লেখা হয়ে গেছে ওর মুখে, গোটা দেহের ছন্দে, প্রশান্ত চোখের স্নিগ্ধ ছায়ায়, সেটা তো লুকিয়ে রাখার বস্তু নয়। লুকিয়ে রাখতে পারেনি রাবু। ধরা পড়েছে মালুর চোখে।
মাটির গায়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বুঝি ধুলো উঠল। সে ধুলোয় মুঠো ভরল রাবু। মুখ তুলল। তাকাল মালুর দিকে।
মালু দেখল, টলটলে ওই চোখের কোলে উজ্জ্বল দুটো মুক্তোর ফোঁটা। দুটো মুক্তোর ফোঁটা কেঁপে কেঁপে ঝরে পড়ল।
বলল রাবু: এই মাটির ধুলো আর ওই মানুষটা, সে যখন যেখানেই থাকুক, তাকে নিয়ে আমি সার্থক। আমি খুব সুখী। বুঝলি মালু? আমি সুখী।
শব্দ নেই কোথাও। ওরা এখন চুপচাপ। মাথার উপর দোল খাচ্ছে কলা পাতা। নীচে ধুপ-ছায়ার আলপনা। উঠোনের ওপারে ঘরের দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা শাড়ি ঢাকা রমজানের মরা মাকে।
আচমকা নীরবতা ভেঙ্গে মুখর হল মালু।
রাবু আপা। এত তিক্ততার মাঝেও জীবনের সুর যার খণ্ডিত হয়নি সে আমার নমস্যা। নাও, আমার সালাম নাও তুমি। মাথা নুয়ে ওর পা ছুঁল মালু। ওর পায়ের ধুলো কপালে মাখল।
আরে থাম থাম! বড্ড নাটুকেপনা করিস তুই, ত্রস্তে পা জোড়া সরিয়ে নিল রাবু।
কি যেন বলতে যাচ্ছিল মালু। পেছন থেকে তরমতি এসে দাঁড়িয়েছে ওদের সামনে। ওর হাতে দু'গ্লাস দুধ।
ওমা মালু? তুই কখন রে? বিয়ে করেছিস শুনলাম? খুব সুন্দরী আর শহুরে মেয়ে? কই মেজো মিঞা কোথায়? এক সাথে অনেক প্রশ্ন তরমতির।
জাহেদ নেই। ওটা মালুকে দে।- দুধের গ্লাশটা মালুর হাতে তুলে দিল রাবু। আর একটা গ্লাশ নিল নিজে।
তরমতিকেই দেখছে মালু। তরমতির স্বাস্থ্য গেছে কিন্তু রূপ যায়নি। ওর কপালের সেই কলঙ্ক তিলক যা ওর কাছে ছিল আপন ব্যক্তিত্বের সদর্প ঘোষণা, সেই তিলকটা তেমনিই আছে।

ঢাকায় যেমন দেখেছিলাম তার চেয়ে তোমার শরীরটা একটু ভাল। ওকে খুসি করার জন্যই বুঝি বলল মালু।

শরীর আর সব সময় ভাল, তোদের সকলের চেয়ে ভাল। মালুর শূন্য গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল ছুরমতি। তারপর হাসল।

ধানের কোরা মাথায় লেকু এল।

ওকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল ছুরমতি। এ কী? তুমি এখনও যাওনি ধান ভানতে? সেই সকাল থেকে টাঁ্যা টাঁ্যা করছি, সরু চাল ফুরিয়ে গেছে। সরু চাল না পেলে দরবেশ চাচা আমার মাথা ভাঙবে। তবু…

থাম তো। কামের কাম তো একটাই জানিস, আমার সাথে ঝগড়া। পুরুষ মানুষের মেলা কাম। কোরাটা মাথা থেকে নামিয়ে সকাল থেকে একের পর এক কামের ফর্দটা দিয়ে গেল লেকু। সেই ভোর রাত্রে উঠে গগন ডাক্তারকে ডেকে এনেছে। গগন ডাক্তার বলেছে বুড়ি বাঁচবে না, তবু তেরটা দাওয়াই দিল। সে দাওয়াই আবার সঙ্গে ছিল না ডাক্তারের। লেকুকে ফের যেতে হল ডাক্তারের সাথে। বুড়ির শেষ অবস্থা, খবরটা পৌঁছে দিল রমজানের বাড়িতে। রমজান ছিল না। পরে শুনল রমজান এসেছে, এদিকে বুড়িও অক্কা পেয়েছে। ছুটতে ছুটতেই খবরটা দিয়ে এলাম রমজানকে। এসে দেখি মাষ্টার আর মেজো মিঞা নিজেরই লেগে গেছে কবর খুঁড়তে। এটা শরমের কথা না? ওদের হটিয়ে আমি আর ফজর আলী খুঁড়ে ফেললাম কবরটা। মনে পড়ল ধানের কথা। সেই ধান নিয়ে আবার ছুটছি তালতলিতে। তবুও তুই চিল্লাবি?

গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেল লেকু। তারপর টাঁ্যাক খুলে বের করল ছোট্ট একটা পানের খিলি। পানের খিলিটা গালে পুরে একটু দম নিল। ছুরমতি এবার খিঁ খিঁ হাসল। বলল, হাঁ্যা হাঁ্যা, তুমি যে কামের মানুষ সে কি কারও অজানা? এখন জলদি জলদি যাও, জলদি জলদি ফিরে এস। মোর্দাটাকে দাফন করতে হবে তো।

এতক্ষণে মালুর দিকে মনযোগ দিল লেকু। বলল না কিছু, খুসি হয়েছে—ছোট্ট হাসিতে শুধু সেটুকুই জানিয়ে দিল। তারপর ধানের কোরাটা মাথায় তুলে রওনা দিল তালতলির দিকে।

রমজানের দায়ের কোপ জোয়ান শরীরের যে তাকতটা কেড়ে নিয়েছিল সে তাকতটা ফিরে পায়নি লেকু। তবু ওর চলায়, ধানভর্তি কোরাটা দুহাতের টানে মাথায় তুলে নেয়ার মাঝে সেই ষোল বছর আগের মতই এমন

এক শক্তি আর পৌরুষের প্রকাশ যা যে কোন মানুষকে মুগ্ধ করে। হুরমতিকেও বুঝি এই পৌরুষই মুগ্ধ করেছিল। আজও মুগ্ধ করে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে হুরমতি গাছ গাছালির ঝোপে ঢাকা পথটার দিকে যেখানে এই মাত্র অদৃশ্য হয়ে গেল লেকু।

লেকু আর হুরমতি। বাকুলিয়ার যা কিছু মালুর কাছে প্রিয় তার সাথে জড়িয়ে আছে ওরা। ওদের কাছে এসে মালুর মনে হল ওর বুকের অনেক শূন্যতা ওর অলক্ষ্যেই কখন ভরে গেছে। গেছে কয়েক মাসের সকল নিরানন্দ আজ এক মুহূর্তেই মুছে গেছে।

জান রাবু আপা, হুরমতি বুয়ার কাণ্ড? ভর্তি করে দিয়ে এলাম হাসপাতালে। দুদিন পর গিয়ে দেখি নেই, পালিয়ে গেছে হাসপাতাল ছেড়ে। কেন পালিয়েছিলে হুরমতি বুয়া?

কি যেন বলতে যাচ্ছিল হুরমতি। কিন্তু তার আগেই রাবু বলতে শুরু করেছে। কাণ্ডকি আর কম করেছে ও? একমাত্র লেকুই ওর দাওয়াই। শুনেছিস সে ঘটনা?

না তো? ঔৎসুক্যে গলাটা রাবুর দিকে বাড়িয়ে নিল মালু।

হুরমতি তো বিয়ে করল লেকুকে। প্রথম দিনটা ভালয় ভালয় কাটল। দ্বিতীয় দিন বাধল গোলমাল। হুরমতি বলে, তুমি আমার বাড়িতে উঠে এস। লেকু বলে, কখখনো না। আমি কেন তোর ঘর জামাই হতে যাব? ব্যস লেগে গেল দুজনে।

তারপর?

একদিন যায়। দুদিন যায়। তিন দিন যায়। নড়চড় নেই লেকুর কথায়। চারদিনের দিন সুড় সুড় করে হুরমতি বিবি উঠল গিয়ে লেকুর বাড়ি।

হো হো করে হাসল মালু। রাবুও।

বুঝি লজ্জা পেয়ে মাথায় কাপড় টানল হুরমতি। বলল, ছিঃ বুজান। একটা মুর্দাকে সামনে রেখে ঠাট্টা তামাসা করছি আমরা?

চমকে উঠল মালু। রাবুও। কথার মাঝে ডুবে গেছিল ওরা, ভুলে গেছিল রমজানের মৃতা মা ওদের চোখের সামনেই শুয়ে আছে শেষ শয্যায়।

এটাইতো স্বাভাবিক। মৃত্যুর জন্য জীবন কখনো অপেক্ষা করেনা। মৃত্যুর পাশাপাশিই জীবনের অস্তিত্ব। তাই না, রাবু আপা? অপ্রস্তুত হওয়া রাবুকে কিছুটা সহজ করার জন্যই বলল মালু।

কিন্তু রাবু ততক্ষণে ডাঙ্গা ছেড়ে পৌঁছে গেছে উঠোনে। সেখান থেকে ফরমাশ দিচ্ছে, ঘড়াগুলো নিয়ে যা, পানি তুলে দে।

ওমা সে কি কথা? তুমি একলা মুর্দা গোশল করাবে নাকি? হুরমতি চেঁচিয়ে উঠল। একটু অপেক্ষা কর। তোমার আব্বাকে ভাতটা দিয়েই ফিরে আসছি আমি।

এখনও ভাত দাওনি আব্বাকে? হুরমতি বুয়া, তুমি শীগগীর যাও। আব্বা নিশ্চয় বাড়ি মাথায় করছে। আতঙ্কিত কণ্ঠ রাবুর।

যা হয়েছে তোমার আব্বা, ছিল দরবেশ হয়েছে লাট সাহেব।

আলু সেদ্ধ দিলাম। ডিম ভাজী করে দিলাম। সঙ্গে ঘিয়ের রান্না মুগডাল। বলে কিনা মাছ দে, নয়ত গোশত দে, কি আর করি। মুরগী একটা জবাই করে ছিলে টিলে রেখে এসেছি। এখন রান্না করব। যেতে যেতে বলল হুরমতি।

ঘড়া নিয়ে চৌবাচ্চার দিকে চলে গেল মালু। পানিতে ভরিয়ে দিল মৃতার চৌকির পাশে রাখা মটকাটা।

ব্যস, ওতেই চলবে। বাইরে গিয়ে বস তুই। আমি না ডাকলে এদিকে আসবি না। সাবান আর কর্পূরের মোড়কটা খুলতে খুলতে বলল রাবু।

বাইরে এসে কবেকার পড়ে থাকা ভাঙ্গা এক চৌকির পায়ার উপর বসল মালু। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সব কিছুই যেন স্পষ্ট দেখছে ও। দেখছে, ধীরে ধীরে মোর্দার আবরণটা সরে গেল। কোমরের কাছে কোন রকমে জড়িয়ে থাকা শাড়ির টুকরোটাও খুলে ফেলল রাবু। তারপর আস্তে আস্তে বদনা বদনা পানি ঢালল মৃতার শরীরে।

প্রথমে সাবান ঘঁসে মাথার চুলগুলো পরিষ্কার করল। পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিল পানিটা। তারপর চিরুনী চালিয়ে পাট করে দিল সনের মতো ধূসর দড়ি পাকান চুলের গোছাগুলো।

এবার পুঁজগলা, ফাটা, কোথাও কোথাও বা কুঁচকে যাওয়া শরীরটাকে আস্তে আস্তে সাবান মেখে ধুয়ে দিল রাবু। গভীর যত্ন আর মমতায় ন্যাকড়া চেপে চেপে পুঁজ আর পানিটা শুকিয়ে নিল। একটা ধোয়া সাড়ি দিয়ে দেহটাকে ঢেকে দিল আবার। ডাকল মালুকে, এ দিকে একবার আসবি মালু?

মসজিদের মুর্দা ফরাসের খাটিয়াটা দাওয়ায় তুলে রেখে গেছে জাহেদ আর রুস্তম আলী। খাটিয়াটাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এল ওরা। কাফনের এক

প্রস্থ কাপড় খাটিয়ার উপর বিছিয়ে দিল রাবু। তারপর দুজনে ধরাধরি করে মুর্দাকে উঠিয়ে নিল চৌকি থেকে। শুইয়ে দিল শেষ যাত্রার পালকিতে।

যা এবার।

চলে এল মালু। রাগ হল ওর। মরা মানুষের সামনেও জ্যান্ত মানুষগুলোর সংস্কারের অন্ত নেই। মরার না আছে জাত, না আছে ধর্ম, না স্ত্রী পুরুষের ভেদ। কী এমন আসে যায় বুড়ির শেষ গোসলে, শেষ প্রসাধনে মালুও যদি একটু হাত লাগায়! আর একলা একলা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে রাবু। তবু মালুকে থাকতে দেবেনা পাশে।

রাবুর ওই বোরখাটা। সেও তো একটি কুসংস্কারের স্বীকৃতি। সৈয়দ বাড়ির মেয়ে বেপরদা, ঢি ঢি পড়ে যাবে গোটা তল্লাটে। তাই লোক নিন্দা আর নিজের ইচ্ছা কোনটাকেই অগ্রাহ্য না করে একটা মাঝামাঝি রাস্তা কেটে নিয়েছে রাবু। মালু বুঝে পায়না রাবুর মত মেয়েরাও কেন আপোস করবে?

মৃতার গায়ে আতর মাখল রাবু। আতর ভেজা তুলো গুঁজে দিল ওর কানে। কাফনের কাপড়ে কর্পূর পানি ছিটিয়ে দিল। সাথে একটু গোলাপ নির্যাস। এ যেন পাক হয়ে সাফ হয়ে গন্ধ মেখে নতুন পোষাকে কোন এক আনন্দ যাত্রা। অথবা এ এক অন্তিম আকুতি মানুষের আজন্ম সৌন্দর্য কামনার। সুন্দর হয়ে পবিত্র হয়ে, সারাক্ষণ খোসবু দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখা, এমন করে যে বাঁচা সে কয়টি মানুষের ভাগ্যে ঘটে? হয়ত তাই সবারই আকাঙ্খা শেষ যাত্রার সময় পৃথিবীর শেষ দিনটিতে সব কাদা কালি ধুয়ে মুছে আতর মেখে নতুন পোষাকে ওরা সাজুক। সেজে গুজে যাত্রা করুক।

কবর খুঁড়ে এসে গেছে ফজর আলী জাহেদ সেকান্দর। মৃতার খাটিয়াটা কাঁধে তুলে নিল ওরা। মালুকেও কাঁধ লাগাতে হল।

একটা মোল্লা নেই। একটা মৌলভী নেই। কবর খোড়ার একটা লোক নেই। বাপদাদার জন্মে কেউ শুনেছে এমন কথা? সব ব্যাটা জাহান্নামে যাবে। সব জাহান্নামে যাবে। গজ গজ করে সেকান্দর।

থামনা মাষ্টার। কবরে গিয়েও দেখছি শেষ হবেনা তোমার বিক্ষোভ। মৃদু ধমকে বলল জাহেদ।

তবু গজর গজর না করে বুঝি পারেনা সেকান্দর। মাথার উপর ভারটা সামলিয়ে চলতে অসুবিধে হচ্ছে ওর। খাটিয়াটির চার পায়ার পাশ

দিয়ে চারটি লম্বিত ডাণ্ডা। একটি পায়া কেমন নড়বড়ে। গত কুড়ি দিন ধরেই মরা বইতে হচ্ছে। মেরামতের সুযোগ পায়নি ওরা। সেই নড়বড়ে পায়াটাই পড়েছে সেকান্দরের কাঁধে। তাই সামলে বুঝে চলতে হচ্ছে ওকে। পায়াটার ওপর হাত রেখে চৌকাঠটাকেই কাঁধের উপর নিয়েছে সেকান্দর। আর সেই কসরতে কখনো এদিক কখনো ওদিক বেঁকে যাচ্ছে খাটিয়াটা।

আহা। দেখতো কী রকম ঝাঁকুনি খাচ্ছে বুড়িটা। একটু আস্তে চল মাষ্টার।

সাবধানী দিল জাহেদ। বলল আবার, একটু দাঁড়াও।

কাঁধটা পাল্টিয়ে নিল ওরা।

আহা বেচারী! ছেলেমেয়ে নাতিপোতা সব থেকেও কেউ ছিলনা বুড়ির। শেষ যাত্রায়ও একটু আরাম পেলনা। আপন মনে বিড় বিড় করে সেকান্দর। তারপর যেন জাহেদকে শোনাবার জন্যই চেঁচিয়ে বলল: বুড়ির অভিশাপ লাগবেনা ভাবছ? আলবৎ লাগবে। এই আমি বলে রাখছি, এই বুড়ির বদদোয়ায় ছারখার হবে রমজানের শাদ্দাদী বালাখানা।

হয় কি তাই? কখনো হয়েছে?

কেন যেন সেকান্দরের এই অটুট কিন্তু মিথ্যা বিশ্বাসে এই মুহূর্তে হাসি পেলনা মালুর। ওর মনটা যেন সেকান্দরের ভবিষ্যতবাণীটাকেই বিশ্বাস করতে চাইল, বিশ্বাস করে কি এক সান্ত্বনা পেতে চাইল।

মৃত্যুর পর মানুষের ওজনটা হয়ত বেড়ে যায়। হয়ত তাই কাঁধের উপর রমজানের মৃতা মায়ের ভারটা ওর শীর্ণ দেহের তুলনায় বেশীই মনে হয় মালুর। ধীরে ধীরে পা ফেলছে আর চোখ দুটোকে দুপাশে চলমান রেখেছে মালু।

ট্যাণ্ডল বাড়ি, মৃধা বাড়ি, ভুঁইঞা বাড়ি মাঝি বাড়ি, শেখ বাড়ি, কারি বাড়ি, চৌকিদার বাড়ি আর এর মাঝে মাঝে অনেক বাড়ি যে গুলো অমুক বাড়ি না অমুকের বাড়ি বলে বিশিষ্ট নামের কোন মর্যাদা এখনও পায়নি, একটার পর একটা পেরিয়ে যায় ওরা। প্রতিটি বাড়ি, প্রতিটি ঘরের সাথে মালুর নিবিড় পরিচয়। মানুষের সাড়া নেই কোন বাড়িতে।

স্মৃতিরা জেগে ওঠে। স্মৃতিরা আবার ঘিরে ধরে মালুকে। চোখের সমুখে ভেসে ওঠে মানুষগুলো। কারি সাহেব, হাফিজ সাহেব আর

সেই খতিব সাহেব, গালের পান পুরে গালটাকে সব সময় ফুলিয়ে রাখতেন যিনি, সেই রহমত যার গরুর গাড়িতে একবার চড়েনি এমন লোক নেই এ তল্লাটে।

বেচারী ট্যাগুল বৌ। দুটো ছেলেই গেছে কবরে। ট্যাগুল আটক পড়েছে বার্মায়। আহা দেখ, মাঝি বাড়ির ঘাটায় কুকুরটা শুয়ে আছে। ওই এক কুকুর ছাড়া আর কেউ নেই ও বাড়িতে। যেন মালুর চিন্তাটা অনুসরণ করেই বলে গেল সেকান্দর।

কসিরের ছাড়াবাড়ির পাস দিয়ে চলেছে ওরা। কসিরের ভিঁটিতে চাষ দিয়েছিল রমজান, কিন্তু ভিটিটা তেমনি উঁচু রয়ে গেছে। ভিটিটা ঢাকা পড়েছে বাবলা আর বুনো বেতের ঝোপে।

ধীরে ধীরে নেমে আসছে বিকেলের আবছায়া। দূরে মিঞাদের সুপুরি বাগানের ওপারে অস্ত চলেছে সূর্য। সুপুরি ডালের চিকন গায়ে দিন বিদায়ের রক্তরাগ।

নিথর নিঝঝুম বাকুলিয়া। কোথায় এতটুকু প্রাণের সাড়া নেই। শব্দ নেই। থ্যাবড়া নাকের মতো নিচু নিচু ছনের কুঁড়েগুলো শুধুমাত্র নৈঃশব্দকে বুকে নিয়ে জুবুথুবু পড়ে রয়েছে। বসন্তের মারী উজাড করেছে বাকুলিয়াকে।

কিন্তু, মানুষগুলো কি আবার ফিরে আসবে না? ছনের শূন্য কুঁড়েগুলো কি আবার শিশুর কান্নায় মায়ের হাসিতে ভরে উঠবেনা?

শোকার্ত ওই পশ্চিম দিগন্তের কাছেই যেন জবাব চাইল মালু।

গোরের কোলে শেষ বিছানায় বুড়িকে শুইয়ে দিল ওরা। ঝুরঝুরে মাটি ঢেলে ঢেকে দিল কাফনটা।

ঢিপির মতো উঁচু হয়ে গেল কবরটা। ছয়টি হাত সযত্নে চার পাশের মাটিটা ঢালু করে নামিয়ে দিল কবরের চারটি পাড়। কবরের পিঠটাকে গম্বুজের মত সামান্য উঁচিয়ে মাটির ঢেলাগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে সমান করে দিল ওরা। তার পর কবরটার উপর পুঁতে দিল ছোট্ট একটি 'মেন্দি' গাছের ডাল।

পাশাপাশি আরও অনেকগুলো কবর। কাঁচা কবর। বুঝি গুনতে চেষ্টা করল মালু। পারলনা।

দাফন সেরে গোসল করল ওরা। গোসল করে উঠে এল বড় দালানের রোয়াকে।

সৈয়দ বাড়ির সেই বড় দালানটা। একটা শির শির অনুভূতি স্নায়ু বয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল মালুর। স্মৃতিরা আবারও ঠেলে উঠল। অজস্র বাহু মেলে ওকে টেনে নিতে চাইল অতীতের দুয়ারে।

স্মৃতিরা মিষ্টি, অভিজ্ঞতাগুলো তেতো। দুয়ে মিলে বুঝি সুমুখের আলো। ভেবে বেশ অবাক হল মালু। যে গ্রাম যে বাড়িতে ওর জন্ম, কোনটাই ওর আপন নয়। আপন নয় বলেই ছেড়ে গেছিল, অপমান আর অস্বীকৃতির জ্বালা বুকে নিয়ে। কি এক দুর্নীবার টানে সে গ্রামে, সে বাড়িতেই তো আবার এল ও। এ কি মাটির টান? নাড়ির টান? যে টান কেউ অস্বীকার করতে পারেনা কখনো?

চাট্টি খেয়ে জলদি জলদি শুয়ে পড়। যা খাটুনি গেছে দিনভর, রাবু ডাকল ওদের।

হ্যা, তাই দাও। গরু ছাগল, আর মানুষ সবাই এক সাথে মিলেই আখেরি কাজটা সেরে ফেলেছে। কাল থেকে নিস্কৃতি। লম্বা করে বুঝি একটা নিস্কৃতির নিঃশ্বাসই ছাড়ল সেকান্দর।

ভ্রু জোড়া কুঁচকে, চোখ দুটোকে সরু করে ওর দিকে তাকাল জাহেদ। বলল: সারা গ্রাম আজ কবরখানা। আর তুমি ভাবছ নিস্কৃতির কথা?

লোকগুলোকে ফিরিয়ে আনতে হবেনা?

সেকান্দর যেন গায়েই মাখলনা ওর কথাটা। বলল: বলিহারি রমজান। নিজের বাজারটা দিব্যি বাঁচিয়ে ফেলল। একটা লোকেরও যদি গুটি উঠত তালতলিতে।

উঠলে যেন খুব খুসি হতে তুমি? দেখ মাষ্টার, মরে গিয়েও রমজান ভুত হয়ে চেপে থাকবে তোমার ঘাড়ে। আমি বললাম, দেখে নিও। অসন্তোষের খোঁচা জাহেদের স্বরে।

সেই দুপুর থেকেই লক্ষ্য করছে মালু, কম কথা বলছে জাহেদ, যা ওর স্বভাবের বিপরীত। আর যখন বলছে কি এক তীক্ষ্ণতার ধার তুলছে, একটু যেন ঝাঁঝ উড়িয়ে দিচ্ছে।

সেই দুপুর থেকেই দেখছে মালু, শান্ত ধীর সংযত জাহেদ, যা কোন কালে ছিলনা ও। অভিজ্ঞতা বুঝি ওর দুরন্ত আবেগের অস্থিরতাটা কেড়ে নিয়ে

ওকে দিয়েছে গভীরতা। সে গভীরতা ওর ভাবনায়, ওর ধীর আচরণে, ওর তীক্ষ্ণ কথায় ও।

আলবৎ খুসি হতাম। আরো খুসি হতাম যদি উজাড় হত ওই তালতলির বাজার, ঝাড়ে বংশে নির্মূল হত ওই কমজাত শুয়রের গুষ্টিটা।

এবার হাসল জাহেদ। বলল : এ হল সিনিকের কথা, হতাশার কথা। তর্ক রেখে খেতে বস তো। হস্তক্ষেপ করল রাবু।

পাতা দস্তরখানের সুমুখে শতরঞ্চির উপর এসে বসল ওরা।

কই তোর পাত কই ? রাবুর দিকে তাকিয়ে শুধাল জাহেদ।

আমি গরম গরম একটু দুধ খেয়ে নিয়েছি, আর কিছু খাব না।

কেন ?

এমনি। ভাল লাগছে না। চামচ দিয়ে ভাত তুলতে তুলতে উত্তর দিল রাবু।

হারিকেনের স্বল্প আলোয় জাহেদ তাকাল রাবুর মুখের দিকে। কি যেন খুঁজল সেখানে। খপ করে ধরে নিল ওর একখানি হাত। উত্তাপটা অনুভব করল। নাড়ির উঠতি পড়তি স্পন্দনটা গুনে দেখল।

থাক। তোমার আর ডাক্তারী করতে হবে না। হাতটা ছাড়িয়ে নিল রাবু।

নিশ্চয় ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করেছিস ?

তুমি যেন কত গরম পানিতে চান করে এলে, পাশ কাটাতে চায় রাবু।

অন্যায় করেছিস। তিরস্কার জাহেদের চোখে।

চকিত দৃষ্টিতে বুঝি মিনতি ঝরে পড়ল রাবুর। যেন স্বীকার করে নিল অন্যায়টা। কেউ না-শুনতে পায় তেমনি নীচু গলায় বলল : হয়েছে। বকুনিটা থামিয়ে এবার থালার দিকে মন দাও।

এশার নামাযের আযান পড়ল না। না মিঞা বাড়ির মসজিদে, না সৈয়দ বাড়িতে। বাকুলিয়ার জীবনে এমন একটা ব্যতিক্রম, ভাবতে পারেনা মালু।

কেমন একটা গুমোট গরম। তাই বারান্দায়ই মালু আর জাহেদের জন্য দুটো বিছানা পেতে দিয়েছে রাবু। সেকন্দার শুয়েছে ঘরে। শুয়েই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

মালুর বিছানার চাদরটা বেরিয়ে এসেছে শানের উপর। চাদরটা তোষকের তলায় গুঁজে দিতে দিতে বলল রাবু : ঘুমিয়ে চাংগা হয়ে নে। সকালে উঠে গল্প করা যাবে।

আচ্ছা। যেন উপায় নেই তাই ঘুমুতেই রাজী হল মালু।

বালিশে মাথা রেখে কেমন উসখুস করে জাহেদ। হাতের তালপাখাটা বিরক্তিভরে ছুঁড়ে রাখে পায়ের কাছে।

কি হল? তুমিও কি মাষ্টারজীর মতো মনে মনে কারো চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডি চটকাচ্ছ নাকি। ছোট্ট হেসে শুধাল রাবু।

না।

তবে ঘুমাও।

ঘুম কি আসবে? স্বরটাকে কেমন অসহায় আর কাতর করে বলল জাহেদ। তারপর মধ্যমা আর বুড়ো আঙ্গুলে কপালের দুপাশটা টিপে ধরে চোখ বুজল।

ভারি দুষ্টু হয়েছ তো? কপট রাগে বলল রাবু। চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

মেজো ভাইয়ের মাথা ধরেছে। দাওনা একটু টিপে। সুপারিস করল মালু।

তুই জানিসনা। শোবার আগে আজকাল রোজই ওনার মাথা ধরছে। টিপে না দিলে ঘুম আসেনা। তেমনি কৃত্রিম গাম্ভির্যে বলল রাবু। কিন্তু বসল জাহেদের শিথানে। বালিশটা সরিয়ে কোলের উপর টেনে নিল ওর মাথাটা। আঙুলগুলো ডুবিয়ে দিল ওর চুলের ঘন অরণ্যে। বলল: বক্তৃতার বেলায় তো নির্যাতিতের দরদে বুক ভাসাও। এদিকে ফিউডাল অভ্যাসগুলো দিব্যি আছে।

ছোট বেলা থেকে এই দেখছিস বুঝি তুই? আহত অভিমান জাহেদের স্বরে।

আহা, তাই যেন বলেছি আমি। আস্তে জাহাদের ঠোঁটের উপর নিজের নরম আঙুল গুলো বিছিয়ে দিল রাবু।

দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া জানা নেই মালুর। ক্ষীণাঙ্গী চাঁদ হয়ত লুকিয়ে আছে কোন মেঘের আড়ালে। আকাশের বুকে বসেছে হাসিখুশি তারার মেলা। এখানে সেখানে দুচারটি হাল্কা মেঘ গা জড়াজড়ি করে ভেসে বেড়াচ্ছে, ইতস্তত:। যেন কোন কাজ নেই ওদের।

মিটিমিটি তারার ঝাড় পিদিমে মৃদু আলোকিত আকাশটা যেন আজ নেমে এসেছে অনেক নীচে। কি এক সান্ত্বনার আলিঙ্গন বাড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর রাত্রির প্রথম প্রহরে আকাশ কত সুন্দর, স্নিগ্ধ মায়া ভরা তার তারা চোখের চাহনি, কবে যে এমন করে দেখেছিল আকাশের দিকে, ভুলে গেছে মালু। ওর ইচ্ছা হল সঁপে দিক আপনাকে আকাশের আলিঙ্গনে, বিবশ হয়ে চোখ বুজুক, ভুলে যাক বিরানা বাকুলিয়ার যন্ত্রণা, নিষ্ঠুর যত মৃত্যুর যন্ত্রণা। বিস্মৃত হোক সেই রাজধানী আর সেই মেয়েটিকে।

রাবু। তোর হাতটা বড় গরম।

ও কিছুনা। শুধু শুধুই উদ্বিগ্ন হচ্ছ তুমি।

ছোট ছোট কথার কলি ভাঙ্গছে জাহেদ আর রাবু। ভাল লাগে মালুর। ওদের কথায়, ওদের নাড়ির স্পন্দনে যেন ওরই কথার প্রতিধ্বনি, ওরই নিজের নাড়ির সুর।

গলা খাঁকারি দিয়ে বেরিয়ে এলেন দরবেশ। এশার নামায পড়বেন। তাই বাইরের পুকুরে চলেছেন ওজু করতে। ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়ায় রাবু। নিঃশব্দ পায়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ঘরের ভেতর।

খড়মের খটখট আওয়াজ তুলে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন দরবেশ।

মুহূর্তে আকাশের আলিঙ্গন থেকে যেন ছিটকে পড়ল মালু। আকাশটা সরে গেল আপন সীমাহীন দূরত্বে।

দরবেশকে এখনো সইতে পারেনা মালু। অন্ধকার নিস্তব্ধ রাতে প্যাঁচার আচমকা কর্কশ আওয়াজটা যেমন গায়ে কাঁটা ফোটায় তেমনি শঙ্কিত অস্বস্তিতে উঠে বসল মালু।

কিরে? উঠে গেলি যে? বালিশ থেকে মাথাটা একটু আলা করে শুধাল জাহেদ।

ভাবছি।

ভাবার উপযুক্ত সময় আর পরিবেশ বটে। মুচকি হাসল জাহেদ।

হুঁ। অস্ফুট উচ্চারণ করেই আবার চুপ মেরে গেল মালু।

কি ভাবছিস?

ভাবছি দরবেশ চাচার কথা। তাঁর স্বার্থপর অধ্যাত্মিকতার মাশুল যোগাতে গিয়ে দুটো মেয়ে খুন হয়ে গেল।

হুঁ। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও যেন বেরিয়ে এল জাহেদের বুক চিরে। বলল আবার: দুটো নয় রে একটা।

সাড়া না পেয়ে চুপ করে গেল জাহেদ। হয়ত নিজেও ডুবে গেল কোন অন্তহীন ভাবনার গভীরে।

তারা ভরা আকাশটা যেন নীরবে এসে যোগ দিল ওদের ভাবনায়।

অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

গর-র-রগ-অ-অ। বারান্দার শেষ প্রান্তের ঘরটিতে জোরে জোরে নাক ডেকে চলেছে সেকান্দর।

মেজো ভাই। মাষ্টার সায়েব বড় মজার লোক। তাই না? ফুক করে

রেগে উঠতেও যেমন সময় লাগেনা তেমনি পিঠে বিছানাটা লাগতে না লাগতেই ঘুম। বলল মালু।

ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কেমন আল্গা ভাবে বলে চুপ করে যায় জাহেদ। ও বুঝি ডুবে আছে একটুক্ষণ আগের অনুচ্চারিত ভাবনাটির মাঝে। না, ভাবনা নয়, কি এক আনন্দ যেন। সেই আনন্দটাকেই জিবের ডগায় রেখে চেখে চেখে উপভোগ করে চলেছে ও।

বিরামহীন বিরতিহীন এক চলার আবেগ ওর জীবনটা। চলতে চলতেই ভাবনা। ভাবতে ভাবতেই চলা, এর মাঝে কত মোড় গেছে ঘুরে, কত ভাব গেছে বদলে। পুরাতন চিন্তা আর পরিবেশে এসেছে নতুনের অভিনবত্ব। নতুনের মাঝে খেই হারানোর সমস্যা আসেনি। যেমন প্রশ্ন ওঠেনি পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার। শুধু একটি গ্রন্থি শিথিল হয়নি। সে বুঝি রাবু, একটি আনন্দের গ্রন্থি যা দিনে দিনে দৃঢ়তর হয়েছে, সুন্দরতর হয়েছে।

অনেক সময় ক্লান্তি এসেছে, উন্মনা হয়েছে মনটা। কি এক কাতরতায় ব্যাকুল হত মনটা, নরম কটি আঙুলের স্পর্শ, একটু বা কোমল উষ্ণতার ছোঁয়া, শান্ত দৃপ্ত একটি মুখের মায়া, সব মিলিয়ে অপার সান্ত্বনা আর নির্মল আনন্দের স্নিগ্ধ ছায়া। সে ছায়ার আশ্রয়ে ছুটে আসত জাহেদ, বলত: চল্ রাবু, একটু খোলা মাঠে বেড়িয়ে আসি।

স্মিত হেসে রাবু বলত—চল।

কখনো বা এই উন্মনা মনটাকে আর তার কাতর ব্যাকুলতাকে আপন অস্থি আর চৈতন্যের বাঁধন থেকে সজোরে ছিঁড়ে নিয়েছে জাহেদ। এক পাশে সরিয়ে রেখেছে। শাসিয়েছে নিজেকে, কেন এই বিলাস? কেন এই মমতার আনন্দছায়ার লোভ? পথের মাটিটাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে ও। কিন্তু মন কি মেনেছে সে শাসন? আজ ভাবতেও অদ্ভুত লাগে ওর। যা ছিল স্নেহমাখা মমতা, হয়ত করুণাও, রাবু তাই মনে করে, সেই মমতাটা ওর অজানতেই কখন রূপান্তরিত হয়েছে তীব্র তীক্ষ্ণ এক ভালবাসার অনুভূতিতে। সে ভালবাসাটা আজ আর শুধু পিছু টানে না, সুমুখেও ঠেলে দেয়। শক্তি দেয়। অভয় দেয়। বুঝি সে জন্যই সেটা আনন্দ, স্নিগ্ধ শীতল আনন্দ ছায়া।

রাবুর তুলতুলে আঙুলের স্পর্শটা বুঝি এখনো লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে আর চিবুকে। হাতের তালুটা কি এক আদরে আপন মুখের উপর আস্তে বুলিয়ে নিল জাহেদ।

বাবা জাহেদ। জেগে আছ নাকি? নামায সেরে পাশে এসে বসেছেন দরবেশ।

জী। রোমন্থনের জগৎ থেকে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসে জাহেদ।

কেশে গলাটা সাফ করলেন দরবেশ। দাড়ির নীচের ত্বকটা বার দুই চুলকিয়ে নিলেন। কিছু বলবেন, এ বুঝি তারই ভূমিকা।

পোশাকে আশাকে, কথায় আচরণে অবিশ্বাস্য রকম বদলে গেছে দরবেশ। প্রায় দিগম্বর দরবেশের গায়ে এখন জোব্বা পিরাণের আধিক্য। লম্বা বাবরির যায়গায় সুন্দর আর ছোট করে ছাঁটা সিঁথী কাটা চুল। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। জিকির করা ছেড়ে দিয়েছেন। প্রচুর পরিমাণ আহার করে উদ্গার তোলেন। আলবোলায় টানেন মশলা মাখা সুগন্ধী তামাক। সব মিলিয়ে মনে হবে স্বাভাবিক সুস্থ সুখী মানুষ দরবেশ।

কিছু বলবেন? অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও দরবেশকে নীরব দেখে শুধাল জাহেদ।

হ্যাঁ। বলাই উচিত। তবু ইতস্তত: করলেন দরবেশ। তসবির ছড়াটা বের করে আনলেন জামার পকেট থেকে। একটু নেড়ে চেড়ে আবার ফিরিয়ে রাখলেন পকেটে। তারপর ধাঁ করে বলে ফেললেন কথাটা: রাবুর পড়াশোনা তো শেষ হল। ভাবছি এবার ওকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

চনচন করে গোটা দেহের রক্তটা বুঝি মাথার দিকে দৌড়ে গেল জাহেদের। বলল: আপনার মেয়ে। ইচ্ছে হয় কেটে পানিতে ভাসিয়ে দিন। আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন।

কখ্খনো না। সেই বুড়ো এক পা কবরে দিয়ে ধুক ধুক করছে। তার কাছে যাবে রাবু আপা? অসম্ভব। চেঁচিয়ে উঠল মালু।

থাম্ তো ছোকরা। তোকে নাক গলাতে বলছে কে! শুধু ধমক দিল না, কান মলে ওর আসল যায়গাটা যেন চিনিয়ে দিল দরবেশ।

তবু থামলনা মালু। বলল: আপনি না মোহাম্মদের উম্মত? ইসলামের পাবন্দ্? এ সব নিয়ে তো খুব বড়াই করেন, আর এ দিকে মেয়ের মতটাই নিচ্ছেন না।

মেয়ের মত? একটু যেন ভাবনায় পড়লেন দরবেশ। যেন মতটা নেয়ার জন্যই উঠে গেলেন ঘরের দিকে।

এ কি করলে মেজো ভাই? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আরাম তোমার হারাম? আর নিজের বেলায়, তোমার নিজের অংশ যে আর একজন,

তার বেলায় কেমন করে এত দায়িত্বজ্ঞানহীন হও মেজো ভাই? যেন তারাগলা রাতের বুক চিরে তীক্ষ্ণ কোন আর্তনাদের মতই বেরিয়ে এল মালুর কথাগুলো।

নিরুত্তর জাহেদ। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত বাধা, স্পর্শকাতর মনের যত জটিলতা জয় করে ওরা যে হাতে হাত মিলিয়েছে, মনে মন মিলিয়েছে। সুন্দর সেই গ্রন্থিটা ছিঁড়বার জন্য দরবেশের আবির্ভাব হবে, এ কি ভেবেছিল জাহেদ? অকস্মাৎ সচকিত হল ওরা।

না না। জান গেলেও না। কী সম্পর্ক আমার ওই বুড়োর সাথে! তাকে আমি স্বীকার করি না, মানি না। কোনদিন মানিনি। দৃঢ় উদ্দীপ্ত কণ্ঠ

কণ্ঠটা দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। দ্রুত নিঃশ্বাসের সশব্দ পতনের ধাক্কাটাও যেন এসে লাগছে ওদের গায়ে।

প্রত্যুত্তরে ওরা শুনল চাপা গর্জন, ভৎর্সনা, তিরস্কার। অশ্রাব্য কতগুলো গালি। কুৎসীত ইঙ্গিত বাবু এবং বাবুর গর্ভধারীনি মৃতা মা সম্পর্কে। ক্ষিপ্ত দরবেশ বলতে পারেনা এমন কথা নেই, করতে পারেনা এমন কাজ নেই।

নিস্পন্দ জাহেদ। রুদ্ধশ্বাস মালু।

মাফ করবেন আব্বাজান। কোনদিন আপনার মুখে মুখে তর্ক করিনি, কথা বলিনি, কিন্তু আজ বলছি। আমাকে জ্বালাবেন না।

ওরা যেন দেখল! নির্বাক বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে দরবেশ। দেওবন্দের বুজুরগ আলেম, মাইজভাণ্ডারের দেওয়ানা দরবেশ এ কী দেখল চোখের সুমুখে? অভাবনীয় অকল্পনীয় এক প্রতিরোধ আর বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। দপ করে জলে উঠেছে, ছুটে চলেছে কোন উল্কা খণ্ডের মতো। হয় তাকে পথ করে দিতে হবে, নয়ত পথ রোধ করে পুড়ে মরতে হবে।

দেওয়ানা দরবেশ। জীবনে তার অভিজ্ঞতার একমাত্র নারী, সে একান্ত দুর্বল। অসহায়। আত্মসমর্পণে সদা প্রস্তুত। পায়ে পড়েছে। দেয়ালে মাথা কুটেছে। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। লাথি খেয়েছে তবু যে পায়ের লাথি খেল সেই পাটাকেই জড়িয়ে ধরেছে। তারপর একদিন আপন অদৃষ্টের কাঁধে সকল বোঝা হাল্কা করে চলে গেছে সম্ভোগের এই পৃথিবী ছেড়ে।

কিন্তু, নিজের মেয়ে, সে বিদ্রোহ করে? মুখে মুখে কথা ফিরিয়ে দেয়?

আপনার মতো নিষ্টুর পিতা, আমি কোনদিন দেখিও নি, শুনিও নি।

শক্ত অভিসম্পাতটা দরবেশের গলার মাঝ পথেই বুঝি আঁটকে রইল।

ওরা শুনল রাবুর পায়ের শব্দ। রাবু বেরিয়ে এসেছে দরবেশের ঘর থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে খিল এঁটেছে।

ওরা ঘুমায়নি। পরস্পরের অনিদ্রার সাক্ষী হয়ে শুধু ঘুমের ভান করে নিথর পড়ে থাকে বিছানায়।

রাত গড়িয়ে চলে।

ধপ করে কি যেন পড়ল। ওরা চোখ খুলে দেখল।

রাবুর হাতের মোড়াটা পড়ে গেছিল। মোড়াটা ঠিক করে ও বসল।

কী ব্যাপার! ঘুমুবেনা? শুধাল জাহেদ।

ঘুম আসে কই? কিছুক্ষণ আগের তিক্ততাটা এখনও মুছে যায়নি রাবুর গলা থেকে।

জাহেদ উঠে বসল। মালুও।

রাত বাড়ছে। দালানের পেছনে, রসুই ঘরের পাশে আমগাছগুলোকে মনে হয় কালো বিকটকায় ছায়া। যত গভীর হচ্ছে রাত ছায়াগুলো যেন ছোট হয়ে আসছে আর উজ্জলতর হচ্ছে তারার প্রদীপ। তারায় আলোকিত আকাশটাকে সুমুখে নিয়ে নিঃশব্দে বসে আছে ওরা তিনজন, জাহেদ, মালু আর রাবু।

উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ আছে? এ সব তো এ্যাদ্দিনে গা-সওয়া হয়ে যাওয়া উচিত তোমার। প্রচুর খাটুনি গেল এতটা দিন। একটু যদি না ঘুমাও শরীর খারাপ করবে। যাও। অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল জাহেদ।

রাবু শুনল। বললনা কিছু। বসে রইল আরও অনেকক্ষণ। এক সময় উঠে চলে গেল ঘরের ভেতর।

মালু আর জাহেদ, বালিশে মাথা রেখে শরীরটাকে বিছানার কোলে এলিয়ে দিল ওরা। কিন্তু চোখে ঘুম নেই। ঘুম বোধ হয় আসবেনা আজ।

হয়ত ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা লেগেছিল ওদের চোখে। সেকান্দরের ঝাঁকুনি খেয়ে ধড় ফড়িয়ে উঠে বসল ওরা।

এই ওঠো। রাবুর বোধ হয় জ্বর এসেছে। বড় কোঁকাচ্ছে ও। বলল সেকান্দর।

যাওনা ভেতরে, দেখ। আমি আসছি মুখ ধুয়ে। সেকান্দর চলে গেল পুকুর ঘাটের দিকে।

গায়ে হাত রেখে চমকে উঠলো ওরা। এখন কোঁকাচ্ছে না রাবু। অচেতন পড়ে আছে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গাটা।

রাবু। কপালে হাত রেখে ডাকল জাহেদ।
সাড়া পেলনা।
আশঙ্কার কালো ছায়া পড়ল জাহেদের মুখে। কপালে ফুটল উদ্বেগের রেখা।
ভয় নেই টীকা নিয়েছে সেই মড়কের শুরুতেই। বুঝি নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্যই বলল জাহেদ, মালুর জিজ্ঞাসা আকুল চোখের দিকে তাকিয়ে।
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? একটা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর আর মনের তন্ত্রীগুলোকে যেন সজাগ করলো জাহেদ। ঘর থেকে সাইকেলটা বের করে চড়ে বসল।
কোথায় যাও মেজো ভাই। সাইকেলের হাতলটা ধরে নিয়ে শুধাল মালু।
তালতলি। সরকারী ডাক্তারকে নিয়ে আসি। এক্ষুনি আসছি আমি।
তুমি বস গিয়ে রাবু আপার কাছে। আমি যাই। জাহেদের হাত থেকে সাইকেলটা এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে প্যাডেলে পা রাখল মালু।
ডাক্তার এল। দেখল। গম্ভীর মুখে বলল, পক্সের আলামত।
কি বলছেন? ভুলও তো হতে পারে ডাক্তারের, তাই শুধালো জাহেদ।
কোন সন্দেহ নেই। জোর দিয়েই বলল ডাক্তার।
সেকান্দর দৌড়েছিল শহরের দিকে। জোহর নাগাদ শহরের এম. বি কে নিয়ে সেও পৌঁছে গেল।
সাবেক রায়টাই বহাল রাখল এম. বি ডাক্তার। বলল: প্রধান ওষুধ নার্সিং। ভাল নার্সিং চাই।
সে তো বটেই। হুরমতি আর ওরা তিন জন, সবাই হাত লাগাল।
চারিদিকের জানালাগুলো খুলে দিল। ঝেড়ে মুছে নতুন চাদরে নতুন পর্দায় ঝকঝকে করে ফেলল রাবুর ঘরটি। সারা বাড়িতে ছিটিয়ে দিল বীজাণুনাশক দাওয়াই। কিছু ফুল নিয়ে এল জাহেদ। রক্তজবা আর মরসুম শেষের যুঁই। রাবুর মাথার দু'পাশে দুটো তেপয়ে কিছু গুছিয়ে, কিছু ছড়িয়ে রাখল ফুলগুলো।
মৃদু মিষ্টি যুঁই সুবাসে বুঝি অচেতন ঘোরটি কেটে যায় রাবুর। ও চোখ মেলল। রক্তজবার মতোই টকটকে লাল। ঘরের চারদিকে বুলিয়ে আনল চোখ জোড়া। যেন খুসির সাথে অবাক হল। বলল! বাহ্। কেমন সুন্দর সাজিয়েছ! কেন গো? কেন এত সাজ?
অনির্দ্দিষ্ট চোখের আরক্ত দৃষ্টিটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ হল, স্থির হল জাহেদের চোখের

উপর। ওর কাছেই যেন জানতে চাইছে রাবু। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল তেপয়টার দিকে। তুলে নিল এক মুঠো যুঁই। কম্পিত মুঠোর আঙুল গলে ছড়িয়ে পড়ল ফুলগুলো। হীরের ছোট ছোট নাক ফুলের মতো ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল ওর বুকে মুখে বালিশে।

লক্ষ্য করল জাহেদ, গভীর লালের ছোপ লেগেছে রাবুর হাতে গালে আর গলায়। রক্তবর্ণ চোখগুলোর চেয়েও লাল সেই অমসৃণ ফোলা ফোলা দাগগুলো। আর ওর দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক চঞ্চল। স্থির থাকছেনা কোথাও। দুহাতে সুমুখের চেয়ারের হাতলটা ধরল জাহেদ। বসে পড়ল। ওর সমস্ত শক্তি কে যেন নিঃশেষে টেনে নিয়েছে।

মালু ভাই। শোন্। এদিকে আয়। এত কম ফুল হলে তো চলবে না! আমার বিয়েতে আরো বেশি ফুল চাই। হ্যাঁ, এমনি লাল আর সাদা। অন্য রঙ ভাল লাগেনা আমার! কিন্তু বেশি চাই। অনেক বেশি। বিছানা হবে ফুলের। মেঝে হবে ফুলে ছাওয়া। দেয়াল হবে ফুলের। ছাদে থাকবে ফুলের ঝালর। তবে তো ফুলশয্যা? পারবি তো, আমার মনের মতো করে সাজাতে?

প্রলাপ বকছে রাবু। চার জোড়া চোখ অনিমিখ চেয়ে থাকে ওর দিকে।

ওকি? কাছে আয়। নিরুত্তর দেখে মালুকে আবার ডাকল রাবু।

কাছে এল মালু। হাতের আলিঙ্গনে ওর মুখটা টেনে নিল রাবু। আস্তে করে শুধাল, মেজো ভাইয়ের খোঁজ পেলি?

দু টুকরো জ্বলন্ত লোহার মতো চোখ দুটা চেয়ে রইল মালুর দিকে। আচমকা ঠেলে দিল ওকে। কর্কশ গলার ধিক্কারে চেঁচিয়ে উঠল: পাসনি খোঁজ? অপদার্থ। অপদার্থ তুই। পারলিনা একটা লোককে খুঁজে বের করতে? ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রাবু। জবা-টকটক চোখের লাল ভেঙে পানির ঢল নাবল।

বুঝি কিছু বলতে চাইল জাহেদ। চাইল দুহাতের তালুতে রাবুর মুখখানা তুলে নিতে। চোখে চোখ মিলিয়ে চেয়ে থাকতে। তবু কি রাবু চিনতে পারবে না ওকে?

কিন্তু রাবুর কান্নাটা কেড়ে নিল ওর কণ্ঠ। রাবুর বিস্মৃতিটা নির্মম এক পরিহাসের মতোই বিঁধল ওর বুকে। স্থাণুর মতো বসে রইল ও।

হ্যাঁ, পেয়েছি। স্মরণের আলোকে ওকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যেই বলল মালু।

সত্যি? উৎসুক হাসিতে উদ্ভাসিত হল রাবু। ভ্রু জোড়া যেন নেচে উঠল। চোখের মণিতে বুঝি ফিরে এল স্বাভাবিক দীপ্তি। মালুর কানের কাছে মুখ এনে বলল ও: বলেছিস? বলেছিস আমার কথা? আমি যে খুঁজছি ওকে, চেয়ে আছি ওর পথের পানে? এ সব বলেছিস তো ওকে?
নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল জাহেদ।

যতক্ষণ বা যতদিন না রাবু নিরাময় হচ্ছে তদ্দিন শহরের ডাক্তারটি থেকে যাবে, এই ঠিক হল।
একদা যে ঘরটিতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পড়ত ওরা সে ঘরটিই খুলে দিল মালু। বিছানা পেতে দিল ডাক্তারের জন্য। টেবিলটা সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ অতীতটার সাথে দেখা হয়ে গেল মালুর। দেরাজের ভেতর বালাশিক্ষা, ধারাপাত। নাম লেখা—আবদুল মালেক। বড় বড় বাঁকা তেড়া হস্তাক্ষর, এখনো পড়া যায়। আরো বই, গণিতের, পদ্যের, মালু রাবু আর আরিফার নাম লেখা।
অতীত বিরোধী মন মালুর। পদে পদে অতীতের শৃঙ্খল ভেঙ্গে, অতীতটাকে অস্বীকার করে চলতে হয়েছে ওকে, অথচ অতীত ওকে বার বার টেনে নেয় নিজের দিকে। অতীতের স্মৃতি আর মানুষগুলোকে জীবনের বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি সে। আজও কি এক যাদুর মায়ার মতো অতীত যেন হাতছানি দিয়ে গেল ওকে।
হাঁ। সুন্দর ছিল সেই উদাম দিন গুলো। এত মৃত্যু ছিল না।
এক কাপ চা খাওয়াতে পারিবেন?
হঠাৎ ডাক্তারের কথায় অতীত থেকে উঠে এল মালু। বলল: হ্যাঁ। নিশ্চয়।
হ্যাঁ তো বলল। কিন্তু কোথায় চা, কোথায় চিনি। কোথায় উনুন। দুপুরে তো খাবারই প্রবৃত্তি ছিলনা, মালুর, না জাহেদের। দুরমতির খেয়াল নেই কোন দিকে। পানি আনছে মিছরি ভাঙছে সরবত তৈরী করছে রুগীর জন্য। বাকী সময়টা বসে থাকছে রাবুর পাশে। পাক ঘরে উনুন জ্বলেনি আজ। কিন্তু সেকান্দর মাষ্টার শহর থেকে ফিরে এসেই উনুন ধরিয়েছিল। বার্লি করেছিল রাবুর জন্য। ফুটিয়ে নিয়েছিল চারটে আলুভাত। তারপর জাহেদকে সুমুখে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠেছিল: বুদ্ধি সুদ্ধি লোপাট

পেয়েছে নাকি ? মেয়েটার তো আল্লায় জানে কি হবে। নিজেও কি অসুখ বাধাবে ? যাও ছুটো খেয়ে আস।

বড় দালানের পেছনে ভেতর বাড়ির উঠোন। উঠোনের পর রসুই ঘর। রসুই ঘরে পৌঁছে মালু দেখল তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেছে। চাল ডাল ছিঁটিয়ে হাড়িপাতিল লণ্ডভণ্ড করে অগ্নিমূর্তিতে দাঁড়িয়ে দরবেশ। চা নেই। নাশতা নেই। ক্ষিধেয় প্রাণ যায়। এ বাড়িতে মানুষ থাকে ? চেঁচিয়ে চলেছে উত্তেজিত দরবেশ।

উনুনের সুমুখে বসে চামচ দিয়ে বার্লি নাড়ছে হুরমতি। পাশে দাঁড়িয়ে সেকান্দর। মুখ না ঘুরিয়েই বলল সেকান্দর, কেন রাগছেন দরবেশ চাচা ? কে আপনাকে চা করে দেবে ? দেখছেন না গোটা বাকুলিয়া আজ বিরানা। বসন্তের ভয়ে দাসি চাকর সব পালিয়েছে। কেউ নেই বাড়িতে। হুরমতি রাবুকে নিয়ে ব্যস্ত। দেখছেন না ?

পালাবেই তো। আল্লা নেই খোদা নেই, যতসব মনহুসের আড্ডা, এ বাড়িতে মানুষ থাকবে কেমন করে ? খোদার কহর পড়বে এ বাড়িতে, আমি বলিনি ? আমি বলিনি বিরানা হবে, ছারে খারে যাবে এ বাড়ি ?

দরবেশ চাচা! অভিসম্পাতের গলাটা অন্তত: আজকের দিনের জন্য থামাবেন ? বাড়িতে অসুখ, দেখতে পাচ্ছেন না ? অনুনয়ের স্বরেই বলল সেকান্দর। তারপর হুরমতির হাত থেকে বার্লিটা নিয়ে ঢালল বাটিতে। ঠাণ্ডা করার জন্য বাটিটা বসিয়ে দিল গামলা ভর্তি পানির উপর। চামচ দিয়ে নেড়ে চলল ঘন ঘন।

অসুখ না ভড়ং। ওই মেয়েকে চিনিনা আমি ? কম ভড়ং ছিল নাকি ওর মার ? ফ্যাঁস ফ্যাঁস কান্না, এই বেহুঁশ, এই বিলাপ। এই কথা বন্ধ। দরজা বন্ধ। সেই মায়ের মেয়ে তো ? করতে চায়না স্বামীর ঘর, যেতে চায় না শ্বশুর বাড়ি, তাই ভড়ং ধরেছে। আমি বুঝিনা ওসব ? কিন্তু, ও সব শয়তানী ভড়ং ছুটিয়ে দেবার দাওয়াইটাও আমার জানা আছে। কথার সাথে সাথে দরবেশের মুখের থুথুগুলোও ছিঁটিয়ে পড়ে চারিদিকে।

দপ করে জ্বলে উঠল সেকান্দর। চুপ করবেন দরবেশ চাচা ? ক্ষিধে পায় তালতলি চলে যান। সেখানে রমজানের বাড়িতে আজ মোল্লা খাওয়াচ্ছে। এ বাড়িতে ভাত চা কোন কিছুই মিলবেনা আজ।

অদ্ভুতই বটে, সেকান্দর মাষ্টারকে ভয় করে দরবেশ। ওর ঝামটা খেয়ে চুপ করে যায়। গুটি সুঁটি বসে পড়ে একটা জল চৌকির উপর।

বার্লির বাটিটা নিয়ে বেরিয়ে যায় সেকান্দর।

যাকে ঘৃণা করা যায় বেশী তার উপরও বুঝি মায়া হয়। কেমন মায়া হল মালুর। সারাদিন পেটে কিছুই পড়েনি। সন্ধ্যার দিকে খেয়েছে চারটে আলু ভাত। এখন রাত। ক্ষিধে তো পাবেই। বলল মালু: আপনি ঘরে যান দরবেশ চাচা। আমি চা করে আনছি।

ডাক্তার আর দরবেশকে চা খাইয়ে ভাত আর ডালের পানি চড়িয়ে দিল মালু। পানিটা ফুটলে চালের সাথে কয়েকটা আলুও ছেড়ে দিল মালু। আর অতিথি ডাক্তারের জন্য একটা আণ্ডা। হুরমতি শুধু একবার দেখে গেল। কিছু বলল না। একটা লাকড়িও এগিয়ে দিলনা মালুর দিকে।

চুলোর ভেতরে আমের শুকনো লাকড়ি কেমন ফড় ফড় কাপড় ফাটার আওয়াজ তুলে জ্বলছে। লাল ছুরির মতো লিকলিকে শিখাগুলো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে উনুনের অবরোধ ভেঙ্গে। রসুই ঘরের দেয়ালে সে শিখার ছায়া পড়ছে। উজ্জ্বল হচ্ছে ঘরটা। বড় আর লম্বা হচ্ছে ছায়ারা। তারপর কেঁপে কেঁপে আবার কোন আবছা অন্ধকারের অস্পষ্টতায় মিলিয়ে যাচ্ছে ছায়াগুলো। একটা দীর্ঘ শিখার কম্পিত প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল মালু।

ক্ষীণ কোন আশার মতো একটি সন্দেহ বুঝি ছিল জাহেদের মনে। হয়ত স্বাভাবিক জ্বর। অতি খাটুনি আর অল্প ঘুমে দুর্বল হয়েছিল শরীরটা। তাই এমন কাবু করেছে জ্বরে।

কিন্তু, দ্বিতীয় দিনে আর কোন সন্দেহই রইল না। বসন্তের গুটি বেরিয়েছে রাবুর গা ফুঁড়ে।

ডাক্তাররা হার মানল না। আশা ছাড়ল না আপন মানুষ। আরো ডাক্তার এল। ঢাকা থেকে এল নামি ডাক্তার। লড়াই চলল মৃত্যু আর জীবনে। যন্ত্রের মতো নিষ্প্রাণ নির্জীব হয়ে রইল জাহেদ। যন্ত্রের মতোই হাঁটে, বসে, রাবুকে ওষুধ খাওয়ায়, রাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

কেন এমন ভেঙ্গে পড়ছ মেজো ভাই। আমি বলছি সেরে উঠবে রাবু আপা। সান্ত্বনা দেয় মালু।

মালুর স্বান্তনার খোঁচায় সংযমের কৃত্রিম বাঁধটা বুঝি ভেঙ্গে যায়। ডুকরে কেঁদে উঠে জাহেদ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে যে সান্ত্বনা দিল, সেবা দিল এ্যাদ্দিন, তাকেও কবরে রেখে আসতে হবে? অসম্ভব। অসম্ভব। শিশুর মতো কাঁদে আর চীৎকার করে জাহেদ।

আরো দুটো দিন কেটে যায় উদ্বেগ আশঙ্কায়।

দেখেছ? এমন বেদিল অমানুষিকতা দেখেছ কখনো?

উত্তেজিত সেকান্দর। হাজার গণ্ডা আজরাইলের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বুঝি ওর উত্তেজনার শেষ হবেনা। সারাক্ষণ চটে আছে ও। সারাক্ষণ একটা না একটা বিক্ষোভের উপলক্ষ্য সৃষ্টি হচ্ছে ওর জন্যে। এই মুহূর্তে উত্তেজনার ইন্ধন যুগিয়েছে দরবেশ।

দরবেশের অপরাধ ভাত চেয়েছে। সময় মাফিক ভাত না পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করেছে আর হুরমতিকে কাঠের চেলা ছুঁড়ে মেরেছে।

দিনরাত খালি খাই খাই···এদিকে মেয়েটা মরছে। দেখতে এল একবার? জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলনা কেমন আছে মেয়েটি। মানুষ তো নয় শীমার, জানোয়ার।

জাহেদকে নির্বাক দেখে বুঝি বেড়ে যায় সেকান্দরের রাগের মাত্রাটা।

সারা রাত জেগেছে জাহেদ। ভোরে মালু আর হুরমতিকে রাবুর ঘরে বসিয়ে সকাল ধরেই একটু ঘুমের চেষ্টা করছে। ঘুম নেই। চোখ দুটো টনটন করছে। মাথার ভেতরে কি যেন টগবগিয়ে ফুটছে সারাক্ষণ। মাথাটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারলেই হয়ত একটু আরাম পেত।

দোহাই তোমার, সেকান্দর, একটু চুপ কর। দু আঙুলে কপালের রগ দুটো টিপে ধরে বলল জাহেদ।

মেজো ভাই, রাবু আপা ডাকছে। ভেসে এল মালুর গলা।

চমকে উঠল জাহেদ, সেকান্দর। বাকুলিয়ার ঘরে ঘরে যে দৃশ্য দেখেছে ওরা রাবুর ঘরে গিয়েও কি তাই দেখবে?

না, ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার বলছেন, বিপদ পেরিয়ে গেছে, এখন সেরে উঠবে। ওদের আশ্বস্ত করল মালু। তারপর বলল জাহেদের দিকে তাকিয়ে, তোমাকে ডেকেছে দুবার।

ওরা এল রাবুর ঘরে।

জাহেদ দেখল ভোরে যেমন রেখে গেছিল তেমনি শুয়ে আছে রাবু। শুধু রাতভর বুজে থাকা চোখগুলো এখন খোলা। সে চোখে সহজ দৃষ্টি, একটি ক্লান্ত শান্তি।

হাতের ইশারায় ওকে কাছে ডাকল রাবু।

রাবুর পাশে গিয়ে বসল জাহেদ।

পুরো গাল হাসল সেকান্দর। বলল, এই তো; আর কি, কালই হেঁটে চলে ঘুরে বেড়াবে। ব্যস।

এবার বাকুলিয়ায় এসে এই প্রথম সেকান্দর মাষ্টারকে পুরো এক গাল হাসতে দেখল মালু।
চোখের সেই টনটনে ব্যথাটা কখন সেরে গেছে। মাথার ভেতর টগ-বগিয়ে ফোটা সেই আগুনটা কখন নিভে গেছে। সমস্ত স্নায়ুতে অদ্ভুত এক শান্তি। জাহেদের মনে হল ওর মৃত্যু হয়েছিল। এইমাত্র বেঁচে উঠল ও।

রাবু সেরে উঠেছে।
একটু একটু করে উঠোনে, দহলিজে হেঁটে বেড়ায় ও। মক্তব আর স্কুলের শূন্য দালানে গিয়ে বসে।
বাব্বাঃ, কী যে ভাবিয়ে তুলেছিলে, কী যে হত, হাসতে হাসতে বলল মালু।
কি আবার হত? এত লোক মরেছে, আর একজন মরত? ম্লান হেসে বলল রাবু।
সে তো দর্শনের কথা হল……
মালুর কথাটা শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠেছে জাহেদ, থাম তো মালু। কেন বার বার খালি মৃত্যুর কথা বলছিস?
একটা বই পড়েছিল জাহেদ। বইটা বন্ধ করে ওদের পাশে এসে বসল। কেউ যদি বই বন্ধ করে জীবনের কথা শোনায় আমাদের, আমরা কি আপত্তি করব? কৌতুক নেচে গেল রাবুর চোখে।
মোটেই না। মোটেই না। উচ্চঃস্বরে সায় দিল মালু।
ওরা তিনজনে গলা মিলিয়ে হাসল, যে হাসি মৃত্যুকে অস্বীকার করে।
তারপর ওরা শুরু করল জীবনের গল্প, মানুষের গল্প ·হ্যাঁ, তখন সমাজে শ্রেণী বিভাগ আসেনি। দলবদ্ধভাবে শিকার করত, যা পেত একসাথে ভাগ করে খেত আদিম মানুষ···দলপতি ছিল একান্তভাবে আজকের নির্বাচিত প্রতিনিধির মত···। এলো গোষ্ঠিপ্রথা···গভীর মনযোগে ওরা সবাই শুনছে জাহেদের কথা।
ওরা লক্ষ্য করেনি লেকু আর ফজর আলী কখন এসে বসেছে দাওয়ায়। ফজর আলীর সাথে ·ওর বিশ বছরের জোয়ান ছেলেটাও। আজই যেন প্রথম ওকে লক্ষ্য করল মালু।
কি খবর লেকু? শুধাল জাহেদ।

খবর ভালই। বুড়ো কারি সাহেব ফিরে এসেছেন। চৌকিদার বাড়ি, সারেঙ বাড়ি, ভুঁইঞা বাড়ির সবাই ফিরে এসেছে।
ছেলে মেয়েগুলো? ওরা ফিরে এসেছে? বুঝি স্কুলের কথাই ভাবছে রাবু। তাই ওর ছাত্র ছাত্রীদের কথাই শুধাল রাবু।
জী হাঁ। ফজর আলীর ছেলেটাই জবাব দিল।
শালা শুয়রের বাচ্চা বেইমান নাফরমান বেজন্মা বদমাইশ হারামখোর সুদখোর……
বচনগুলো কানে এল আর ওরা চুপ করে গেল।
দাওয়ায় উঠে বগলের ছাতাটাকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারল সেকান্দর। বিড় বিড়িয়ে চলল, হারামখোর বদমাইশের দল, দেশটাকে লুটেপুটে খেল।
কি হল মাষ্টার? শুধাল লেকু।
হবে আবার কি? যা সব সময় হচ্ছে তাই? দেখছিসনা চোখে? মুখ খিঁচিয়ে লেকুর দিকেই কট মট করে তাকিয়ে রইল সেকান্দর। যেন সব দোষ লেকুর।
আহা, ব-ল-ই না, কী হয়েছে, এবার শুধাল জাহেদ।
যা সব সময় হচ্ছে তাই, বলল সেকান্দর। তালতলির হিন্দুরা চলে যাবার পর ছাত্রের অভাব, শিক্ষকের অভাব, অর্থের অভাব, এত অভাবের মুখে বন্ধই হয়ে যেতে ইস্কুলটা, যেমন বন্ধ হয়েছে উদরাজপুর আর চাটখিলের স্কুল। বন্ধ হতে দেয়নি সেকান্দর মাষ্টার। কয়েকজন ভাল মাষ্টার, ওদের দেশত্যাগ করতে দেয়নি সেকান্দর, পায়ে ধরে রেখে দিয়েছে। এদিক ওদিক থেকে রীতিমত পায়ে ধরে ধরে ছাত্র এনেছে, জাগীরের ব্যবস্থা করেছে সেকান্দর। তবেনা আজ আবার গমগম করছে তালতলির স্কুল। আশপাশের পনের বিশ গ্রামের ছেলেরা এখানেই তো পড়তে আসে। ছাত্রসংখ্যা এখন চার শো। কম কথা? এই চারশোর মাঝে তিনশোই মুসলমান, সবই কৃষকের ছেলে। কম কথা? ভেবে দেখ তো দশ বছর আগের কথা? কটা মুসলমান ছাত্র ছিল তালতলি স্কুলে?
সে তো জানি। কিন্তু এখন তুমি চটেছ কেন? ওকে বাধা দিয়ে শুধাল জাহেদ।
চটবনা? ওই ওই শালা শুয়োর খোর হারাম খোর…
ও? রমজানের উপর চটেছ? সকৌতুকে হাসল জাহেদ।
যখন চলছিলনা স্কুলটা, ওই বদমাইশটা এক পয়সা সাহায্য দিয়েছে? উল্টো

জালিয়েছে সবাইকে। যেমনি জমে উঠল স্কুলটা অমনি জেঁকে বসলেন কাজি মোহাম্মদ রমজান। সেক্রেটারী হল, প্রেসিডেন্ট হল, কতকিছু হল। মাতব্বরির তার শেষ নেই। কি আর করি। সবই সয়ে গেলাম। কত শালার লাথিই তো খেলাম জীবন ভর। থামল সেকান্দর। পকেট থেকে বের করে বিড়ি ধরাল। বিড়ির প্যাকটটা বাড়িয়ে দিল লেকুর দিকে।

তারপর? চুম্বক কথাটা কখনও সরাসরি বলেনা সেকান্দর। সেটা শোনার জন্যই অধৈর্য জাহেদ।

তারপর আর কি! শালা বলে স্কুলের নাম বদলাও, নইলে টাকা দেবনা। সরকারী গ্র্যান্ট বন্ধ করাব।

কেন? কেন বদলাবে? কি নাম দিতে চায় ও? এবার উত্তেজিত হয়েছে জাহেদ।

শ্যামাচরণ দত্ত হাই স্কুলের নাম পাল্টে নাম হতে হবে কাজী মোহাম্মদ রমজান হাই স্কুল। নইলে টাকা বন্ধ, গ্রান্ট বন্ধ। কথাটা শেষ করে বিড়িতে ফোঁক ফোঁক দুটো টান মারল সেকান্দর। বলল আবার, এবার বুঝলে? তুমি কি বললে? শুধাল সেকান্দর।

বলেছি, অসম্ভব। সেই প্রথম যে স্কুলটা গড়ল তার নাম বদলান চলবেনা। সে কী রাগ রমজানের! পারলে আস্ত খেয়ে ফেলে আমাকে।

শেষে দম টেনে বিড়ির গোড়াটা ফেলতে গিয়ে বুঝি রাবুর দিকে চোখ পড়ল সেকান্দরের। বলল, এই দেখ, স্রেফ ভুলে বসে আছি। বহুদিন পর তালতলির বাজারে একটা কোরাল মাছ পেলাম। ভাল করে রান্না করতো। একটু মজা করে খাওয়া যাক।

মাছ ভর্তি চটের লম্বা থলেটা চেয়ারের হাতলে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেকান্দর। থলেটা রাবুর হাতে এগিয়ে দিল। বলল আবার, নদীর মাছ নদীতেই থাকে, নদীতেই মরে। ধরবে কে? সব জেলেগুলোই তো দেশছাড়া করেছে শুয়েরের বাচ্চা রমজান।

রাবুর তদারকিতে মাছটা রান্না করল হরমতি। সবাই এক সাথে বসে খেল। তারপর সেই দাওয়ায় বসেই গল্প জুড়ল।

গল্পের ওদের শেষ নেই। তালতলির গল্প, বাকুলিয়ার গল্প, যুদ্ধের গল্প, দুর্ভিক্ষের গল্প, দাঙ্গার গল্প, ইংরেজ চলে যাবার গল্প, রমজানের মত এই দেশটাকে যারা ভোজবাজি দেখাল তাদের গল্প, ভিটে হারাদের গল্প—সব মিলিয়ে ওদের নিজেদের গল্প। ওদের এক একটি জীবন অসংখ্য কাহিনী। সে কাহিনীর

সবটুকু কেউ জানেনা। মালু জানেনা, লেকু আর হুরমতি কেন আর কেমন করে দূর দেশে পাড়ি দিয়েছিল, কখন আর কেনই বা ফিরে এসেছে বাকুলিয়ায়। ওই ফজর আলী। এত লোক এত কিছু করছে, এত দিকে ছুটছে। কিন্তু ফজর আলী কেন মাটি কামড়ে পড়ে আছে? মালু জানেনা। রেহানী জমিগুলো কি উদ্ধার করতে পেরেছে লেকু? বাপের কাছ থেকে পাওয়া জাম কাঠের চৌকিতে শুয়ে আজও কি স্বপ্ন দেখে ও? মালু জানেনা। রোদ বৃষ্টি ঝড় তুফান মাথায় নিয়ে গোটা তল্লাট জুড়ে বটবৃক্ষের মত যে দাঁড়িয়ে আছে সেকান্দর মাষ্টার, তার কথাগুলো কি সব শোনা হয়েছে? হয়ত প্রয়োজন নেই সব কথা শোনার। কেননা একই প্রাণের সূত্রে গাথা ওদের জীবন। ওদের স্বপ্ন ওদের আশা-ভঙ্গ, ওদের অটুট নিষ্ঠা। সব মিলিয়ে ওরা চলমান মানুষ। কোথাও থমকে দাঁড়ায়নি ওরা।

গল্পে গল্পে রাত গড়িয়ে যায়। এক সময় লেকু আর ফজর আলীরা চলে যায়।

উঠি উঠি করেও যাওয়া হয়না সেকান্দরের। এত রাতে করবে কি বাড়ি গিয়ে? ঘুমুতে হলে এখানেই তো পাতা রয়েছে তোমার বিছানা। হাতটা ধরে ওকে বসিয়ে দেয় জাহেদ।

রাস্থ আসছে কাল দুপুরে। কে নাকি খবর দিয়েছে ওকে, খেটে খেটে শরীর বলে কোন কিছু আর অবশিষ্ট নেই সেকান্দরের। তাই রাস্থ এত্তেলা দিয়েছে দুমাস থাকবে বাকুলিয়ায়। বলতে বলতে বুঝি সেই উদ্বিগ্না বোনটির উদ্দেশ্যে স্নেহ ঝরিয়ে হাসে সেকান্দর।

তুই এখনও বসে আছিস রাবু? আবার অসুখ বাধাবি। যা না ঘরে। এই নিয়ে তিনবার তাম্বি দিল জাহেদ।

সেই তখন থেকেই মাথায় ঘোমটা টেনে বসে ওদের গল্প শুনছে রাবু। লেকু, ফজর আলীরা যাবার পর ঘোমটাটা ফেলে দিয়েছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে পা জোড়া ছড়িয়ে দিয়েছে সুমুখে।

আমরা না উঠলে সেও উঠবেনা। দাঁড়িয়ে পড়ল সেকান্দর।

না না মাষ্টারজী। আপনারা গল্প করুন। ঘরে চলে গেল রাবু।

থমথমে জমাট বাঁধা অন্ধকার। আকাশের তারারাও আজ হারিয়ে গেছে অন্ধকারের আড়ালে। বিছানায় গা এলিয়েই নাক ডাকছে সেকান্দর। জেগে আছে জাহেদ আর মালু।

আশ্চর্য। এমন সময় রিহানার কথাটা মনে পড়ল? অপমান, ধিক্কার,

লজ্জা। আর সেই সাথে কি এক যন্ত্রণা। অন্ধকারেই মুখ ঢাকল মালু।বস ক্ষতই শুকিয়ে যায়। বিছানার ক্ষতটাও শুকিয়ে যাবে, এখনও শুকায়নি, মনে মনে ভাবল মালু।

আরও আশ্চর্য! জাহেদ জেনেছে সবই। কেমন করে, কার কাছ থেকে সে প্রশ্ন অবান্তর।

সরাসরি কিছু বলল না জাহেদ। বলল ইঙ্গিতে। জানিস মালু? এক ধারায় নয়, বহু ধারায় প্রবাহিত মানুষের জীবন। যদি শুকিয়ে যায়, যদি রুদ্ধ হয় একটি ধারা আর এক ধারায় জীবন বয়ে চলে সার্থকতার গানে। এটাই জীবনের ধর্ম: সহস্র ধারায় জীবনের বিকাশ, অজস্র পথে তার পূর্ণতা।

গভীর এক প্রত্যয়ের আহ্বান হয়ে কথাগুলো বাজে মালুর কানে।

অন্ধকারে দেখা যায়না জাহেদের মুখটা। তবু সেদিকে চোখ ফেরাল মালু। বলল, আমি জানি মেজো ভাই। সে জীবনবোধ তো তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি।

অন্ধকার এলোমেলো করে আবারও বাতাস বইল। নিথর মৌনতা ভেঙ্গে সচকিত হল গাছের পাতারা।

ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

মালুর মনে হল ঘুমিয়েও বুঝি জেগে রয়েছে ও। ওর চোখের সুমুখে হেঁটে চলেছে ওর জীবনটা। ঘাসে ঢাকা আলের পথ, কর্দমাক্ত কোন গ্রামের রাস্তা। ঘাস মাড়িয়ে, কাদা ভেঙ্গে মালু উঠে এসেছে উঁচু সড়কের শক্ত মাটিতে। প্রশস্ত উঁচু সড়ক। সেখানে চেনা অচেনা কত মানুষ। রাবু জাহেদ, সেকান্দর মাষ্টার আরও অনেকে যাদের কাউকে চেনেনা মালু, কাউকে বা চিনেও চিনতে পারছেনা মালু। ওরা চলেছে। ওদের চলার যেন শেষ নেই।

অন্ধকার ছিল। অন্ধকারের বুক চিরে কখন তারার আলো চোখ মেলেছে। তারপর তারার উজ্জ্বল চোখগুলো এক সময় নিষ্প্রভ হল। সূর্য উঠল। স্নিগ্ধ-ঔজ্জ্বল্যে নিরূপম ভোরের সূর্য।

বুঝি রোদের ছোঁয়ায় আল্গা হল মালুর চোখের পাতা। চোখ মেলে ও দেখল ঘন ঘন সিগারেট টানছে জাহেদ আর অবিরাম ধোঁয়া ছাড়ছে। কানে এল সেকান্দরের গলা, পরমাত্মীয় কিনা? তাই তোমার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে এসেছে। যাও একবার স্বাস্থ্যটা দেখিয়ে এস।

উত্তরে সিগারেটে আরও ঘন ঘন কয়েকটা টান মারল জাহেদ। কুণ্ডলী

পাকান ধোঁয়ার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বিরক্তি ভরে ছুঁড়ে মারল আধপোড়া সিগারেটটা।

কোন্ পরমাত্মীয়, কোত্থেকে কেনই বা এসেছে তারা, কিছুই বুঝলনা মালু। শুধু দেখল সেকান্দর আর জাহেদ, ওদের দুজনের মুখই অস্বাভাবিক-গম্ভীর। চোখময় অমঙ্গলের ছায়া।

কাছারির দিকে উঠে গেল ওরা। মালুও এল পিছু পিছু।

ও, আপনিই জাহেদ সাহেব? সেলামাইলাইকুম। দারোগারা একে একে হাত মিলাল জাহেদের সাথে।

মশাই কম ভুগিয়েছেন আপনি? দিনের পর দিন সারা দেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছি আপনাকে। আর আপনি কিনা স্বগ্রামে স্বগৃহে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন? সত্যি জাহেদ সাহেব, দারুণ বোকা বানালেন আমাদের। প্যান্ট কোট পরা এক তরুণ কিছু হাসি, কিছু অবজ্ঞা মিশিয়ে বলল।

বোকা আমিও কম হলামনা, স্বগতোক্তির মত বলল জাহেদ।

এখন চলুন তো, বলল আর একজন।

না না এক্ষুনি নয়। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আপনি যখন রেডি হবেন তখুনি যাব আমরা। তরুণকে পাশে সরিয়ে আর এক প্রৌঢ় অফিসার বললেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই হাসলেন।

দেরী করে লাভ নেই। অযথা পুড়তে হবে রোদে। আপনারা বসুন। পাঁচ মিনিটে রেডি হচ্ছি আমি।

ওরা ফিরে এল ভেতর বাড়ি।

ঘুম থেকে সবার আগেই উঠেছিল রাবু। সবার আগেই বুঝতে পেরেছিল ও। ওই জাগিয়েছিল সেকান্দরকে।

নিঃশব্দে সুটকেসটা গোছাচ্ছে রাবু। পায়জামা লুঙ্গি সার্ট প্যান্ট তোয়ালে। সেভিং সেট কাঁচি আয়না সাবান।

মশারী টুথ পেষ্ট, টুথব্রাস। দিয়েছিস তো? পাঞ্জাবিটা পরতে পরতে শুধাল জাহেদ। কাছে এল। কাঁধে হাত রাখল রাবুর।

ছিঃ তুই কাঁদছিস?

কই না তো? কাঁদছি কোথায়? সুটকেসের ডালার আড়ালে মুখ লুকাল রাবু। ব্যস্ততার ভানে গোছান জিনিসগুলোকে আবার অগোছাল করল।

জোর করেই রাবুর মুখটা হাতের কোষে তুলে নিল জাহেদ। বলল, তোর চোখে আমি আর অশ্রু দেখতে চাইনা, রাবু। কাঁদবিনা। কথা দে?

দিলাম।

সেকু, ফজর আলী, ট্যাণ্ডল বৌ, ভুঁইঞা বাড়ি আর মুধাবাড়ির যারা ফিরে এসেছে গ্রামে তারা, ওরা সবাই এল। বড় খাল অবধি এগিয়ে দিল জাহেদকে।

বড়দারোগা গেছিলেন কাজি বাড়ি 'পদধূলি' দিতে। 'পদধূলি' দিয়ে এবং নাস্তা খেয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। কিন্তু জীপটা আসেনি। যন্ত্র বিকল। রমজানের জীপ বা গাড়িতে চড়বেনা জাহেদ। অতএব বড় দারোগার গোমড়া মুখ অগ্রাহ্য করেই সাম্পানে যাওয়াই সাব্যস্ত হয়েছে।

দোহাই তোমার, রাবু আপা। প্রসন্ন মুখে বিদায় দাও মেজো ভাইকে। কিন্তু রাবুর কানে বুঝি পৌঁছুলনা কথাগুলো। সুমুখে দত্তদীঘির তালসারি। তালসারির মাথায় আকাশের দিগন্ত। সে দিকেই চেয়ে রয়েছে রাবু।

রাবু আপা। দোহাই তোমার, একটু হাস। আবারও বলল মালু।

ততক্ষণে সাম্পানে উঠেছে জাহেদ। সাম্পানে দাঁড়িয়ে হাসছে আর বলছে, মাষ্টার, আবার আসব আমি।

হ্যাঁ হ্যাঁ এস। আজ থেকে রাবুর স্কুলে আমি জয়েন করলাম। বুঝলে? চেঁচিয়ে বলল সেকান্দর।

হ্যাঁ তাই কর।

রাবুর দিকে তাকিয়ে হাত তুলল জাহেদ। বলল, আসি।

অশ্রু টলটল রাবুর চোখ। টপ টপ করে ঝরে পড়ল দুটো ফোঁটা। রাবু হাসল। বলল, এসো।

সাম্পান পৌঁছে গেছে মাঝ গাঙে। পকেট থেকে রুমাল বের করল জাহেদ। উড়িয়ে দিল নিশানের মত। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, চিন্তা করিসনে রাবু, আমি ফিরে আসব। আমি আসব।

বড়খালে জোয়ার এসেছে। জোয়ারের টানে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল সাম্পান। কল কল জোয়ার বড় খালে। শাঁই শাঁই বাতাসের দাপাদাপি বড় খালের বুকে, দখিন ক্ষেতে। সব কিছু ছাপিয়ে রাবুর কানে এসে বাজে শুধু একটি কথা—আমি আসব। আমি আসব।

-সমাপ্ত-